কবিতাসমগ্র

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতাসমগ্র

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতাসমগ্র

১

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯২ মুদ্রণ সংখ্যা ২২০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৯৫ মুদ্রণ সংখ্যা ২০০০

প্রচ্ছদ সুনীল শীল

ISBN 81-7215-090-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৫০·০০

ভূমিকা

বেশ কিছুদিন আগে আমার কবিতার বইগুলি কাব্যসংগ্রহ নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং দুটি খণ্ড প্রকাশের পর থেমে যায়। এখন সেগুলিই আবার নতুন ভাবে সামঞ্জস্য করে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রথম যে খণ্ডটি কবিতাসমগ্র নামে প্রকাশিত হচ্ছে, তার অন্তর্ভুক্ত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'সত্যবদ্ধ অভিমান' নামে বইটির আলাদা কোনো অস্তিত্ব নেই। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'যুগলবন্দী' নামে যে-সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটি অংশের নাম ছিল 'সত্যবদ্ধ অভিমান'। পরে ঐ সংকলনের কিছু কিছু কবিতা অন্য কাব্যগ্রন্থে যুক্ত হয়েছে, সেগুলি বাদ দিয়ে অন্য কবিতাগুলি এখানে স্থান পেয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

গ্র ন্থ সূ চি

একা এবং কয়েকজন ১১
আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি ৪৯
বন্দী, জেগে আছো ১১৯
আমার স্বপ্ন ১৬১
সত্যবদ্ধ অভিমান ২০৫
জাগরণ হেমবর্ণ ২২৩

কাব্যপরিচয় ২৬৫
প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি ২৬৭

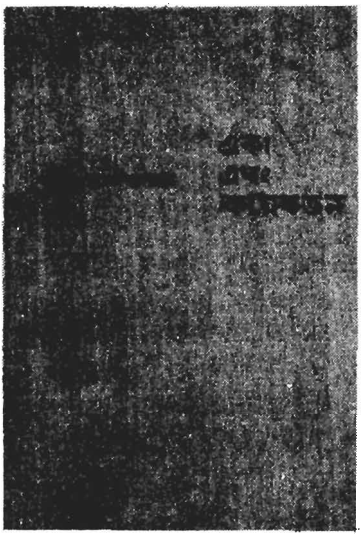

একা এবং কয়েকজন

সূচিপত্র

প্রার্থনা ১৩, ঝর্ণা-কে ১৩, সপত্নী ১৪, বিবৃতি ১৪, মিনতি ১৫, দুপুর ১৬, তামসিক ১৭, এক ঘুমের পর ১৭, চতুরের ভূমিকা ১৮, সপ্তপদী এবং আরো এক লাইন ১৯, মঞ্চ ১৯, বুকে যে ঝর্ণার উৎস ২১, তুমি ২১, বিচ্ছেদ ২২, অবিশ্বাস ২৩, কঠিন মিল ২৩, ঘর ২৪, সাপ ২৫, একা ২৫, উপলব্ধি ২৬, দুই হৃদয় ২৭, একটি অনুভব ২৭, পিপাসার ঋতু ২৮, ব্যর্থ ২৯, নক্ষত্র ৩০, ঝড় ৩০, যদি কোনোদিন ৩১, রাত্রি ৩২, সময় ৩২, শেষ প্রণয় ৩৩, ক্ষণিকা ৩৪, আত্মকাহিনী ৩৪, সমুদ্র এবং মধ্যবয়স ৩৫, পরমা ৩৬, সমর্পণ ৩৬, কবি ৩৭, তিনজন তরুণ কবি—একটি গ্রোটেস্‌ক্‌ ৩৭, সহজ ৩৮, চতুর্দশপদী ৩৯, স্বর্ণলতা ৪০, অন্যপ্রাণ ৪১, বৃষ্টির ইতিহাস ৪১, একজন মানুষের গল্প ৪২, পাপ ৪৩, অনুভব ৪৪, চিরহরিৎ বৃক্ষ ৪৪, নেশা ৪৫, অনির্দিষ্ট নায়িকা ৪৬

প্রার্থনা

ঋজু শাল অশ্বত্থের শিকড়ে শিকড়ে যত ক্ষুধা
সব তুমি সয়েছো, বসুধা।
স্তব্ধ নীল আকাশের দৃশ্য অন্তহীন পটভূমি
চক্ষুর সীমানা প্রান্তে বেঁধে দিয়ে তুমি
এঁকে দিলে মাঠ বন বৃষ্টি-মগ্ন নদী—তার দূরাভাস তীর
আমাকে নিঃশেষে দিলে তোমার একান্ত মৃদু মাটির শরীর।

আমার জন্মের ভোর সূর্য-শরে আহত মাটিতে
প্রত্যহকে ধরে থাকা অবাধ্য মুঠিতে।
নিবিড় ঘুমের মৌন জীবনের অস্পষ্ট আভাসে
নিস্পন্দ অন্ধকারে মিশে যায়,—বর্ণ ভেসে আসে,
লাগে স্পর্শ-উষ্ণ হাওয়া, দেখি চক্ষু ভ'রে
সূর্যমুখীর মতো মেলে আছো সেই এক অপরূপ ভোরে।

আমারও আকাঙ্ক্ষা ছিল সূর্যের দোসর হবো তিমির শিকারে
সপ্তাশ্ব রথের রশি টেনে নিয়ে দীপ্ত অঙ্গীকারে।
অথচ সময়াহত আপাত বস্তুর দ্বন্দ্বে দ্বিধান্বিত মনে
বর্তমান-ভীত চক্ষু মাটিতে ঢেকেছি সঙ্গোপনে।

দাঁড়াও ক্ষণিক তুমি স্তব্ধ করে কালচিহ্ন ভবিষ্য অপার
হৃৎস্পন্দে দাও আলো-উৎসের ঝংকার।
নির্মম মুহূর্ত ছুঁয়ে বাঁচার বঞ্চনা স'য়ে স'য়ে
আমাকে স্বাক্ষর দাও নবীন যৌবন, সমারোহে।

ঝর্ণা-কে

সেই যে এক বাউল ছিল সংক্রান্তির মেলায়
গানের তোড়ে দম বাধলো গলায়
হারানো তার গানের পিছে হারালো তার প্রাণ,
আহা, ভুলে গেলাম কি যেন তার গান!

প্রাণ দিয়েছে দেয়নি তার হাসি
গানের মতো প্রাণ ছেড়েছে খাঁচা।
সেই যে তার মরণাহত হাসি
ঝর্ণা, জানো, তারই নাম তো বাঁচা।

সপত্নী

তুমি কবিতার শত্রু—কবিতার মদির সৌরভ
মুহূর্তেই মুছে যায়—তুমি এলে আমার এ ঘরে
থাকে শুধু যৌবনের যন্ত্রণার তীব্র অনুভব
বৃষ্টির মতন ঝরে অন্ধকার—সমস্ত অন্তরে।
আমাকে নিষ্ঠুর হাতে ছিন্ন করে নাও তুমি এসে
সমস্ত পৃথিবী থেকে তোমার আপন পৃথিবীতে
নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে সাধ হয় ভালোবেসে
কবিতার শেষ শিখা মুছে যায় কখন নিভৃতে।

তুমি চলে গেলে দূরে সূর্যমুখী উষার মতন
ফিরে আসে অন্য সখী, কবিতা, আমার এই ঘরে
শূন্যের আশ্রয় থেকে তুলে নেয় মায়াবী সংসার ভীরু মন
সে আমার যন্ত্রণাকে আনন্দের স্বাদে সিক্ত করে।
কাব্যের সপত্নী তুমি, তুমি তাকে চাও না অন্তরে
সে তবু আমার মনে তোমারই স্বপ্নের মূর্তি গড়ে।

বিবৃতি

উনিশে বিধবা মেয়ে কায়ক্লেশে উন্‌তিরিশে এসে
গর্ভবতী হল, তার মোমের আলোর মতো দেহ
কাঁপালো প্রাণান্ত লজ্জা, বাতাসের কুটিল সন্দেহ
সমস্ত শরীরে মিশে, বিন্দু বিন্দু রক্তে অবশেষে
যন্ত্রণার বন্যা এলো, অন্ধ হলো চক্ষু, দশ দিক,
এবং আড়ালে বলি, আমিই সে সুচতুর গোপন প্রেমিক।

দিবসার্ধ পায়ে হেঁটে ফিরি আমি জীবিকার দাসত্ব-ভিখারী
ক্লান্তি লাগে সারারাত, ক্লান্তি যেন অন্ধকার নারী।
একদা অসহ্য হলে বাহুর বন্ধনে পড়ে ধরা
যন্ত্রণায় জর্জরিতা দুঃখিনী সে আলোর স্বরূপে
মাংসের শরীর তার শুভক্ষণে সব ক্লান্তিহরা
মণ্ডূকের মতো আমি মগ্ন হই সে কন্দর্প-কূপে

তার সব ব্যর্থ হল, দীর্ঘশ্বাসে ভরালো পৃথিবী
যদিও নিয়ম নিষ্ঠা, স্বামী নামে স্বল্প চেনা লোকটির ছবি
শিয়রেতে ত্রুটিহীন, তবু তার দুই শঙ্খ স্তনে
পূজার বন্দনা বাজে আদিগন্ত রাত্রির নির্জনে।

সে তার শরীর থেকে ঝরিয়েছে কান্নার সাগর
আমার নির্মম হাতে সঁপেছে বুকের উপকূল,
তারপর শান্ত হলে সুখে দুঃখে কামনার ঝড়
গর্ভের প্রাণের বৃন্তে ফুটে উঠলো সর্বনাশ-ফুল।

বাঁচাতে পারবে না তাকে উনবিংশ শতাব্দীর বীরসিংহ শিশু
হবিষ্যান্ন পুষ্ট দেহ ভবিষ্যের ভারে হল মরণসম্ভবা
আফিম, ঘুমের দ্রব্য, বেছে নেবে আগুন, অথবা
দোষ নেই দায়ে পড়ে যদি বা ভজনা করে যীশু।

মিনতি

ঝড় দিস্‌নে, আকাশ, সেই সুন্দরীর ঘরে

থিরথিরিয়ে কাঁপতে থাকুক ভীরু দীপের শিখা
আঁচল পেতে মাটিতে বুক চেপে থাক সে শুয়ে,
একা ঘরের প্রতীক্ষিতা, আকাশ-কনীনিকা।

দিঘির মতো শরীর তার নরম জলে ভরা
ব্যথার দাগ যদিও আঁকে প্রেমিক কাপুরুষ
সওদাগর ভৃত্য এক বাঁচার ভয়ে মরা।

ঝড় দিস্‌নে, আকাশ, তবু বিরহিণীর ঘরে

আঁচল পেতে মাটিতে বুক চেপে থাকুক শুয়ে
ঝিকমিকিয়ে উঠুক কেঁপে ভীরু দীপের শিখা
প্রেমিক যেন নেভায় এসে একটি দ্রুত ফুঁয়ে।

দুপুর

রৌদ্রে এসে দাঁড়িয়েছে রৌদ্রের প্রতিমা
এ যেন আলোরই শস্য, দুপুরের অস্থির কুহক
অলিন্দে দাঁড়ানো মূর্তি ঢেকে দিল দু' চক্ষুর সীমা
পথ চলতে থমকে গেলো অপ্রতিভ অসংখ্য যুবক।

ভিজে চুল খুলেছে সে সুকুমার, উদাস আঙুলে
স্তনের বৃন্তের কাছে উদ্বেলিত গ্রীষ্মের বাতাস
কি যেন দেখলো চেয়ে আকাশের দিকে চোখ চেয়ে
কয়েকটি যুবক মিলে একসঙ্গে নিল দীর্ঘশ্বাস।

একজন যুবক শুধু দূর থেকে হেঁটে এসে ক্লান্ত রুক্ষ দেহে
সিগারেট ঠোঁটে চেপে শব্দ করে বারুদ পোড়ালো
সম্বল সামান্য মুদ্রা করতলে গুনে গুনে দেখলো সস্নেহে
এ মাসেই চাকরি হবে, হেসে উঠলো, চোখে পড়লো
অলিন্দের আলো।

এর চেয়ে রাত্রি ভালো, নির্লিপ্তের মতো চেয়ে বললো মনে মনে
কিছুদূর হেঁটে গিয়ে শেষবার ফিরে দেখলো তাকে
রোদ্দুর লেগেছে তার ঢেকে রাখা যৌবনের প্রতি কোণে কোণে
এ যেন নদীর মতো, নতুন দৃশ্যের শোভা প্রতি বাঁকে বাঁকে।

এর চেয়ে রাত্রি ভালো, যুবকটি মনে মনে বললো বারবার
রোদ্দুর মহৎ করে মন, আমি চাই শুধু ক্লান্ত অন্ধকার।

তামসিক

পায়ের নিচে শুকনো বালি একটু খুঁড়লে জল
গভীরে যাও গভীরে যাও বুকের হলাহল
আলো চায় না, হাওয়া চায় না, স্তব্ধতার সুখ
দেখ জ্বলছে আকাশ ভ'রে, তবু ফেরাও মুখ
গভীরে যাও গভীরে যাও দু' হাতে ধরো আঁধার
পায়ের নিচে বালি খুঁড়লে অতল পারাবার।

মৌমাছির চাক ভেঙেছি, আমার চোখে মুখে
উড়ে বসলো কয়েক হাজার, সমস্ত বিষ বুকে
জমছে এসে, জ্বলে উঠলো অসীম মরুভূমি
হা-হা শব্দে বালি পুড়ছে, যদি পারতে তুমি
ছড়িয়ে দিতে বুকের বিষ আশিরপদনখে
আমি যেতাম সমুদ্রতীর, ঝলসে উঠতো চোখে
তীব্র নীল বাঁচার স্বাদ,—অন্ধকার জলে
আমি হয়তো ডুবে যেতাম আলোর কৌতূহলে।

এ কি অবাধ হাওয়া বইছে বাসনা চঞ্চল
আলো চাইনি, হাওয়া চাইনি, বুকের হলাহল
নিচে টানছে অন্ধকারে, চোখ ঢাকছে আঁধার
হয়তো শুকনো বালি খুঁড়লে অতল পারাবার।

এক ঘুমের পর

সমস্ত আকাশ থেকে রাত্রি আর বৃষ্টি ঝরে পড়ে

নীলকান্ত অন্ধকারে নিশ্বাসের সঙ্গী এই ঘরে
হাত দিয়ে স্পর্শ করি তুষারের স্তূপ এক নারী
অকূল কুন্তল পাশ—মেলে দিয়ে ক্লান্তির সাগরে
তুমিও আকাশ বুঝি, অন্ধকার, বর্ষণ-সঞ্চারী ?

মধ্যরাত্রে মাতালের মতো ঘোরে দুরন্ত বাতাস
স্খলিত গানের মতো ঠিকরে ওঠে রাতপাখির ডাক
শিয়রের পাশে যেন জেগে বসে আছে সর্বনাশ
অনুগত মার্জারের মতো নীল চোখ স্তব্ধ-বাক।

তোমার শরীরে ঘুম তুষারের স্তূপের মতন
গলে যাওয়া মূর্তিমতী জীবনের শান্তির নির্ঝরে
বুক থেকে একটি শুভ্র সূর্যমুখী করো সমর্পণ
আমাকে বাঁচাও তুমি হত্যাকারী অন্ধকার ঘরে।

সমস্ত আকাশ থেকে রাত্রি আর বৃষ্টি ঝরে পড়ে।

চতুরের ভূমিকা

কিছু উপমার ফুল নিতে হবে নিরুপমা দেবী
যদিও নামের মধ্যে রেখেছেন আসল উপমা
ক্ষণিক প্রশ্রয়-তুষ্টি চায় আজ সামান্য এ কবি
রবীন্দ্রনাথেরও আপনি চপলতা করেছেন ক্ষমা।

যদিও প্রত্যহ আসে অগণিত সুঠাম যুবক
নানা উপহার আনে সময়-সাগর থেকে তুলে
আমি তো আনিনি কিছু চম্পা কিংবা কুর্চি কুরুবক
সাজাতে চেয়েছি শুধু স্পর্শহীন উপমার ফুলে।

আকাশে অনেক সাজা, তবু স্থির আকাশের নীল
সামান্য এ সত্যটুকু শোনাতে চেয়েছি আপনাকে
শব্দ আর অলঙ্কারে খুঁজে খুঁজে জীবনের মিল
দেখেছি সমস্ত সাধ অন্য এক বুকে সুপ্ত থাকে।
আশা করি এতক্ষণে এঁকেছি আমার পটভূমি।
যদি অনুমতি হয় আজ থেকে শুরু হোক, তুমি।

সপ্তপদী এবং আরো এক লাইন

এত ছোট হাতে কি করে ধরেছ বিশ্ব
কি করে নিজেকে সাজালে আকাশী নীলে ?
অথচ আমি যে কত দীন কত নিঃস্ব
শুধু লুকোচুরি খেলেছি কথার মিলে ।

তোমার স্বপ্ন, সুখের অমরাবতী
আমার হৃদয়ে অতল অন্ধ পাতাল,
তবুও দুজনে মিল হলো সম্প্রতি—

ফর্সা দেয়ালে শিকারী-কীটের জাল ।

মঞ্চ

নিত্যকার বাঁধা মঞ্চে ঘুরছে ফিরছে অসংবদ্ধ যুবা
তীক্ষ্ণ দীপ্ত তরবারি কোষে ঝুলবে কখনো খুলবে না
সর্বাঙ্গে পরের সাজ, শিরস্ত্রাণ ঝলসায়, নতুবা
সামান্যই টুকরো প্রাণী মঞ্চের বাইরে খুব চেনা ।

রানী নামে ডাকছে যাকে, সত্যকার রানী নয় জানে
সে জানাও অর্ধসত্য, চোখের পাতার ঠিক নিচে
দুলছে তীব্র নীলচে আলো, দু' একটি নারীই শুধু সঙ্গে করে আনে
জন্মে জন্মে সে রহস্য, হেসে উঠছে যেন সব মিছে—
এই আলো, এই মঞ্চ, শুধু তার হাতের আঙুলে
ধরেছে হীরের ছুরি যুবকের বুকের সামনে তুলে ।

সাজঘরে সাজ খুলছে, যুবকটি দেখছে লোভী চোখে
কতটুকু দেখতে পাবে, সামান্য যা ঝলসাবে আলোকে ।
মুঘল রানীর বেশ খসে পড়লো, বাঁ দিকের স্তনে কালো দাগ
যুবকেরই কীর্তি চিহ্ন—এ ছাড়াও বহু রাত্রি, বহু অনুরাগ

চিবুকে কাজল তিলে, জঙ্ঘায় মসৃণ কটিদেশে
নির্লিপ্ত নদীর মতো ছেয়ে আছে নিষ্ঠুর আশ্লেষে।

যুবক বুজলো চক্ষু, চামেলি, একবার তুমি আমার হৃদয়
শতধা বিচ্ছিন্ন করো, ক্লান্তি লাগে, নির্জনতা ভয়
যেন রক্তে মিশছে এসে, আমাকে একটু রাখো উষ্ণতার কাছে,
এ যেন চামেলি নয়, চোখ খুললো, নিবিড় হিজল বনে রাত্রি থমকে আছে।

কে আলো নেভালো ? চিৎকার। কেউ নয় যুবকের ভ্রম
সবুজ আলোর রশ্মি কি আশ্চর্য মসৃণ নরম
রেশমের মতো সেই নগ্ন রমণীর দেহ ঘিরে
ছড়িয়েছে ছোট ঘরে, যুবকের দিকে পিঠ ফিরে
চামেলি পোশাক পরলো, চলো যাই, ঢের রাত্রি হলো
নীলকণ্ঠ, শুনতে পাচ্ছো, এবার তোমার সাজ খোলো।

সাজ খুলবো ? হাহাকার। কিছুই দেখি না অন্ধকারে
একবার হাত ধরো, চামেলি, মিনতি করি, বলো,
তোমার শরীর দেখলে কেন মনে হয় বারেবারে
তোমাকে ঘিরেছে যেন আঁধার সমুদ্র এক, অজস্র উত্তাল টলোমলো
আমার মৃত্যুর মতো। অথচ আমিই যদি সম্রাটের এই সাজ খুলি
নীলকণ্ঠ মজুমদার বের হবে—সকলেই দেখাবে অঙ্গুলি,
ঐ সেই লোকটা যাচ্ছে—নাট্যকার, নারী কিংবা মদ
বাঁচিয়ে রেখেছে যাকে, ভোগ করছে পরের সম্পদ।

নকল সাজেই বুঝি বাঁচতে হবে, অন্ধকারে এ অরগাহনে
জীবন বিস্বাদ লাগে, সমুদ্রের চেয়ে আরো লোনা।
তুমি রোজ সাজ খোলো, আমি দেখি, ভাবি মনে মনে
কালকের নাটকে হয়তো মৃত্যুদৃশ্যে আমি আর বেঁচেই উঠবো না।

বুকে যে ঝর্ণার উৎস

বুকে যে ঝর্ণার উৎস সে কোন গভীরে
হারায়, অথবা কোন ভ্রান্ত মরুপথে
বৃষ্টির ফোঁটার মতো শূন্যে ঘুরে ফিরে
ফিরে যায় সায়াহ্নের জয়দৃপ্ত রথে।

আমিও দেখিনি তাকে, নিজেরই মুকুর
মনে হয় ভেঙে ভেঙে ছড়িয়েছি ভুলে
কখনো নিভৃতে শুনি যে নির্ঝর সুর
চিরকাল অদেখা সে সিংহদ্বার খুলে

হৃদয়ের অন্ধকার সাতমহলায়
অনেক ঘুরেছি আমি জোনাকির মতো,
দেখেছি স্বপ্নের নামে স্মৃতিতে হারায়
যা কিছু কৃপণ চোখে খুঁজি ক্রমাগত।

তুমি

আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে
তোমার দু' চোখে তবু ভীরুতার হিম!
রাত্রিময় আকাশের মিলনান্ত নীলে
ছোট এই পৃথিবীকে করেছো অসীম।

বেদনা মাধুর্যে গড়া তোমার শরীর
অনুভবে মনে হয় এখনও চিনি না
তুমিই প্রতীক বুঝি এই পৃথিবীর
আবার কখনও ভাবি অপার্থিবা কিনা।

সারাদিন পৃথিবীকে সূর্যের মতন
দুপুর-দগ্ধ পায়ে করি পরিক্রমা,
তারপর সায়াহ্নের মতো বিস্মরণ—
জীবনকে, স্থির জানি, তুমি দেবে ক্ষমা।

তোমার শরীরে তুমি গেঁথে রাখো গান
রাত্রিকে করেছো তাই ঝংকার মুখর
তোমার সান্নিধ্যের অপরূপ ঘ্রাণ
অজান্তে জীবনে রাখে জয়ের স্বাক্ষর।

যা কিছু বলেছি আমি মধুর অস্ফুটে
অস্থির অবগাহনে তোমারি আলোকে
দিয়েছো উত্তর তার নব-পত্রপুটে
বুদ্ধের মূর্তির মতো শান্ত দুই চোখে।

বিচ্ছেদ

তোমাকে দিয়েছি চিরজীবনের বর্ষা ঋতু
এখন আমার বর্ষাতে আর নেই অধিকার
তবুও হৃদয় জলদমন্দ্রে কাঁপে যেহেতু
চোখ ঢেকে তাই মনে করি শুধু ক্ষণিক বিকার।

আকাঙ্ক্ষা ছিল তোমাকে সাজাবে বৃষ্টিকণা
মনে হবে তুমি আকাশের মতো দূর বহুদূর
তখন জানিনি বর্ষণে আছে কি যন্ত্রণা
বিচ্ছেদ আর লাগে না আমার তেমন মধুর।

তোমাকে দিয়েছি আমার প্রাণের বর্ষা ঋতু
এখন আমার বুক জুড়ে শুধু রৌদ্র দহন
কখনো কি আর সাগরে মরুতে বাঁধবে সেতু
মেঘ-যবনিকা ছিঁড়ে ফেলে তুমি ছুঁয়ে যাবে মন ?

অবিশ্বাস

যদিও জীবনে অনেক মাধুরী করেছি হরণ
কৃপণ আঙুলে খুঁজেছি বাঁচার অনেক অর্থ
বারে বারে তবু অবুঝের মতো বলে ওঠে মন
ব্যর্থ, ব্যর্থ।

কঠিন সময় তুচ্ছ করেছি হারিয়ে ছড়িয়ে
অহঙ্কারকে অবহেলা ভরে করেছি চূর্ণ
অন্ধ বাসনা, ভয় ফিরিয়েছি দুই হাত দিয়ে
খুশির খেয়ালে স্মৃতির মৌন করেছি পূর্ণ।

হরিণের ভীরু চোখের মতন স্নিগ্ধ সকাল
কখনো আমার হৃদয়ে আঁকেনি কোনো প্রতিভাস
কখনো দেখেনি ঘুচিয়ে চোখের আলোর আড়াল
দুঃখীজয়ীর ললাটের মতো অসীম আকাশ।

কত শতবার স্মরণ করেছে এই যৌবন
ভেদাভেদ নেই জলের রেখায় নারীর চিত্তে
তবু কেন আজ অবুঝের মতো বলে ওঠে মন
মিথ্যে, মিথ্যে ?

কঠিন মিল

ধু ধু করা এক মাঠের মধ্যে একলা গাছের মতো
ধুলোর ঝাপট রোদের ভ্রূকুটি স'য়ে স'য়ে অবিরত
বৃষ্টি বাদল ঝড়ে
শিকড়ে শিকড়ে বাঁচার সাহস
শাখার শাখায় দুঃখ অবশ
বাঁচতে চায় সে একলা বাঁচার প্রেম নিয়ে অন্তরে।

এ কেমন সাধ ! আলোর বৃত্তে বিলাসী পোকার মতো
তাকে চেয়ে আমি সারাটা জীবন ঘুরেছি যে ক্রমাগত
শোনো তবে আমি বলি :
আমিই রোদ ও ধুলোর সমাজে
এসেছি বজ্র বৃষ্টির সাজে
আমিই ঢেকেছি তোমার আকাশ, তারাদের দীপাবলী

এমন কি আমি তোমারই দু'চোখে প্রতিরোধ হয়ে জ্বলি ।

ঘর

পাহাড় সমুদ্র আর অরণ্যের স্তব লিখে লিখে
ক্লান্ত এক কবি আজ ঘুমিয়েছে একলা ছোট ঘরে,
যখন সে জেগেছিল, ছোট ছোট ঘর ভর্তি এই পৃথিবীকে
উদার প্রশস্ত চোখে চেয়েছিল বাসনার স্তরে ।

কৈশোরে অম্লান এক শ্বেতপদ্ম ছিল তার বুকে
প্রসন্ন রৌদ্রের আলো টলোমলো স্বচ্ছ সরোবর
এবং উদাস, নীল, আকাশের পরিপূর্ণ সুখে
মুগ্ধতার নানাবর্ণ চিত্রশিল্পে ভরেছে অন্তর !

জীবন বিশাল করো, হে আকাশ, পথে পথে ঘুরে
এখন সে বলে উঠলো, সত্যকার জীবনের মুখোমুখি এসে
লক্ষ বাহু তুলে ধরো, হে অরণ্য, অসহিষ্ণু যৌবনের সুরে
কোথায় এসেছি আমি—অসহ্য এ স্পন্দহীন দেশে ।

দিবাস্বপ্নে সব ছিল, সমুদ্র আকাশ মাঠ বন
তবু তার দিন ভরলো সঙ্কীর্ণের নানান আঘাতে ।
কাচের জানালার পাশে পাখির মতন তার মন
শ্বেতপদ্ম খুঁজতে এল কোন এক যুবতীর হাতে ।

এখন নিতান্ত ক্লান্ত যুবকটি ঘুমিয়েছে একা ;
স্বপ্ন নেই আকাশের, তৃপ্তি নেই পাহাড়ে সাগরে।
পরাজিত মহত্ত্বের সঙ্গে হবে অন্য চোখে দেখা ;
দ্বিতীয় পৃথিবী এক প্রতীক্ষায় বসে আছে তারই ছোট ঘরে।

সাপ

কুসুমে ছিল সবুজ সাপ সে এক সন্ধেবেলা
তখন আমায় ছুঁয়েছে লোভ—অসীম দুর্জয়
চক্ষু দুটি অচেনা তারা, হৃদয়ে বিষজ্বালা,
হাওয়ার তোড়ে দুললো সাপ পরম নির্ভয়
মৃত্যু হলো স্বয়ম্বরা, আমি পেলাম মালা

রাত্রি নামে ঈগল এক, ইচ্ছা পারাবত
যে হাতে ছিল ফুলের সাধ—এখন তাই ভয়
লুকোয় সেই বাসনা-পাখি ; সারা আকাশপথ
ডানায় ঢাকে রাত্রি তার দু' চোখে সংশয়
আমি তখন বিষের ঘোরে খুঁজি ভবিষ্যৎ।

কত রঙের কত কুসুম হাতের কাছে জমা
মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ি, পায়ের কাছে শীত
আহা কি রূপ সাপের চোখে জানিনি প্রিয়তমা
এতকাল যে বেঁচে ছিলাম, এখন সম্বিৎ
হারায় তাই—তোমাকে দিই চিরকালের ক্ষমা।

একা

একা গৃহকোণে আছি, তোমরাও এসো কয়েকজন
অন্ধকার চিন্তাকুণ্ডে পা ছড়িয়ে বসো হে আরামে
কয়েকটি উজ্জ্বল স্মৃতি সময়কে করি সমর্পণ
অনন্তের হাত থেকে কিছুক্ষণ অনিত্যের নামে।

কাল রাত্রে ঘুম হয়নি, একা এক দ্বিতীয় জগতে
বৃষ্টিহীন, নিষ্পাদপ, আদিগন্ত রুক্ষ তপ্ত বালি
পায়ে ঠেলে ঠেলে হেঁটে নিজের বানানো সরু পথে
ভেবেছি নিজেরই ছায়া সত্যি নয় নিষ্ঠুর হেঁয়ালি ;
জীবন বা মৃত্যুও নয়, সে এক অদ্ভুতভাবে বাঁচা
চোখে জ্বলছে তীক্ষ্ণ রোদ, মগজে রাত্রির কারুকাজ
বাঁচার একটাই চিন্তা তবু তার নানান আগাছা
জড়ায় প্রাণের কেন্দ্র সঙ্গী সাথী আত্মীয় সমাজ ।

স্বস্তিহীন এই রাত্রি,—তোমরাও এসো কয়েকজন
(তোমাদেরও ভিন্ন ভিন্ন দ্বিতীয় জগৎ ঘিরে সূর্যের মণ্ডলী)
এখানে চিন্তার কুণ্ডে—ভুলে যাই অসহ নির্জন
কিছুক্ষণ পা ছড়িয়ে এসো হে স্মৃতির কথা বলি ।

উপলব্ধি

খুচরো পয়সা গুনে নিয়ে পেঁয়াজ রসুন
বেচে উঠলো এনামালি, গত হাটে আর বুধবারে
দু' টাকার মার গেছে, আজ শোধ নেবে চতুর্গুণ
গঞ্জের বাজারে তারা সুর্মা চোখে আছে সারে সারে ।

লণ্ঠন নেভাও বিবি, বন্ধ রাখো সোহাগের বুলি
না হয় বেশীই পাবে, আরো এক চকচকে আধুলি
ভোর রাত্রে ধরা চাই সতীশের ঘরে ফেরা নাও
থাক আজ কালীমার্কা, এক ফুঁয়ে লণ্ঠন নেভাও ।

আধুলির চেয়ে আরো চকচকে তীব্র জ্যোৎস্নার
আলো এসে ঘরে পড়লো, হঠাৎ দেখলো এনামালি
অজস্র দোকানপাট বসে গেছে যেন সারে সার
লোকজন ভরা হাট শুধু তার স্থানটুকু খালি ।

বিবির শরীরে দেখলো ভয়ঙ্করী পদ্মা যেন দিগন্ত উধাও
মনে হলো এতক্ষণে ছেড়ে গেছে সতীশের ঘরে ফেরা নাও।

দুই হৃদয়

আমার জনৈক বন্ধু, কাল রাত্রে কি দঃখে কি জানি
বিষ খেয়ে শুয়েছিল ; টেলিফোনে সে খবর শুনে
দেখতে গেলাম তার শেষ স্মৃতিচিত্র মুখখানি
মনে হল, নিজেকে সে সঁপেছিল বাঁচার আগুনে।

দু' চোখে কিসের ক্ষুধা, যেন এক বিষণ্ণ নাবিক
সুদূর সমুদ্রপথে সামান্য তৃণের মতো একা
প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে, অন্ধ চোখে ভুল ক'রে দিক
চলেছে আর এক রাজ্যে, যে রাজত্ব এখনো অদেখা।

ফিরে আসি নত মুখে, আমার নিভৃত ছোট ঘরে—
কি এক অদৃশ্য ভয়ে বারেবারে কেঁপে ওঠে বুক
নিজেকে সান্ত্বনা দিই, নির্জন হাওয়ার মতো স্বরে :
আমি তো প্রতিষ্ঠ আছি, স্থির, দূরলক্ষ্যে উন্মুখ।

কৃপণের মতো আমি ধরে আছি এই পৃথিবীকে
মুহূর্তের নানারূপ সৃষ্টি করি নিপুণ স্থপতি।
আমি তো এখনো ভাবি এ জীবন উদ্ভাসিত হবে দিকে দিকে
সমুদ্র আকাশ হবে, তৃণ হবে মহাবনস্পতি!

একটি অনুভব

পায়ের কাছে এই বিশাল বাধাহীন সমুদ্র
মাথারও অধিতটে আকাশ নীলে নীল সমুদ্র
একদা কার বুক আমার মনে হত সমুদ্র ?

এখানে এ সাগর চোখের পরপারে অন্তহীন
একদা কার প্রেম আমার চোখে ছিল অন্তহীন
দু'বাহু বন্ধনে পেয়েও মনে হত অন্তহীন ?

পিপাসার ঋতু

আগুনের জিহ্বা এসে স্পর্শ করে যায়
উনিশের কুমারীকে ; তার চোখ ক্ষণকাল বিদ্ধ হয়ে থাকে যন্ত্রণায়
তারপর জ্বলে ওঠে আকস্মিক আলেয়ার মতো
এক টুকরো অন্ধকার পাখি হয়ে তার পাশে ঘোরে ক্রমাগত ।

পূর্ণিমার স্নিগ্ধ আলো রোদ্দুরের চেয়ে আরো তীক্ষ্ণ মনে হয়
স্মৃতির অসহ দুঃখ জ্বেলে দেয় প্রথম সংশয় ।
একটি আলোর বিন্দু ঘুরে ফেরে ধমনীর রক্তের ভেতরে
শৈশবের ভুলে যাওয়া পদ্মা আরও কীর্তিনাশ করে ।
শরীরে মৃত্যুর স্বাদ—বুক জুড়ে উন্মাদ তুফান
আগুনের জিহ্বা এসে স্পর্শ করে, ভয়ে কাঁপে প্রাণ
এক টুকরো অন্ধকার পাখি হয়ে ঘোরে চারপাশে
আলেয়ার মতো চোখ জ্বলে উঠে মেলায় আকাশে ।

মেয়েটি কান্নায় ভরে অন্ধকার মাঠে ভেঙে পড়ে
প্রার্থনায় দীর্ণ হয়, অস্ফুট হাওয়ার মতো স্বরে :
হে দেব, তৃষ্ণার শান্তি, মুক্তি দাও এই তৃষ্ণা যূপকাষ্ঠ থেকে
বিশাল বাতাসে ছাওয়া মাঠে আমি তৃণে মুখ ঢেকে
উদ্ভিদ মূলের মতো মাটি থেকে চাই শান্তিরস.
হে দেব, তোমার দানে পূর্ণ করো যৌবনের তৃষ্ণার কলস ।

তখন কবির কণ্ঠ প্রচ্ছন্ন আধার থেকে উচ্চারিত হয়,
হে কুমারী, শান্ত হও, অশ্রুজলে লিখে রাখো অনেক বিস্ময় ।
তোমার পিপাসা ঋতু জ্বলে জ্বলে দীর্ঘতর হোক
তোমার প্রাণের নাম দাহময় গ্রীষ্মের চাতক ।

পৃথিবীর মতো তুমি স্থির হয়ে থাকো প্রতীক্ষায়
প্রথম প্রেমের স্পর্শ নেমে আসবে আষাঢ়ের প্রথম বর্ষায় ।

ব্যর্থ

তুমি কথা বলো, তুমি গান করো, আমি
শুধু পাই যন্ত্রণা
তোমার শরীরে বর্ণবাহার
অথচ আমি যে পাইনে একটু কণা ;
নীল যৌবন আকাশে হারাবে, তাই বুঝি এই
চুপি চুপি দিন রাত্রির মন্ত্রণা ।

অন্ধকারের পাখার ঝাপটে এই যৌবন
বর্তমানেই সঁপে দেবে মন ?
দুঃখ বাজবে, পরাভূত হবে
জানবে না তার দৃষ্টি অতীত কি যে গৌরবে
মুক্তি মূল্যে মগ্ন সুদূর প্রতীক্ষা পণ !

জানে না পৃথিবী এ ষড়যন্ত্রে তুমি
মৃত্যু না-হোক, দেবেই আত্মদান
ব্যথার শিহরে সারা অরণ্যভূমি
উন্মাদ হয়ে গাইবে ঝড়ের গান !

তুমি কথা বলো, তুমি গান করো, আমি
শুধু পাই যন্ত্রণা
তুমি রয়ে গেলে রূপের আড়ালে
হৃদয়ে পেলে না একটু আলোর কণা ।
নীল যৌবন আকাশে হারালো, তাই বুঝি এই
চুপি চুপি দিন রাত্রির মন্ত্রণা ।

নক্ষত্র

হে আকাশ তুমি আজ বলো
আমার শৈশবে ছিল কোন দূর নক্ষত্রের আলো।
যে আলো মৃত্যুর মতো সব দিকচিহ্ন মুছে ফেলে
আমাকে কালের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে অবহেলে।

তুমি কত ডাক দাও, আমি অন্ধ নির্বোধের মতো
সেই ডাক ভুলে গিয়ে নিজেকেই খুঁজি ক্রমাগত।
কালের উজানগঙ্গা সমুদ্রের মৌনে এসে মেশে
সোনার শৈশব ছেড়ে যৌবনের অগ্নিময় দেশে।

হে আকাশ, আজ তুমি বলো
আমার শৈশবে ছিল কোন দূর নক্ষত্রের আলো।
আবার যেন সে আসে মৃত্যুর মতন যেন আবার নিভৃতে
বসন্ত-উল্লাস থেকে আমাকে সে নিয়ে যায় হিমগর্ভ শীতে

ঝড়

কোথায় নামলো ঝড়—এখানে আকাশে
মেঘ-ছোঁয়া পাখি এক ভয় পেয়ে নীড়ে ফিরে আসে।

অথচ এখানে মেঘ কুমারীর মুখের মতন
অস্ফুট লাবণ্যময়, শান্ত নীল রৌদ্রে ভেজা বন,
ঝড়ের আভাস নেই, তবু সেই মেঘ-ছোঁয়া পাখি
ডানায় বিদ্যুৎ এনে ফিরে এসে কুলায় একাকী
প্রতীক্ষার তীক্ষ্ণ চোখে চায় যেন হোক এবার শুরু
বুকে তার গুরুগুরু, ঠিক সেই ঝড়েরই ডমরু!

কোথায় নামলো ঝড়, অথচ এখানে
গতির উন্মাদ ঢেউ অকস্মাৎ ছোঁয়া লাগে প্রাণে।

আমি তো এখানে আছি, প্রত্যহের নিষ্ঠুর নিয়মে—
সব কিছু শেষ করে ফিরে আসি আবার প্রথমে,
অতীত স্মরণ করি, ভবিষ্যের ভয়ে চোখ বুজে
মুহূর্তের যত ঋণ যাত্রাপথে যাই খুঁজে খুঁজে।

তবুও কখনো কোন দূরাগত ঝড়ের আহ্বান
মৃত্তিকা-শৃঙ্খল ছিঁড়ে কাঁপায় পাখির মতো প্রাণ।

যদি কোনোদিন

যদি কোনোদিন একা তুমি যাও কাজলা দিঘিতে
যখন বিকেল আসন্ন শীতে মন্থর-বেগ,
দেখবে কত না রহস্য আছে এই পৃথিবীতে
কত স্বপ্নের অচেনা আকাশ ছায়াময় মেঘ।

দেখবে সেখানে বনের বর্ণ মহা সমারোহে
শব্দে মিশেছে। নদীর জোয়ার বাতাসের গানে
বিকেলের ঘ্রাণ ঘুমের মতন অপরূপ মোহে
ছড়াবে তোমার চোখের মৌনে—অস্ফুট প্রাণে।

তুমি ভুলে যাবে আপন স্বরূপ, ভাববে আকুল
এ শরীর, মন, আভাস-উদাস-দু'চোখ এ কার ?
এ কার আকাশ, পাখি, মেঘ, বন, নতুন মুকুল
এতদিন পরে তোমার হৃদয়ে কোন্ ঝংকার।

যদি কোনোদিন একা তুমি যাও কাজলা দিঘিতে
হয়তো আবার বাঁচতে চাইবে এই পৃথিবীতে।

রাত্রি

একটি পাগল অন্ধকারকে বলে
আমাকে ভোলাও তোমার মোহিনী ছলে।
এই বলে শেষে নিজেই সে গেল মিশে
অন্ধকারের আকণ্ঠ ভরা বিষে।

সহসা আকাশ মেঘেতে ঢাকলো মুখ
বৃষ্টি ধারায় অঝোরে ঝরালো কেঁদে
আহত বাতাস উদাস করলো বুক
ঝড়কে রাখলো বনের শিখরে বেঁধে।

স্তব্ধ আঁধারে কিছুই যায় না দেখা
হে আকাশ তবু উষার হৃদয় জ্বালো
কোথায় গেল সে দৃষ্টি-পাগল একা
খুঁজতে সে কোন আঁধার পারের আলো।

সময়

বিষণ্ণ সন্ধ্যার জাল তোলে এক নীরব শিকারী
চেয়ে দেখে সব পাখি হয়েছে উধাও
দু' একটি বৃন্তঝরা আলোর পালক থাকে, তাও
হাত পেতে চেয়ে নেয় রাত্রির ভিখারী।

শূন্য মনে ফিরে যায়। ব্যর্থতার, দু' চোখের কালো
বন্যার শব্দের মতো দিগন্তে ছড়ায়
নিঃসঙ্গ অরণ্য থাকে যন্ত্রণায় স্তব্ধ প্রতীক্ষায়
কখন হৃদয়ে বেঁধে বর্ণচোরা আলো।

শুকনো পাতায় ভাঙে ঘুমহীন পাণ্ডু নীরবতা
জোনাকিরা মগ্ন হতে চায় ভিজে ঘাসে
মৃগ শিশু বুকে নিয়ে জেগে থাকে রাত্রির দেবতা
ধূসর রুগ্‌ণ জ্যোৎস্না মেলায় আকাশে।

নিশ্চিত ভোরের সূর্য অকরুণ, ক্লান্তিহীন মুখে
ছড়ায় জটিল জাল জীবনের মতো
অনেক বাতাস কাঁপে ঘুমভাঙা শূন্যতার বুকে
আবার সকাল, দিন, সব ক্রমাগত ।

আবার সন্ধ্যার জাল তোলে এক নীরব শিকারী
জানা আছে সব পাখি হবেই উধাও ।
যা কিছু আলোক থাকে ক্লান্তি দিয়ে তাও
হারায়, জানে না ক্রমে নিজেও সে হয়েছে ভিখারী ।

শেষ প্রণয়

এ কোন নতুন আলো পুঞ্জ পুঞ্জ ছড়ানো আকাশে ?
কুয়াশার গন্ধলীন সবুজ প্রত্যূষ ঘাসে ঘাসে
পদ্ম পদতল ছুঁয়ে একটি রমণী এসে থমকে দাঁড়ালো
সমস্ত আকাশ জুড়ে অফুরান প্রতীক্ষার আলো ।

—ফিরে যাও হে রমণী, আপন আঁচলে ঢেকে মুখ ।
সামান্যের বাসনায় তাকে পেতে হয়ো না উন্মুখ ।
সে থাক আপন দুর্গে অন্ধকারে স্বেচ্ছা নির্বাসিত
তোমার আশ্বাসে যেন হরিণের মতন চকিত ।

—ফিরে যাও হে রমণী, ফিরে যাও বিচ্ছেদগৌরবে
দুর্লভ জয়ের গর্বে একদা সে প্রজ্বলিত হবে
পুরুষের দুই হাতে দিন রাত্রি নিয়ে অবহেলে
অগ্নিদগ্ধ শুভ্র প্রেম সে তার দু'চোখে দেবে জ্বেলে ।

রমণী ভোরের মতো, স্থির হয়ে থাকে প্রতীক্ষায়
চক্ষে ওষ্ঠে স্তনযুগে শরীরের প্রতিটি রেখায়
আকাঙ্ক্ষার তীব্র আলো—সে আলোয় সে আগুনে এসে
ব্যর্থ হল সে পুরুষ, নিজেকে জ্বলিয়ে নিঃশেষে ।

ক্ষণিকা

এপ্রিলের কৃষ্ণচূড়া অহঙ্কারে ব্যাপ্ত করে দিক ;
ঝরে যাবে, মনে মনে বলি আমি, ঝরে যাবে ঠিক,
শীতের নির্মম হাত ছিঁড়ে নেবে স্পর্ধার নিশান ;
যে আকাশ নীলে নীলে মনে হয় যেন অফুরান
সেও শূন্য হবে, ক্লান্ত মেঘ এসে মুছে দেবে সীমা,
কালের কুটিল স্রোতে ভেসে যাবে কালের প্রতিমা ।

তোমাকে লিখেছি চিঠি কালের প্রতিমা নামে ডেকে
সেই চিঠি ছিঁড়ে ফেলো, ঘন অন্ধকারে মুখ ঢেকে
নিজেকে গোপন করো, মিথ্যে হোক পূর্বপরিচয় ;
ঝরে যাবে মুছে যাবে, এর চেয়ে পরম বিস্ময়—
যখন একান্তে ডাকি চুপে চুপে তোমাকে, ক্ষণিকা,
তখনও অম্লান থাকে চিরন্তন বাসনার শিখা !

আত্মকাহিনী

রোজ সকালেই শুয়ে শুয়ে ভাবি উঠি কিনা উঠি
সামনে টেবিলে চায়ের পেয়ালা সেঁকা পাউরুটি ।
সতেজ কাগজে পরিচিত ঘ্রাণ, চেনা সংবাদ
বন্যা, মন্ত্রী, শান্তির বাণী, শরিকি বিবাদ ।
জানালার পাশে এই সংসার দিল তার ডাক
থাক আলস্য, এবার তা'হলে উঠে পড়া যাক ।

গত রাত্রিকে বিছানায় ফেলে বাইরে এলাম
চোখে মুখে গায়ে পৃথিবী লিখলো সূর্যের নাম
সে নাম থাকবে সারাদিন ধরে চিহ্নের মতো
যেন আমি এই জীবিকার পথে ঘুরি ক্রমাগত ।
চোখের আড়ালে এসে চলে যায় বর্ষা শরৎ
যাকে চাই তাকে ভুলে গিয়ে শুধু খুঁজে ফিরি পথ ।

দিনের যুদ্ধে সমস্ত আশা নিঃশেষ হলে
রাত্রি তখন প্রেয়সীর মতো আভরণ খোলে।
তার রূপ যেন মৃত্যুর মতো ম্লান মনে হয়
সঁপে দিই তাকে নিজের ব্যর্থ ক্লান্ত হৃদয়।
শুধু মনে মনে প্রার্থনা করি অস্ফুট স্বরে
নতুন দৃশ্য ঘুম ভেঙে যেন দেখি কাল ভোরে।

সমুদ্র এবং মধ্যবয়স

সমুদ্রে সে ডুবেছিল, সমস্ত যৌবন-কাল, রত্নের সন্ধানে—
রত্ন নয়, পেয়েছে সে বুক ভরে নীল অন্ধকার
বরং সমুদ্র-স্বাদ কয়েকটি শিশির-বিন্দু ছিল তার প্রাণে
দু'চোখে নীলের নেশা, যৌবনের দৃপ্ত অহঙ্কার।

যদিও সময় ছিল বাউলের মতো তৃপ্তিহীন
পার্থিব আলোয় খুঁজে জীবনের বিস্ময়ের ভাষা
সামান্য স্বপ্নের মতো, চেয়েছিল, শোধ করে মুহূর্তের ঋণ
বিষের মতন তীব্র যুবতীর স্থির ভালবাসা।

তারপর একদিন চুলের বাদামী রঙে চুপে চুপে মিশে
মাণিকের রূপ ধরে সময় দাঁড়ালো তার কাছে
লাভ ক্ষতি হিসেবের দিকে শুধু চেয়ে নির্নিমেষে
দেখলো সমস্ত ঋণ ভবিষ্যৎ-গর্ভে জমে আছে।

রক্তে আর তেজ নেই, দু'চোখে সমুদ্র আরো গভীর অতল,
নীলের নেশায় ডুবে—সে শুধুই পেলো অশ্রুজল।

পরমা

বারেবারে চমকে উঠি, সে আসেনি ; গোধূলির আলো
পশ্চিমে তির্যক হয়ে দেবদারু চূড়ায় দাঁড়ালো ।

মন যদি নিভে যায় তবুও গভীরে
রত্নের সন্ধানী চোখ বারে বারে আসে ঘুরে ফিরে
খুঁজে পায় টুকরো, ভাঙা, শৈশব সুদূর ;
আহত পাখির মতো শূন্যে কাঁপে যন্ত্রণার সুর ।

নিজের দু'চোখে যদি মুকুরের রূপ মনে আসে
তবে কার শান্ত ছবি, কার অতলান্ত প্রেম ভাসে ?

নিশ্বাসে স্মৃতির সঙ্গ চেতনার দিগন্তে ছড়ালো
বারবারে চমকে উঠি, কে এসেছে, গোধূলির আলো ।

সমর্পণ

ফিরে এলাম, হে নির্ভয়, তোমার চোখে শান্তি
এখানে এই কিশোর তৃণ, ধূলিতে গড়া স্বর্গে—
সামান্যের মায়ায় আমি নিজেকে দেবো অর্ঘ্য ;
সেই আমার ভালোবাসার, প্রাণের সংক্রান্তি ।

ঘুমের দেশ ছেড়ে এলাম তোমার মহারাজ্যে
তোমার চোখ আলোকময়, মুছে দিলাম ক্লান্তি,
দু'হাতে ছিঁড়ে মুহূর্তের কত না ফুল সাজ যে
ফিরে এলাম হে নির্ভয়, তোমার চোখে শান্তি ।

বাতাসহীন অরণ্যের জীবন নিঃশব্দ
সাগর-ঢেউ যৌবনের মিথ্যে দুরাকাঙ্ক্ষা—
তারার মতো চক্ষে জ্বালে বিচ্ছেদের শঙ্কা,
অকস্মাৎ তোমাকে পাই যেন আকাশলব্ধ ।

তোমার হাতে তুলে দিলাম এতদিনের ক্লান্তি
এবার পাবো দিনের স্বাদ রাতের হিমস্পর্শ
আমাকে দাও দুঃখ, দাও দুঃখময় হর্ষ
তোমাকে জানি, হে নির্ভয়, তোমার চোখে শান্তি।

কবি

তার কোনো দুঃখ নেই, সে তো সব সুখেরও অতীত
তার চক্ষে আলো জ্বলে, সে আলোর বর্ণ নেই কোনো
তার বুকে এত ঘুম, ছুঁয়ে দেখি, সে তো নয় মৃত
যন্ত্রণার আভা দিয়ে তার মুখ আগুনে সাজানো।

তার কোনো দুঃখ নেই, সুখ নেই, শুধু এ জীবনে
দুরাশ্চর্য তপস্যায় গেঁথে যায় মুহূর্তের মালা
দিনের উজ্জ্বল ফুল, অন্তরের অন্তহীন বনে
রেখে যায় গন্ধে স্পর্শে অসহিষ্ণু যৌবনের জ্বালা।

তিনজন তরুণ কবি—একটি গ্রোটেস্‌ক্

কিছু পথ হেঁটে তারা তিনজনে সন্ধ্যার আঁধারে
মাছের চোখের মতো ম্লান রেস্তোরাঁয় বসলো এসে
চোখে চোখে অনির্দিষ্ট চিন্তা এসে ঘুরলো বারেবারে
যেন তারা কথা বলবে হাওয়ার নির্দেশে।

একজন ঈষৎ স্থূল, রুক্ষ চুল, দীর্ঘাকার গ্রীবা
অন্য দুটি শীর্ণকায়, দীপ্ত-চক্ষু, উত্তর-পঁচিশ
তারা সব এ যুগের হুলস্থূল দানবী প্রতিভা
আপন রক্তের সঙ্গে মিশিয়েছে সময়ের বিষ।

হিনটে কুটিল পোকা মগজের মধ্যে ঘুরে ফিরে
পাক খাচ্ছে, আর এক নামহীন ভয়ঙ্করী নদী

পাড় ভাঙছে অবিরাম—টানতে চাইছে অতল গভীরে,
তিনজন দাঁড়িয়ে আছে তার তীরে জন্ম থেকে যৌবন অবধি—

কিংবা তিনজনই হয়তো তিনটি নদী দেখছে মনে মনে
চোখের পাতার নিচে কয়েকটা পাখি ঘুরছে অজানা উৎসাহে
একদিন আমাকে টানবে এই নদী—কখন নির্জনে,
যদিও আপাত চিন্তা কফি কিংবা চায়ে।

শুনেছ হে এ মাসের—অবিকল পাড় ভাঙা নদীর মতন
কণ্ঠস্বরে,—শুরু হলো অকস্মাৎ মিষ্টি কটু সাহিত্য-কাহিনী
প্রচণ্ড প্রহার খেলো টেবিলটা—একসঙ্গে তারা তিনজন
সপ্ সপ্ চা খেলো, আর একজন তো নিলই না চিনি !

এ হেন সময় এক যুবতীকে বাহুতে জড়িয়ে ভাগ্যবান
আর একটি যুবক ঢুকলো, হেঁকে উঠলো, এই যে অমুক !
তুমিও আছো হে দেখছি—তুমিও যে, তিনজনেই বুঝি একপ্রাণ
আনন্দে কাটাচ্ছ সন্ধে ! ঘামের ফোঁটার মতো তরলিত সুখ

যুবকের ভ্রূ থেকে ঝরছে—শব্দ করে গেলো দূরের ক্যাবিনে
কি কথায় হেসে উঠলো একসঙ্গে—সরু মোটা দুটি কণ্ঠস্বর,
মনে হল মেঘ ডাকছে অবিশ্রান্ত বাদলের দিনে
অনেক এগুচ্ছে নদী, টান দিচ্ছে পার্শ্ববর্তী ঘর।

টেবিলে কনুই রেখে মুখোমুখি বসে রইলো তারা
শীতের হাওয়ার মতো রক্তে যেন অসহ নির্জন।
মাঝে মাঝে টুকরো হাসি, শুনতে পাচ্ছে টুকরো কথা, অস্পষ্ট ইশারা
ঠাণ্ডা পেয়ালার মতো পড়ে রইলো সেই তিনজন।

সহজ

কেমন সহজ আমি ফোটালাম এক লক্ষ ফুল
হঠাৎ দিলাম জ্বেলে কয়েকটা সূর্য চাঁদ তারা

আবার খেয়াল হলে এক ফুঁয়ে নেভালাম সেই জ্যোৎস্না
(মনে পড়ে কোন জ্যোৎস্না ?) নেভালাম সেই রোদ (তাও মনে পড়ে ?)

নিন্দুকে নানান কথা আমাকে দেখিয়ে বলবে, বিশ্বাস করো না।
হয়তো বলবে শিশু কিংবা নির্বোধ
অথবা ম্যাজিকওয়ালা—ছেঁড়া তাঁবু, ফাটা বাজনা, নানান সেলাই
করা কালো কোর্তা গায়ে লোকটা কি মারণ খেলা
খেলাচ্ছে আহারে ঐ মেয়েটার চোখে,
দর্শক ভুলছে না, হাসছে, আহা শুধু অবুঝ মেয়েটা
মায়ার অসুখে ভুগছে ;—বিশ্বাস করো না।

দেখ্ রে নিন্দুক দেখ্, বাম হাতে কনিষ্ঠ আঙুলে
ত্রিজগৎ ধরে আছি কেমন সহজে,
আমাকে অবাক চোখে দেখছে চেয়ে অন্ধকার, সমুদ্র, পাহাড়
শুধু কি তোরাই ভুললি বিস্ময়ের ভায়া !
আমার বাড়িতে আসবি, দেখবি সে কি আজব বাড়ি ?
মাথার উপরে ছাদ—চেয়ে দেখ্, চারদিকে দেয়াল রাখিনি,
(তোরাই দেয়াল ঘেরা, বুকে স্বপ্ন, শ্লেষ্মা নিয়ে চিরকাল থাকবি সাবধানে
আঙুলে বয়স গুনে—শখ করে সে দেয়ালে নানা ছবি এঁকে !)
আমার বাড়িতে দেখ্ অনুগত ভৃত্যের মতন
নানান জাতের হাওয়া ঘুরছে ফিরছে, ঝুল ঝাড়ছে ছাতের কার্নিসে
নানান রঙের টান দিয়ে দেখছে, ব্যস্ত দিন রাত।
আমি বসে ছবি আঁকছি দেয়ালবিহীন ঘরে মেয়েটির চোখে
বাইরের ছবির চেয়ে চোখের মণিতে ছবি কেমন সহজ !

তোরাই নির্বোধ শিশু, ফিরে যা নিন্দুক,—
আমাকে ম্যাজিকওয়ালা বললে তুমি বিশ্বাস করো না।

চতুর্দশপদী

অনিশ্চিত সর্বনাশে চিরকাল যুবকের নেশা
এই সত্য জেনে তুমি সুকুমার মৃণাল-শরীরে

ফোটালে বিষাক্ত পদ্ম ছদ্মবেশী মাধুর্যেতে মেশা
অনায়াসলভ্যমণি রেখে দিলে দুর্গ দিয়ে ঘিরে।
হিংস্র অন্ধকারে ভরা অরণ্যের মতো চুল খুলে
পৌরাণিক রূপসীর মতো তুমি মায়াবী-আলোকে
এ জন্মের স্বচ্ছ জ্ঞান লুকালে জঙ্ঘায়, যোনিমূলে
ভয়ঙ্কর, মনোলোভা সমুদ্র সাজালে দুই চোখে।

অনিশ্চিত সর্বনাশে চিরকাল যুবকের নেশা
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় ভ'রে, তোমার সে সমুদ্রের বুকে
অতল অতলে ডুবে, হারিয়েছে তৃপ্তির অন্বেষা
ছদ্মবেশী বিষপদ্ম দুই হাতে স্পর্শ করে সুখে।
তোমাকে ছাড়িয়ে দূরে, হারিয়েছে আকাঙ্ক্ষা অকূলে
জীবনের নীলকান্তমণিটিকে বুক থেকে তুলে।

স্বর্ণলতা

আমার উপমা নয়—আমি তাকে চাইনি মেলাতে
শীত এসে ছুঁয়ে দিল—দেবদারুর গায়ে স্বর্ণলতা
কুঁকড়ে গেল নিজে নিজে মুমূর্ষুর চোখে, মধ্যরাতে ;
আমার উপমা নয়, শীত তো শোনে না কারো কথা
নিশ্বাসে ছড়ায় বিষ, সময়ের মতো ক্রূর হাতে
মাটির গর্ভেতে রাখে বীজের নিজস্ব নীরবতা।
আমি তাকে তুলে দিইনি, আমি শুধু চাইনি জড়াতে
আবার দেবদারু গাছে ; মাটিতেই ঝরলে স্বর্ণলতা ?

নিজের উপমা নয়, তবে কার স্বরূপে মেলাবো ?
প্রেয়সীর নাম বলবো, সে হয়তো ঘুমন্ত এখন
একলা ঘরে, বিন্দু বিন্দু ঘামে মুখ ঈষৎ রক্তাভ,
স্রস্ত বেশ, নিশ্বাসের সঙ্গে দুলছে দৃঢ় দুটি স্তন ;
আমি তো এখনি তাকে, ইচ্ছে হলে দুই হাতে পাবো।

শীত কি ছুঁয়েছে তাকে, দেবদারুতে দুলছে নির্জন ?

অন্যপ্রাণ

দিনান্তের ফেরা পথে কোনোদিন দৈবাৎ কখনো
যদিবা পথের মোড়ে চোখ ফেলে থমকে দাঁড়াই
অনেক দৃশ্যের ফাঁকে অকস্মাৎ হয়তো বা কোনো
ভিখারী ছেলের মৃত্যু বুকে বিঁধে নিজেকে হারাই।
ঘন কালো রক্ত মাখা, সাক্ষ্যহীন বিকৃত শরীরে
চক্ষুকে যন্ত্রণা দেয় পথচারী যায় পিঠ ফিরে।
সেখানেও থামবো না অনন্ত কালের বাঁধা ঋণে
ক্ষণকাল চক্ষু বুজে চলে যাবো পদক্ষেপ শুনে।

কেননা নিজেকে আমি সঁপেছি কালের অঙ্গীকারে
দু'হাতে রেখেছি বাঁধা—সাংসারিক বঞ্চনার দায়ে
নিঃশব্দে মিলিয়ে গেছি জীবিকার নির্মম শিকারে
ক্ষণিক বিরুদ্ধ-যুদ্ধে পরাজয়-চিহ্ন সারা গায়ে।
তবু কোনো দুঃখ নেই, তুচ্ছ সব আনন্দ বেদনা
উন্মুখ হৃদয়ে আছি কাকে যেন দিতে অভ্যর্থনা।
এক মৃত্যু পার হলে, আরো বহু মৃত্যুর শিয়রে
বাঁচার আশ্চর্য তৃষ্ণা জেগে উঠবে নিশীথ প্রহরে।

ভিখারী ছেলের মৃত্যু ক্ষণতরে যদি বেঁধে বুকে
তাও ফেলে চলে যাবো দ্বিধাহীন বাঁচার সম্মুখে।

বৃষ্টির ইতিহাস

আসন্ন আষাঢ় তাই রৌদ্র-প্রার্থী মন
মেঘের মলিন চিত্র বিষণ্ণ আকাশে
ঝড় দিয়ে মুছে বলে, অত্যাগসহন
যে আমার চোখে আছে, তার অপ্রকাশে
মিথ্যে এই পৃথিবীর দিন রাত্রি বোনা
মিথ্যে মৃত্তিকার গর্ভে বীজের বাসনা।

কে তার দু'চোখে আছে ? আসন্ন আষাঢ়
নিরন্তর খোঁজে তাই শূন্যে বলে ডেকে
আমার যা কিছু ছিল সে ভালোবাসার
মৃত্যু হোক, যে তোমার হৃদয়ের থেকে
উদ্ভিদ শিশুকে হয়তো ছোঁয়াবে আকাশ—
আমার বর্ষণ হোক প্রার্থনার মতো
আমার আভাসে তার উজ্জ্বল প্রকাশ
দিকে দিকে ব্যাপ্ত হোক, আমি হই মৃত ।

একজন মানুষের গল্প

নায়ক শহরে কোনো এক মসীপণ্য
দিনের প্রকৃতি মুছে গেছে তার চোখে
সেই অভিমানে সেও মিলে গেল পথে অগণ্য লোকে
অকৃপণ হাতে সময় ছড়ালো তার ;

সংসার তাকে করেছে ছিন্ন ভিন্ন
তীব্র নখরে চিহ্ন এঁকেছে দেহে
সোনার প্রভাত কোনোদিনও তাকে দেখলো না সস্নেহে
তাই সে দু'চোখে ছবি আঁকে সন্ধ্যার ।

পাখিও তো নয়, সন্ধ্যায় পাবে মুক্তি
খড়কুটো আর উষ্ণ বুকের নীড়ে,
অরণ্য নয় লুকোবে নিজেকে, চেনা মানুষের ভিড়ে
তৃণের মতন ভাসে সময়ের স্রোতে !

দিনের আলোকে জমে জীবনের মুক্তি
ক'জন মানুষ পায় তার সন্ধান ?
তবু অনেকেই খুঁজে খুঁজে করে জীবন ছত্রাখান
কেউ যায় দূরে সাগরে বা পর্বতে ।

আমার নায়ক চায়নি বাঁচার দ্বন্দ্ব
ছোট সুখ থেকে ঐশ্বর্যের আশা,
মহাকাব্যের নায়কের মতো কেড়ে নিয়ে ভালোবাসা
বাঁচতে চায়নি সে কখনও মনে মনে।

সে শুধু চেয়েছে পরিচিত কোনো ছন্দ
লিরিকের মতো চেনা শব্দের সুর
রাত্রে যখন বাড়িতে ফিরবে মনে হবে বহু দূর
নিজের সঙ্গে দেখা হবে নির্জনে।

তখন সে পাবে অচেনা দিঘির মৌন
হৃদয় গভীর অবসরে সমতল
হয়তো শুনবে নিজের রক্তে রাত্রির চলাচল
আঁধার সাগরে কখনও ডাকবে বান।

মেলাবে দুঃখ, মুখ্য কিংবা গৌণ
শিমুল শাখায় প্রতীক বাসনা ঝড়ে—
বৃষ্টিতে আর হাওয়ার দাপটে ফুটবে নানান স্তরে,
কোনো কুমারীর শরীর করবে পান।

পাপ

একটি চাতক তার ধর্ম ভুলে কর্দমাক্ত দীর্ঘিকার জল
পান করেছিল, তাই আমি তাকে মৃত্যুহীন তৃষ্ণার আঙুলে
সামান্য শরীর ঘিরে পরিয়েছি অনন্তের কঠিন শৃঙ্খল
একান্তে রেখেছি তাকে এক রমণীর বুকে, বন্ধ দ্বার খুলে।

সেই বন্ধ দ্বারে যেন বন্দী আছে নরকের তীব্র অন্ধকার
তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভরে সেখানেই থাক সেই ধর্মভ্রষ্ট পাখি
আমার খেয়ার নৌকো ঘুরে ঘুরে আসবে আর যাবে বারংবার
শস্যহীন প্রান্তরের মতো শুধু রাত্রিদিন সে রবে একাকী।

সেই রমণীর স্তনে কখনো শিশুর মতো করবো বিষপান
আশঙ্কায় কেঁপে উঠবে তার দুই জঙ্ঘা আর ক্ষীণ কটিদেশ
এক হাতে মৃত্যু আর অন্য হাতে জীবনের লুণ্ঠিত সম্মান
নিয়ে, তাকে দেবো আমি সুখ দুঃখ বিস্মৃতির নিবিড় আশ্লেষ।

কান্নায় কান্নায় ভরে কাঁপবে পাখি, বেজে উঠবে কঠিন শৃঙ্খল
যখন সন্ধ্যার মেঘে বিদ্যুতের শিখা জ্বলবে, ঝরবে ধারাজল।

অনুভব

একসঙ্গে জেগে উঠি দু'জনেই, হে সবিতৃদেব,
দেখা হয় নিরালায় আমার ছাতের একলা ঘরে
নানা কথা বলি আমরা, দুঃখ সুখ অজস্র হিসেব,
আকাশের ঘন-নীল চোখে মুখে গায়ে মাখি দুই হাত ভরে
ছড়াই, জমিয়ে রাখি, বুকের মধ্যেও একটু নীল
সঙ্গোপনে রাখা থাকে—দু'জনের এইটুকু মিল।

এইবার যেতে হবে দু'জনের, দু'মুখো সংসারে
কোথায় সায়াহ্ন আছে, তুমি তাকে খুঁজবে ঘুরে ফিরে
কুন্তলে লুকিয়ে আলো, সে যখন আসবে অন্ধকারে
তুমি চলে যাবে দূরে ; কোথায় ? হয়তো অন্য নীলের গভীরে।

আমিও একলা ঘুরি পথে পথে, দিবালোকে দুই চক্ষু বুজে
বুকের জমানো নীল কাকে দেবো যেন তাই খুঁজি।

চিরহরিৎ বৃক্ষ

শ্মশানে পিতৃপুরুষের কঙ্কাল, তার ফাঁকে ফাঁকে শিরশির
করে বয়ে যাচ্ছে বাতাস।
আমার সাধ ছিল সেই বাতাসের ভাষা শুনি।

একদিন তাই অন্ধকার নদীর কিনারায় নিভে আসা
চিতাকুণ্ডের পাশে শুয়ে ছিলাম আমি, জীবন্ত।

কোথা থেকে পাখার শনশন শব্দ করে একটা বিশাল
বাজ পাখি উড়ে এসে বসলো আমার শরীরে।
যে মেয়েটিকে কাল আমি স্বামীগৃহে যেতে দিয়ে এসেছি তার
দৃষ্টির মতো তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে সারারাত সেই ভয়ঙ্কর পাখি
ছিন্নভিন্ন করে খেলো আমার শরীর, আমার চোখে মুখে বাহুতে
ক্ষত, আমার রক্তে মিশলো রাত্রির শিশির।
আমার প্রাণটাকে বার করে এনে কি ভেবে অবহেলায়
আবার মৃতদেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল সে ;
নিজের মৃতদেহে ভর করে আবার আমি জেগে উঠলাম।

তাই প্রথম সন্তানের জন্ম দিতে পিতৃগৃহে আসা রমণীটি
আমাকে আর চিনবে না। আমি ঘুরবো ফিরবো গোপন
করে আমার শরীর থেকে শবের গন্ধ। আর মাঝে মাঝে
স্বপ্ন দেখবো সেই শ্মশানের পাশে এক আশ্চর্য
চিরহরিৎ বৃক্ষ—তার পাতা ঝরে না, তার মৃত্যু হয় না,
বাতাসের ভ্রান্তিহীন শব্দে ডাক দেয়, এসো, এসো, পাখির মতো
বাসা বাঁধো আমার আশ্রয়ে। সে আমার জন্মের
আগেও বেঁচে ছিল—আমার মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকবে।

নেশা

স্বপ্ন থেকে মুক্তি নেই—শীতের সাপের মতো ঘুমন্ত হৃদয়
গভীর গভীরতর অন্ধকারে, পৃথিবীর একনিষ্ঠ আদিম নেশায়
মগ্ন হয়, ব্যাপ্ত হয় ; স্বপ্নের কুহকে বন্দী কঠিন সময়
আপন পূর্ণতা খোঁজে—লোভী, নীচ, বাসনার ব্যর্থ অন্বেষায়।

যে শান্ত নদীর কূলে একদা জন্মেছি আমি আনন্দের ঘরে
সেই নদী বন্যা-বেগে আমাকে ভাসাতে চায় দূরের সাগরে।
যে পারিপার্শ্বিকে আমি অবিচ্ছেদ্য সূর্য আর পৃথিবীর মতো
তার প্রতি ঘৃণা আনে স্বপ্নের সর্বঘ্ন মোহ—হানে ক্রমাগত।

সুখ চাই তীব্র সুখ তার চেয়ে দুঃখ চাই আরো তীব্রতর
দুঃখের বিলাসে আমি অতৃপ্তির তীব্র সুরা চাই পাত্র ভরা
যা পেয়েছি সব মিথ্যে—যা কিছু পাবার ছিল তারও চেয়ে বড়
দু'বাহু বন্ধনে যাকে ধরে রাখি, মনে হয় আজও সে অধরা।

স্বপ্ন থেকে মুক্তি নেই—বন্দী হয়ে আছি সেই আদিম নেশায়
ভুলে গেছি—এ-জীবনে ছোট ছোট সুখ দুঃখ নিয়ে বাঁচা যায়।

অনির্দিষ্ট নায়িকা

ফিরে যাবো, শীত শেষে অবিশ্বাসী মরালের মতো
অন্ধকার শুভ্র হলে, ফিরো যাবো, হে সখি নিরালা,
উরসে চন্দন গন্ধ, বিন্দু বিন্দু রক্ত ইতস্তত
তোমার শিশির-স্বাদ মুখ আর দৃষ্টিপাত মালা—
ফেলে আমি চলে যাবো, নির্বাসনে, হে সখি নিরালা।

যৌবন আশ্রিত বুঝি দীর্ঘ ঋজু রাত্রির শরীরে ;
দিনের আলোয় তুমি, ভীরু প্রাণ পতঙ্গের মতো।
আমাকে ডেকেছো তাই স্রোতস্বিনী তমসার তীরে
অসহিষ্ণু বাসনায় নিজেকে ঢেকেছো অবিরত।

দিনের আলোয় তুমি মৃত্যুমুখী পতঙ্গের মতো।

করুণ শয্যায় লগ্ন ঘন নীল তোমার বসন—
সমুদ্র, আকাশ কিংবা শৈশব-স্মৃতির মতো নীল,
তুলে নাও নতমুখে, লজ্জা ঢাকো, বিচ্ছেদের ক্ষণ
বিষাদের নীল শিখা চক্ষে জ্বালো, তারো সঙ্গে মিল

সমুদ্র আকাশ কিংবা শৈশব-স্মৃতির মতো নীল।

ফিরে যাবো সব ফেলে দুঃখে, সুখে, হে সখি নিরালা,
শরীরে স্পর্শের স্বাদ মুছে নেবে দিবসের চোখ

জনারণ্য উপহার দেবে শুধু অতৃপ্তির জ্বালা
আবার উষসী এলে ফিরে পাবো বিচ্ছেদের শোক।

চতুর্দিকে রবে শুধু দিবসের শত তীক্ষ্ণ চোখ।

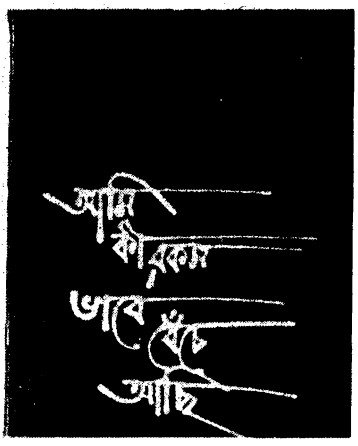

আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি

সূচিপত্র

স্বপ্ন, একুশে ভাদ্র ৫১, মহারাজ, আমি তোমার ৫১, অসুখের ছড়া ৫২, হঠাৎ নীরার জন্য ৫৩, আর্কেডিয়া ৫৪, আটাশ বছরে ৫৫, শুধু কবিতার জন্য ৫৬, রাত্রির বর্ণনা ৫৭, চোখ বাঁধা ৫৮, বায়ু, তুমি ৫৯, আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায় ৫৯, জুয়া ৬০, বড় বেশি ৬১, প্রত্যেক তৃতীয় চিন্তা ৬২, শব্দ ১৬৩, সাবধান ৬৪, আমার কয়েকটি নিজস্ব শব্দ ৬৫, অপমান এবং নীরাকে উত্তর ৬৫, তুমি শব্দ ভেঙেছিলে ৬৬, হিমযুগ ৬৭, ঘুম ৬৮, শেষ যাত্রী ৬৯, নির্বাসন ৬৯, মুখ দেখাদেখি ৭১, মেয়েদের জন্য ভুল ছন্দে ৭২, অবেলায় ৭৩, জ্বলন্ত জিরাফ ৭৩, পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না ৭৪, প্রেমবিহীন ৭৫, রাখাল ৭৬, পৌঁছোনো যাবে না ৭৭, খিদে ৭৭, কয়েক মুহূর্তে ৭৮, একটি কবিতা লেখা ৭৯, নীরা তোমার কাছে ৮৩, আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি ৮৪, স্মৃতির প্রতি ৮৫, নিয়তি ৮৬, না লেখা কবিতা ৮৭, ভ্রমণ ৮৮, অমলের স্ত্রীর জন্য ৮৯, আমি ও কলকাতা ৯০, অনর্থক নয় ৯১, এক সন্ধেবেলা আমি ৯৩, একই স্বপ্ন দু'জনে দেখেছি ৯৪, নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা ৯৫, চোখ বিষয়ে ৯৭, দুপুরে রোদ্দুরে ৯৮, মায়াজাল ৯৯, ক্লান্তির পর ৯৯, মৃত্যুদণ্ড ১০০, নীরা ও জীরো আওয়ার ১০১, বিড়াল ১০৩, একবার হাসপাতালে যাও ১০৩, তিন ঘণ্টা বিচ্ছেদ ১০৪, মালতী ১০৫, শব্দ ২ ১০৬, কাটামুণ্ডের দিবাস্বপ্ন ১০৬, 'সকল ছন্দের মধ্যে আমিই গায়ত্রী' ১০৭, আমার ছায়া ১০৮, অসমাপ্ত ১০৯, দ্বিধা ১১০, বহুদিন পর প্রেমের কবিতা ১১১, হাওয়া এসে ১১২, এই হাত ছুঁয়েছিল ১১৩, নারী ও নগরী ১১৪, এবার কবিতা লিখে ১১৫, অচেনা ১১৫, দাঁতের ব্যথায় ভুগছেন একজন দার্শনিক ১১৬, দু'জনের কাছে ঋণ ১১৬, দেখা হবে ১১৭

স্বপ্ন, একুশে ভাদ্র

কোন দিকে ? কোন দিকে ? আমি চিৎকার করলুম
অমনি ভিড়ের ভিতরে
একটা মোহর এসে ছিট্‌কে পড়লো। তৎক্ষণাৎ নৈঋত বাদ দিয়ে
সাতদিকে সাতটা রাস্তা খুলে গেল এবং জ্যোৎস্নায়
বড় চিত্তহারী সেই পথগুলি এবং জ্যোৎস্নায়
ভিড়ের প্রতিটি টুকরো শত শত হুইস্‌ল বাজিয়ে ছুটে গেল
ব্যক্তিগত পথে পথে। কোন দিকে ? কোন দিকে ?
আমি তীব্র ধাবমান
কয়েকটি কলার চেপে হেঁকে উঠি, কি করে জানলেন এইটা ঠিক
পথ ? নাকি যে-কোনো রাস্তায় ?
তাদের উত্তর : পথ ও রাস্তার মধ্যে বহু ভেদ আছে, ইডিয়েট !

পথ কিংবা রাস্তা আমি কোনটায় নামবো বহু ভেবে শেষটায়
পথেই নামলুম। কেননা 'পথিক' এই সুদূর শব্দটি
বড়ই রোমাঞ্চকর। তার বদলে 'রাস্তার লোকটা' ?
পরমুহূর্তেই, হায়, কয়েকশত প্রেমিক ও
কবিদের স্তুতি, উপমার
ভয়ঙ্কর নেকড়েগুলি ছিঁড়ে চুষে খেয়ে ফেললো
আমার শরীর, রক্ত, দু' চোখের মণি।

মহারাজ, আমি তোমার

মহারাজ, আমি তোমার সেই পুরনো বালক ভৃত্য
মহারাজ, মনে পড়ে না ? তোমার বুকে হোঁচট পথে
চাঁদের আলোয় মোট বয়েছি, বেতের মতো গান সয়েছি
দু'হাত নিচে, পা শূন্যে—আমার সেই উদোম নৃত্য
মহারাজ, মনে পড়ে না ? মহারাজ, মনে পড়ে না ? মহারাজ,
চাঁদের আলোয় ?

মহারাজ, আমি তোমার চোখের জলে মাছ ধরেছি
মাছ না মাছি কাঁকুরগাছি, একলা শুয়েও বেঁচে তো আছি
ইষ্টকুটুম টাকডুমাডুম, মহারাজ, কাঁদে না, ছিঃ !
অমন তোমার ভালোবাসা, আমার বুকে পাখির বাসা
মহারাজ, তোমার গালে আমি গোলাপ গাছ পুঁতেছি—
প্রাণঠনাঠন ঝাড়লণ্ঠন, মহারাজ, কাঁদে না, ছিঃ !

মহারাজ, মা-বাপ তুমি, যত ইচ্ছে বকো মারো
মুঠো ভরা হাওয়ার হাওয়া, তা কেবল তুমিই পারো ।
আমি তোমায় চিমটি কাটি, মুখে দিই দুধের বাটি
চোখ থেকে চোখ পড়ে যায়, কোমরে সুড়সুড়ি পায়
তুমি খাও এঁটো থুতু, আমি তোমার রক্ত চাটি
বিলিবিলি খাণ্ডাগুলু বুম্ চাক ডবাং ডুলু
হুড়মুড় তা ধিন্ না উসুখুসু সাকিনা খিনা
মহারাজ, মনে পড়ে না ?

অসুখের ছড়া

একলা ঘরে শুয়ে রইলে কারুর মুখ মনে পড়ে না
মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না
চিঠি লিখবো কোথায়, কোন মুণ্ডহীন নারীর কাছে ?
প্রতিশ্রুতি মনে পড়ে না চোখের আলো মনে পড়ে না
ব্লেকের মতো জানলা খুলে মুখ দেখবো ঈশ্বরের ?

বৃষ্টি ছিল রৌদ্র ছায়ায়, বাতাস ছিল বিখ্যাত
করমচার সবুজ ঝোপে পূর্বকালের গন্ধ ছিল
কত পাখির ডাক থামেনি, কত চাঁদের ঢেউ থামেনি
আলিঙ্গনের মতো শব্দ চোখ ছাড়েনি বুক ছাড়েনি
একলা ছিলুম বিকেলবেলা, বিকেল তবু একা ছিল না
একটা মুখ মনে পড়ে না, মনে পড়ে না মনে পড়ে না ।

এত মানুষ ঘুমোয় তবু আমার ঘুমে স্বপ্ন নেই
স্বপ্ন না হয় স্মৃতি না হয় লোভ কিংবা প্রতিহিংসা
যেমন ফুল প্রতিশোধের স্পৃহায় আনে বুকের গন্ধ
রমণী তার বুক দেখায়, ভালোবাসায় বুক ভরে না
শরীর নাকি শরীর চায়, আমার কিছু মনে পড়ে না
মনে পড়ে না মনে পড়ে না—মেঘলা মতো বিস্মরণ
যেমন পথ মুখ লুকিয়ে ভিখারিণীর কোলে ঘুমোয়।

বৃক্ষ তোমার মুখ দেখাও, দেখি আকাশ তোমার মুখ
এসো আমার গত জন্ম তোমায় চেনা যায় কি না
কোথাও নেই মুখচ্ছবি এ কী অসম্ভব দৈন্য—
আমার জানলা বন্ধ ছিল উঠেও ছিটকিনি খুলিনি
জানলা ভেঙে ঢোকার বুদ্ধি ঈশ্বরেরও মনে এলো না ?
আমায় কেউ মনে রাখেনি, না ঈশ্বর না প্রতিমা....

হঠাৎ নীরার জন্য

বাস স্টপে দেখা হলো তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল
স্বপ্নে বহুক্ষণ
দেখেছি ছুরির মতো বিঁধে থাকতে সিন্ধুপারে—দিকচিহ্নহীন—
বাহান্ন তীর্থের মতো এক শরীর, হাওয়ার ভিতরে
তোমাকে দেখেছি কাল স্বপ্নে, নীরা, ওষধি স্বপ্নের
নীল দুঃসময়ে।

দক্ষিণ সমুদ্রদ্বারে গিয়েছিলে কবে, কার সঙ্গে ? তুমি
আজই কি ফিরেছো ?
স্বপ্নের সমুদ্র সে কি ভয়ঙ্কর, ঢেউহীন, শব্দহীন, যেন
তিন দিন পরেই আত্মঘাতী হবে, হারানো আঙটির মতো দূরে
তোমার দিগন্ত, দুই উরু ডুবে গেছে নীল জলে
তোমাকে হঠাৎ মনে হলো কোনো জুয়াড়ীর সঙ্গিনীর মতো,
অথচ একলা ছিলে, ঘোরতর স্বপ্নের ভিতরে তুমি একা।

এক বছর ঘুমোবো না, স্বপ্ন দেখে কপালের ঘাম
ভোরে মুছে নিতে বড় মূর্খের মতন মনে হয়
বরং বিস্মৃতি ভালো, পোশাকের মধ্যে ঢেকে রাখা
নগ্ন শরীরের মতো লজ্জাহীন, আমি
এক বছর ঘুমোবো না, এক বছর স্বপ্নহীন জেগে
বাহান্ন তীর্থের মতো তোমার ও-শরীর ভ্রমণে
পুণ্যবান হবো।

বাসের জানলার পাশে তোমার সহাস্য মুখ, 'আজ যাই,
বাড়িতে আসবেন।'
রৌদ্রের চিৎকারে সব শব্দ ডুবে গেল।
'একটু দাঁড়াও', কিংবা 'চলো লাইব্রেরীর মাঠে', বুকের ভিতরে
কেউ এই কথা বলেছিল, আমি মনে-পড়া চোখে
সহসা হাতঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠেছি, রাস্তা, বাস, ট্রাম,
রিকশা, লোকজন
ডিগবাজির মতো পার হয়ে, যেন ওরাং উটাং, চার হাত-পায়ে ছুটে
পৌঁছে গেছি অফিসের লিফ্‌টের দরজায়।

বাস স্টপে তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল স্বপ্নে বহুক্ষণ।

আর্কেডিয়া

এই বিকেলটা অন্যরকম জীবন আমার ছিঁড়ে নেবো জমিয়ে
রাখবো বাক্সে
চেনা রাস্তায় ঘুরবো একটা মাঠের মধ্যে বাড়ি আমার
পকেট ভর্তি ঠিকানা
আজকে আমি নত হবো কান্না পেলে লুকোবো না
চাইনে আজ বন্ধুবান্ধব ভাববে ওরা গেছি আমি চাইবাসায়
কিংবা ফরাক্কাবাদ—
ওদের চক্ষু এড়িয়ে আজ পালিয়ে ফিরবো আমি, হাওয়া
তোমায় নাম জানায় কিনা অন্যরকম আর্কেডিয়া

ডবল ডেকার থেকে নেমেই ছুটতে ছুটতে একটা মেয়ের কাছে বলবো
তোমায় আমি ভালোবাসি বিষম ভালো যেমন ভাবে লক্ষ কোটি মানুষ
ভালোবাসে ভালোবাসায়—একটা চুমুর জন্যে মরে ছাদে লুকোয়
বারান্দার কোণে
চোখাচোখির খেলা খেলে—আমিও চাই অমনি না হয় একটা বিকেল
অনাধুনিক হয়েই রইলুম কেইবা দেখছে

পঁচিশ জন্ম আগে আমি ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম
পঁচিশ জন্ম পিছন ফিরে প্রাচীন জন্মে ফিরে এলাম

তুষারমণ্ড ভেড়ার পাল ওরা কেমন খেলে বেড়ায় মেঘলা-করা দুপুরবেলা
পপ্‌লারের বনে শব্দ ঝর্ণা থেকে প্রতিশব্দ ভ্রমর কিংবা ঝর্ণা
বাঁশী কোথায় ? লুকোস না রে দে ভার্জিল চেনা সুরটা বাজাই একলা—
চতুর্দিকে বাঁশীর গন্ধ আকাশ থেকে বাঁশীর গন্ধ টিলার উপর দাঁড়িয়ে—
এমন শান্ত সমাধিটা আমার, দেখো আমিও ছিলাম আর্কেডিয়ায়
আমিও ছিলাম
দ্যাখ্ ভার্জিল আজও আমায় বাঁশী হাতে মানায় কিনা !

আটাশ বছরে

মৃত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে চোখে চোখে কথা শেষ হয়
তুমি কিংবা আপনি বলবো মনেও পড়ে না
জানলায় বাদুড় এসে হেসে যায় দগ্ধ ভোরবেলায়
বিবাহিতা রমণীরা সিঁড়ির উপর থেকে চকিতে দাঁড়িয়ে
যেন বহু কষ্টে কেনা
মুণ্ডহীন হাসি দিয়ে চলে যায় ঝুল বারান্দায়,
এখন প্রত্যেক দিন দাড়ি না কামালে আর বাঁচে না সম্মান,
রক্তের সমুদ্রে এক দ্বীপ আছে সেখানে স্টিমার ছাড়ে সঠিক দশটায় ।

সকালে কলম দিয়ে খুঁচিয়ে ভেঙেছি একটা ভিমরুলের বাসা
বহুক্ষণ একা একা ঘুরে ঘুরে উড়ে গেল করুণ ভিমরুল
(ওদের ললাটে দেখছি শিল্পী মার্কা দুঃখের জড়ুল !)

বিশাখার জন্মদিনে সন্ধেবেলা জমবে এক বিষম তামাশা
সেখানে ভিমরুল-তত্ত্ব জানতে হবে, অথবা হাজির হবো
ছোকরা অধ্যাপকের বাড়িতে
এবং লুকিয়ে আমি সিগারেট জ্বালতে গিয়ে অতিশয় যত্নে সাবধানে
সদ্য কেনা বেডকভার নিশ্চয় পুড়িয়ে আসবো ওর, অতর্কিতে।

স্টোভের শব্দের মতো কি যেন রয়েছে অবিরল এই বুকের মাঝখানে।
তাস খেলতে কৃপা লাগে, বিরলে সময় পোড়ে সিগারেটে শুধু কিছুক্ষণ
জেতায় আনন্দ নেই, হেরে গেলে ক্রোধ আসবে কবে ?
কুমারীরা চিঠি লেখে, আমার হৃদয়ে নেই রক্তের ক্ষরণ
বাথরুমে নগ্ন নারী হঠাৎ দেখলে আর শরীর কাঁপে না
জানলার পুরোনো শিক ভেঙে ভেঙে সুর আসে উদাস মন্ত্রের—
মৃত্যুর অতীব কাছে দিন কাটিয়েছি আমি অনেক উৎসবে।
দুমড়ানো, পায়ের নিচে পড়ে থাকে, পাণ্ডুলিপি, শিয়রে গ্রন্থের
অগোছালো স্তূপ থেকে ভেসে আসে শবের দুর্গন্ধ।

সিঁড়িতে বিষম অন্ধকার, আঃ, ঘড়ির শব্দের মতো এমন কুৎসিত
আর কিছু নেই এই পৃথিবীতে—অমিত, অমিত !
তোমার বাড়িতে আজ থাকতে দেবে ? চলে যাবো কাল ভোরবেলায়
অতীশ অমল ওরা—লুকিয়েছে সংসারের রুক্ষ ঝামেলায়
পত্নীর স্তনের বোঁটা থেকে ঠোঁট তুলে এনে মধ্যরাতে এখনও অমিত
পুরনো বন্ধুর মুখ তোমারও কি দেখতে সাধ নেই ?

শুধু কবিতার জন্য

শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম, শুধু কবিতার
জন্য কিছু খেলা, শুধু কবিতার জন্য একা হিম সন্ধেবেলা
ভুবন পেরিয়ে আসা, শুধু কবিতার জন্য
অপলক মুখশ্রীর শান্তি এক ঝলক ;
শুধু কবিতার জন্য তুমি নারী, শুধু
কবিতার জন্য এত রক্তপাত, মেঘে গাঙ্গেয় প্রপাত
শুধু কবিতার জন্য, আরো দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকতে লোভ হয়।

মানুষের মতো ক্ষোভময় বেঁচে থাকা, শুধু কবিতার
জন্য আমি অমরত্ব তাচ্ছিল্য করেছি।

রাত্রির বর্ণনা

সম্রাজ্ঞী বাইরে আছেন, শেষ রাত্রে গোপনে ফিরবেন
দ্বার খুলে দিও রক্ষী, ঘুমের অপর নাম মৃত্যু, মনে রেখো।
ততক্ষণ দাসীদের সঙ্গে কিছু মস্করায় সময় কাটাতে পারো হয়তো,
রূপসী রমণীদের সব দিতে পারো, শুধু দৃষ্টি বাঁধা দিও না ক্ষণেকও।

পৃথিবী দেওয়ালে ক্ষুদ্র, গুমরে ওঠে বন্দিশালা, কিন্তু দেখো
চোখের তারায়
একটি সহস্রদল নীল পদ্ম ফুটে আছে, রাত্রির আকাশ—
অথবা সমুদ্র বুঝি সহস্র মন্দার পুষ্পে, প্রতীক্ষায়, সজ্জিত রয়েছে
একটি দেবদারু বৃক্ষ চিরকাল একা থেকে শুষে নিচ্ছে পৃথিবীর সুচারু নিশ্বাস।

প্রহরের ঘণ্টা বাজে, হে প্রহরী, রক্তের গমন ধ্বনি কখনো
শুনেছো ?
যারা ঘুমে ঢলে আছে, তারা সব মৃত-রক্তে,
অন্ধকারে মগ্ন থেকে যাবে
তিন বেদনার দীক্ষা নিঃস্ব বাদুড়ের মতো শূন্যপথে দিয়ে যাবে
নির্লিপ্ত ত্রিকাল
তোমার ললাট জ্বলবে নীল শিখায়, দুই চক্ষের রহস্যের
অন্তরাল পাবে।

সম্রাজ্ঞী বাইরে আছেন, শোনো রক্ষী, খুলে দিতে হবে সিংহদ্বার
তঞ্চক ইন্দ্রিয়বর্গ যেন না লুকায় ইতস্তত
জীবনের ধৃতি-রূপ তিনটি আদিম দুঃখে শস্ত্রপাণি হয়ে থেকো তুমি
অকস্মাৎ বুঝতে পারবে সব পদপাত শব্দ, শোণিত প্রবাহ অন্তর্গত।

চোখ বাঁধা

অরুন্ধতি, সর্বস্ব আমার
হাঁ করো, আ-আলজিভ চুমু খাও, শব্দ হোক ব্রহ্মাণ্ড পাতালে
অরুন্ধতি, আলো হও, আলো করো, আলো, আলো,
অরুন্ধতি, আলো—
চোখের টর্চলাইট নয়, বুকে আলো, অরুন্ধতি, লাইট হাউস হয়ে
দাঁড়াবে না ?

বুকের উপরে দুই পা, ফ্লরোসেন্ট উরুদ্বয়,
মন্দিরের দেয়ালে মাছের
রূপ মনে পড়ে,—কেন এত রূপ ? রূপ বুঝি জন্মান্ধের খাদ্য,
বুঝি মহিষের টুকরো লাল কাপড়—
জলে ডুবে সূর্য স্তব, চোখ বেঁধে প্রণয়ের মতো
অরুন্ধতি, জীবন সর্বস্ব, নাও চোখ নাও, বুক নাও,
ওষ্ঠ নাও, যা তোমার ইচ্ছে তুলে নাও
তুলে নাও, নষ্ট করো, ভাঙো বা ছড়াও, ফেলে দাও, অরুন্ধতি !

যদি ভালোবাসা দাও, অরুন্ধতি, কবিতার পিঠে ছুরি মেরে
সহমরণের ব্রতে চলে যাবো, সেই ভালো, একটা চোখ
ছুঁড়ে দিও জলে—
বড় সাধ ছিল আমি স্বর্গে যাবো, মুখ লুকাবো এমন বুকের
ছায়া আছে আর কোথায়, নেই পৃথিবীর উপবনে, নেই রেখাচিত্রে
মাংসের হরষে
না-লুকানো মুখগুলি বড় ব্যস্ত, বড় উপশিরাময়, যেন ঘোরে
প্রতিশোধে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যায়,
মহাশূন্যে, সর্বনাশে
আমিও অপ্রেম থেকে ফিরে এসে, অরুন্ধতি, তোমার চোখের
অশ্রুপান করি ।
আমিও পৃথিবী, স্বর্গ, কলেজ স্ট্রীটের মহা অগ্নিকাণ্ড দেখে
শিল্পকে প্রহার করি, ভেঙেচুরে নষ্ট করি, লাথি মেরে নরকে পাঠাই
তোমার শরীর শিল্প, আমার শরীর শিল্প, অরুন্ধতি তোমার আমার ।

বায়ু, তুমি

বায়ু, তুমি আমাকে পবিত্র করো, আমার প্রতিটি রক্ত-কণিকাকে ডাক
দাও, ডেকে বলো প্রতিটি বিষণ্ণ জন্ম। ওদের প্রত্যেককে স্নান করিয়ে
প্রত্যেকের হৃদয়ে সুগন্ধ দাও—যেন আর কোনোদিন অন্ধকার সিঁড়ির
নিচে অতর্কিতে ছুরি হাতে না দাঁড়ায়—।

আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়

যে পান্থনিবাসে যাই দ্বার বন্ধ, বলে, 'ঐ যে রুগ্‌ণ ফুলগুলি
বাগানে রয়েছে শুধু, এখন বসবেন ?' কেউ মুমূর্ষু অঙ্গুলি
আপন উরসে রেখে হেসে ওঠে, পাতা ঝরানোর হাসি, 'এই অবেলায়
কেন এসেছেন আপনি, কি আছে এখন ? গত বসন্ত মেলায়
সব ফুরিয়েছে, আর আলো নেই, দেখুন না তার ছিঁড়ে গেছে,
সব ঘরে
ধুলো, তালা খুলবে না এ জন্মে ; পরিচারিকার হাতে কুষ্ঠ !'
ভগ্ন কণ্ঠস্বরে
নেবানো চুল্লীর জন্য কারো খেদ, কেউ কেউ আসবাববিহীন
বুকের শীতের মধ্যে শুয়ে আছে, মৃত্যু বহু দূর জেনে, চৈত্রের রুক্ষ দিন
চিবুক ত্রিভাঁজ করে, প্রতিটি সরাইখানা উচ্ছিষ্ট পাঁজরা ও রক্তে
ক্লিন্ন হয়ে আছে
বাগানে কুসুমগুলি মৃত, গন্ধহীন, ওরা বাতাসে প্রেতের মতো নাচে।

আমার আগের যাত্রী রূপচোর, তাতার দস্যুর মতো বেপরোয়া,
কব্জি শক্তিধর,
অমোঘ মৃত্যুর চেয়ে কিছু ছোট, জীবনের প্রশাখার মতো ভয়ঙ্কর
সেই গুপ্তচর পান্থ আগে এসে ছেঁচে নিলো শেষ রূপ রস—
ক্ষণিক সরাইগুলি, হায় ! এখন গ্রীবায় ছিন্ন ইতিহাস, ওষ্ঠে,
চোখে, মসীলিপ্ত পুঁথির বয়স।
আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়, জুতোয় পেরেক ছিল,
পথে বড় কষ্ট, তবু ছুটে
এসেও পারি না ধরতে, ততক্ষণে লুট শেষ, দাঁড়িয়ে রয়েছে সব
ম্লান ওষ্ঠপুটে।

জুয়া

অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় জীবন বদলে নিলাম আমি ও নিখিলেশ,
হাতঘড়ি ও কলম, পকেটবই, রুমাল—
রেডিওতে পাঁচটা বাজলো, আচ্ছা কাল
দেখা হবে,—বিদায় নিলাম,—সন্ধেবেলার রক্তবর্ণ বাতাস ও শেষ
শীতের মধ্যে, একা সিঁড়ি দিয়ে নামবার
সময় মনে পড়লো—ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার
এসবও বদলানো দরকার, যেমন মুখভঙ্গি ও দুঃখ, হাসির মুহূর্ত
নিখিলেশ ক্রুদ্ধ ও উদাসীন, এবং কিছুটা ধূর্ত।

হাল্কা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমি নিখিলেশ হয়ে বহুদূর
হেঁটে গেলাম, নতুন গোধূলি ও রাত্রি, বাড়ি ও দরজা এমনকি
অন্তঃপুর
ঘুমোবার আগে চুরুট, ঘুমের গভীরতা ও জাগরণ—
ছ' লক্ষ অ্যালার্ম ঘড়ি কলকাতার হিম আস্তরণ
ভাঙার আগেই আমি, অর্থাৎ নিখিলেশ, টেলিফোনে নিখিলেশ
অর্থাৎ সুনীলকে
ডেকে বলি, তুই কি রোজ কণ্ডেন্সড্ মিল্কে
চা খেতিস ? বদ গন্ধ, তা হোক ! আমি অর্থাৎ পুরনো সুনীল,
নিখিলেশ এখন,
তোর অর্থাৎ পুরনো নিখিল অর্থাৎ নতুন সুনীলের সিংহাসন
এবং হৃৎপিণ্ড ও শোণিত
পেতে চাই, তোর পুরোনো ভবিষ্যৎ কিংবা আমার নতুন অতীত
তোর নতুন অতীতের মধ্যে, আমার পুরোনো ভবিষ্যতে
(কিংবা তোর ভবিষ্যতে আমার অতীত কোনো পঞ্চম
অতীত ভবিষ্যতে)
কিংবা তোর নিঃসঙ্গতা, আমার না-বেঁচে-থাকা হৈ-হৈ জগতে
দু'রকম স্মৃতি ও বিস্মরণ, যেন স্বপ্ন কিংবা স্বপ্ন বদলের
বীয়ার ও রামের নেশা, বন্ধুহীন, বন্ধু ও দলের
আড়ালে প্রেম ও প্রেমহীনতা, দুঃখ ও দুঃখের মতো অবিশ্বাস
জীবনের তীব্র চুপ, যে রকম মৃতের নিশ্বাস,—
লোভ ও শান্তির মুখোমুখি এসে আমার পূজা ও নারীহত্যা

তোর দিকে, রক্ত ও সৃষ্টির মধ্যে আমিও অগত্যা
প্রেমিকের দিকে যাবো, স্তনের ওপরে মুখ, মুখ নয়,
ধ্যান ও অস্থিরতা
এক জীবনে, উরুর সামনে উরু, উরু নয়, যোনির সামনে লিঙ্গ,
অশরীরী,
ঘৃণা ও মমতা,
অসম্ভব তাণ্ডব কিংবা চেয়ে দেখা মুহূর্তের রৌদ্রে কোন
কুরূপা অপ্সরী
শীত করলে অন্ধকারে শোবে, দুপুরে হঠাৎ রাস্তায় আমি তোকে
সুনীল সুনীল বলে ডেকে উঠবো, পুরোনো আমার নামে,
দেখতে চাই চোখে
একশো আট পল্লব কাঁপে কিনা, কতটা বাতাস লাগে গালে ও হৃদয়ে
ক'হাজার আলপিন, কত রূপান্তর জন্মে, শোকে পরাজয়ে,
সুখ, সুখ নয় পাপ, পাপ নয়, দোলে, দোলে না, ভাঙে, ভাঙে না,
মৃত্যু, স্রোতে
আমি, ও আমার মতো, আমার মতো, ও আমি, আমি নয়,
একজীবন দৌড়াতে দৌড়াতে.....

বড় বেশি

বড় বেশি ভালোবাসা দিয়েছিলে চরিত্র দূষিত হয়ে গেল
সেই কারণে
কী করে খরচ করবো সে সম্পদ, অথচ জমিয়ে রাখা
যায় না কিছুতে
পচে যায়, গন্ধ হয়, সমস্ত শরীরে
প্রণয়ের পচা গন্ধ, পাশের চেয়ারে কেউ ঘৃণায় বসে না।

অমন দু'হাত তুলে বুকের উপরে দয়া না দেখালে আরক্ত সন্ধ্যায়
চমৎকার চলে যেতাম আঁধার জগতে ;
ধৈর্যহীন পুরুষের মুখখানি বুকের সংকটে
না রাখাই ছিল ঠিক, কেননা অতলে
ফেরে না চোখের যাত্রা ; শরীর ফুরিয়ে গেলে তবুও চোখের
ভয়ঙ্কর পথখানি অস্থির গর্জন করে নিজস্ব বিভায়

তার বদলে ঘাড় হেঁট করে থাকা যেত অনায়াসে।

প্রত্যেক তৃতীয় চিন্তা

মানুষের মতো চোখ, বিস্ফোরণ, সমাধির মতো শূন্য প্রচ্ছন্ন কপাল
পদচুম্বনের মতো ভালোবাসা ভিতরে রয়েছে
ভালোবাসা তিনশো মাইল দূরে গিয়ে আলিঙ্গন করে
দূর থেকে ভালোবাসা দেখে যেতে লোভ হয়, শরীর লুকোতে চায়
জ্যোৎস্নালোকে, তবুও জ্যোৎস্নায়
স্পষ্ট ছায়া পড়ে এত স্পর্শকাতরতা।

গোলাপের মতো এক ধানক্ষেত, পুরুষ নামের সব নদী
বড় চেনা লাগে, দুঃখে কোনো পাপ নেই—যত ডুবে যাই ততই ঈশ্বর
মেঘমাশ্লিষ্টসানু পা ছড়ান, সূর্যাস্তের মতো তাঁর দুঃখ এত বড়
অথবা দুঃখের মধ্যে লোভ, কিংবা লোভের ভিতরে মুক্তি, মুক্তির ভিতরে
একজন্ম নিমগ্নতা—

এ যেন গভীর রাত্রে বাড়ি ফেরা, কোথাও বাতাস নেই তবুও গাছের
এক-একটা পালক খসে ; দোকান ঘুমোয়—তবু ভিতরে আলোয়
আধোজাগা স্ত্রীলোকের হাসাহাসি—ওসব দোকানে দিনমানে
স্ত্রীলোক বিক্রীত হয় না—আমি খুব ভালোভাবে জানি।
অথবা দুপুরে লরি সুরকি ঢালে—সুরকির ভিতরে কোনো স্বপ্ন নেই ?
অমন নরম ওরা, কিশোরীর হাতে ডোবা লাল—যেন রোদ্দুরে হাওয়ায়
বিশাল প্রাসাদ এক দাঁড়িয়ে রয়েছে ঐ সুরকি জমা স্তূপে পা ডুবিয়ে—

ঘড়ি চলে কুকুরের মতো শব্দে, অথবা কুকুর ডাকে ঘড়ির মতন
তড়িঘড়ি, আমার নিশ্বাস আরও দ্রুত—যেন বেড়াতে এসেছে—
এর ফাঁকে আমায় কিছু আন্তরিক ছোট ছোট কথা বলে যাবে
টুরিস্ট গাইডের হাসি যতখানি আন্তরিক হয় ;
চারিদিকে দেয়াল বা দেবদারুশ্রেণীর মতো প্রতিদিন দিন
প্রতিটি বিদেশ যেন চুম্বকের ধাতু দিয়ে গড়া
কোথাও আঁধারে আসে তিনটে ছায়া, সেই ছায়াবহ ভয়,
প্রতি মানুষের পবিত্রতা
তবু কোনো কোনো দিন ডাকে, বহু ব্যক্তিগত বিস্ফোরণ, ইচ্ছে হয় বলি
চুল খোলো, বোতামের শব্দ শুনি, না-খোলা শায়ার মধ্যে হাত
অথবা চোখের জল চোখ থেকে ছেনে নিতে যাই

শীতে অবেলায় আমি, বাতাসে রেণুর মতো কান্না ভাসে, আমার ও
প্রতি মানুষের
মাঝে মাঝে বড় অসহায় লাগে, তখন কোথায় মুখ লুকোবো জানি না।

শব্দ ১

তখন দরজায় স্পষ্ট শব্দ শোনা যায়, উদ্ভিদের পদশব্দ—
মাতৃজঠরের
ভিতরে শিশুর হাসি, সরল, অথবা দুই প্রতীক্ষিত ঘড়ি
দু'দিকে দেয়াল জোড়া বিপরীত আয়না থেকে বহু লক্ষ ঘরের ভিতরে
পরস্পর কথা বলে, এ ছাড়া সমস্ত দৃশ্য চুপ।

আমার মুখের মধ্যে জিভ নেই, দাঁত নেই, অধরোষ্ঠহীন, বারান্দায়
শার্ট প্যান্ট শুকোচ্ছে রোদে, গেঞ্জি উড়ে গেছে ডাস্টবিনে
ডাকবাক্সে চিঠি ছিল ভোরবেলা, খালি খামে ডাকটিকিট
ভিতরে শরীর নেই, হাস্যকর, শুয়ে আছে টেবিলে ধুলোয়—
এমন কি মেয়েরাও শব্দহীন, বুকের ভিতরে হাসি, কান্না-ক্রোধ
পোকার মতন
খেলা করছে, টেলিপ্রিন্টারের শব্দে ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট, মন্ত্রী, বন্যা
থেমে গেছে
ভগ্ন প্রেমিকের ছুরি ঝলসে উঠলে
প্রতি-নায়িকার কণ্ঠে আর্তনাদ নেই
শুধু আছে উদ্ভিদের পদশব্দ, অজাত শিশুর হাসি ; এবং ঘড়ির গূঢ় আলোচনা,
দূরে ফুল ফোটার কলরব, জলাশয়ে মাছের চিৎকার।

জ্যোৎস্না নিবে গেলে তবু অন্ধকার নেই, আর শব্দ থেমে গেলে
তবু অমোঘ গোলমাল
জেগে থাকে, হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করা ভালোবাসা ঘুমোতে পারে না
কবিতায়। স্বপ্নে, শোকে, কুমারী মেয়ের গন্ধে বিষণ্ণ বাতাস
চর্তুদিকে, সব মানুষের মুখ ভাঁটফুলের মতন অশ্লীল মনে হয় এক সময়,
আমার আত্মায় কোনো ঘড়ি নেই, আয়না নেই, আমার জন্মের শব্দ—
প্রথম দিনের সেই প্রিয় শব্দ মনে আছে, কিংবা মনে নেই।

সাবধান

আমি সেই মানুষ, আমাকে চেয়ে দ্যাখো
আমি ফিরে এসেছি
আমার কপালে রক্ত ;
বাষ্প-জমা গলায় বাস-ওল্টানো ভাঙা রাস্তা দিয়ে
ফিরে এলাম—

আমি মাছহীন ভাতের থালার সামনে বসেছি
আমি দাঁড়িয়েছি চালের দোকানের লাইনে
আমার চুলে ভেজাল তেলের গন্ধ
আমার নিশ্বাস—।

রাস্তার একা বাচ্চা ছেলে বমি করলো
আমি ওর মৃত্যুর জন্য দায়ী—
পিছনের দরজায় বস্তাভর্তি টাকা ঘুষ নিচ্ছিল যে লোকটা
আমি তার হত্যার জন্য দায়ী—
আমি পুলিশের বোকামি দেখে প্রকাশ্যে হাসহাসি করবো
আমি নেহরুর উইল সম্পর্কে শুনবো ট্রামের লোকের ইয়ার্কি
চতুর্দিকে স্লোগানের শবযাত্রা দেখে আমার দয়াও হবে না ;
আমি ভয়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে জেগে উঠবো মমতায়
আমি মেয়েটির কাছে গিয়ে নিঃশব্দে মুখ চুম্বন করবো
সশরীরে বিছানায় শুয়ে দু'জনে কাঁদবো নানা ধরনে
পরদিন ঠিকঠাক বেঁচে উঠতে হবে, এই জেনে ।

আমার গলা পরিষ্কার, আমি স্পষ্ট করে কথা বলবো
সমস্ত পৃথিবীর মেঘলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে
একজন মানুষ
ক্রোধ ও কান্নার পর স্নান সেরে শুদ্ধভাবে
আমি
আজ উচ্চারণ করবো সেই পরম মন্ত্র
আমাকে বাঁচতে না দিলে এ পৃথিবীও আর বাঁচবে না ।

আমার কয়েকটি নিজস্ব শব্দ

পরিত্রাণ, তুমি শ্বেত, একটুও ধূসর নও, জোনাকির পিছনে বিদ্যুৎ,
যেমন তোমার চিরকাল
জোনাকির চিরকাল ; স্বর্গ থেকে পতনের পর
তোমার অসুখ হলে ভয় নাই, বহু রাত্রি জাগরণ—প্রাচীন মাটিতে
তুমি শেষ উত্তরাধিকার। একাদশী পার হলে—তোমার নিশ্চিত
পথ্য হবে।

আমার সঙ্গম নয় কুয়াশায় সমুদ্র ও নদী ;
ঐ শব্দ চতুষ্পদ, দ্বিধা, কিছুটা উপরে, সার্থকতা যদি উদাসীন ;
বিপুল তীর্থের পুণ্য—নয় ? সর্বগ্রাস
যেমন জীবন আর জীবনী লেখক।

প্লেনের ভিতরে কান্না এক দেশ থেকে অন্য দেশে উড়িয়ে আনি
একই বুকের মধ্যে।

অপমান এবং নীরাকে উত্তর

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে, সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে, সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন
সিঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে, নীরা, কেন হেসে উঠলে, কেন
সহসা ঘুমের মধ্যে যেন বজ্রপাত, যেন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, নীরা, হেসে উঠলে, সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে কেন সাক্ষী কেন বন্ধু কেন তিনজন কেন ?
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন !

একবার হাত ছুঁয়েছি সাত কি এগারো মাস পরে ঐ হাত
কিছু কৃশ, ঠাণ্ডা বা গরম নয়, অতীতের চেয়ে অলৌকিক
হাসির শব্দের মতো রক্তস্রোত, অত্যন্ত আপন ঐ হাত
সিগারেট না-থাকলে আমি দু'হাতে জড়িয়ে ঘ্রাণ নিতুম
সিগারেট না-থাকলে আমি দু'হাতে জড়িয়ে ঘ্রাণ নিতুম
মুখ বা চুলের নয়, ঐ হাত ছুঁয়ে আমি সব বুঝি, আমি

দুনিয়ার সব ডাক্তারের চেয়ে বড়, আমি হাত ছুঁয়ে দূরে
ভ্রমর পেয়েছি শব্দে, প্রতিধ্বনি ফুলের শূন্যতা—

ফুলের ? না ফসলের ? বারান্দার নিচে ট্রেন সিটি মারে,
যেন ইয়ার্কির
টিকিট হয়েছে কেনা, আবার বিদেশে যাবো সমুদ্রে বা নদী···
আবার বিদেশে,
ট্রেনের জানলায় বসে ঐ হাত রুমাল ওড়াবে ।

রাস্তায় এলুম আর শীত নেই, নিশ্বাস শরীরহীন, দ্রুত
ট্যাক্সি ছুটে যায় স্বর্গে, হো-হো অট্টহাস ভাসে ম্যাজিক নিশীথে
মাথায় একছিটে নেই বাষ্প, চোখে চমৎকার আধো-জাগা ঘুম,
ঘুম ! মনে পড়ে ঘুম, তুমি, ঘুম তুমি, ঘুম, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন ঘুম
ঘুমোবার আগে তুমি স্নান করো ? নীরা তুমি, স্বপ্নে যেন এ রকম ছিল····

কিংবা গান ? বাথরুমে আয়না খুব সাঙ্ঘাতিক স্মৃতির মতন,
মনে পড়ে বাস স্টপে ? স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্নে—স্বপ্নে, বাস-স্টপে
কোনোদিন দেখা হয়নি, ও সব কবিতা ! আজ যে রকম ঘোর
দুঃখ পাওয়া গেল, অথচ কোথায় দুঃখ, দুঃখের প্রভূত দুঃখ, আহা
মানুষকে ভূতের মতো দুঃখে ধরে, চৌরাস্তায় কোনো দুঃখ নেই, নীরা
বুকের সিন্দুক খুলে আমাকে কিছুটা দুঃখ বুকের সিন্দুক খুলে,যদি হাত ছুঁয়ে
পাওয়া যেত, হাত ছুঁয়ে, ধূসর খাতায় তবে আরেকটি কবিতা
কিংবা দুঃখ-না-থাকার-দুঃখ··· । ভালোবাসা তার চেয়ে বড় নয় !

তুমি শব্দ ভেঙেছিলে

তুমি শব্দ ভেঙেছিলে, তোমার নিষ্কৃতি নেই, তোমার গরিমা
একা গোধূলির যূপকাষ্ঠে চলে যাবে, আগুন ও পৃথিবীর দেহ, শব
আগুন ও পৃথিবীর দেহের ভিতরে শব্দ, তুমি নীল শব্দগুলি
হলুদ করেছো
তোমার নিষ্কৃতি নেই, তুমি ভেঙেছিলে ভীল রমণীর প্রগাঢ় তামস—
জ্যোৎস্নায় মাদুর পেতে যারা পিকনিক করে, যারা হাসে,
ধুলো ছোঁড়ে, ধুলো হয়

বিমানপতন কিংবা নেহরুর মুখের ওপর বিস্কুটের গুঁড়ো, ঝোল,
বোতলের চাবি
সবাই নিঃশব্দ ; দশদিকে ন'জন বন্ধু ছুটে যায়, সিল্কের আঁচলে
দেশলাই, তবু কারো
দৃষ্টির উত্থান আগুন ও পৃথিবীর দেহে নয়, শব্দে নয়—মহুয়া ফুলের
ছায়ায় প্রস্রাব করে একজন, একজন প্রণাম করে—তরুণ বৃক্ষটি
দু'জনেরই দিকে হেসেছেন—

তখন কোথায় ছিলে তুমি, কোন্ পাপ ও দুঃখের মতো অদ্ভুত শীতল
সমতটে ? তুমি শব্দ, তুমি হেম, তুমি প্রেত, তুমি মুখশ্রীর
সর্বনাশ কারখানায় লিপ্ত থেকে শুক্র গন্ধ, বুক-ছেঁড়া হাসি ও সূক্ষ্মতা—
তোমার নিষ্কৃতি নেই, মৃত্যুর দ্বিতীয় জন্ম, মৃত্যুর অনেক আয়ু
যেমন গভীর
শৃঙ্খলের পদশব্দ, পরিণতি, কাতর নিশ্বাস অরণ্যের মেঘ থেকে
আসে, যায়, ঘোরে—
শোনে প্রত্যেক কীর্তির ভাঙা গলা, বাতাস অতীব লঘু যেমন শ্মশানে—
শ্মশানও নিবন্ত আজ, চতুর্দিকে পড়ে আছে চণ্ডালের হাড় !

হিমযুগ

শরীরের যুদ্ধ থেকে বহুদূর চলে গিয়ে ফিরে আসি শরীরের কাছে
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে···
শিশিরে ধুয়েছো বুক, কোমল জ্যোৎস্নার মতো যোনি
মধুকূপী ঘাসের মতন রোম, কিছুটা খয়েরি
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে ।

আমার নিশ্বাস পড়ে দ্রুত, বড়ো ঘাম হয়, মুখে আসে স্তুতি
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে—
নয় ক্রুদ্ধ যুদ্ধ, ঠোঁটে রক্ত, জঙ্ঘার উত্থান, নয় ভালোবাসা
ভালোবাসা চলে যায় একমাস সতেরো দিন পরে
অথবা বৎসর কাটে, যুগ, তবু সভ্যতা রয়েছে আজও তেমনি বর্বর
তুমি হও নদীর গর্ভের মতো গভীরতা, ঠাণ্ডা, দেবদূতী
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে ।

মৃত শহরের পাশে জেগে উঠে দেখি আমি প্লেগ, পরমাণু
কিছু নয়,
স্বপ্ন অপছন্দ হলে পুনরায় দেখাবার নিয়ম হয়েছে
মানুষ গিয়েছে মরে, মানুষ রয়েছে আজও বেঁচে
ভুল স্বপ্নে ; শিশিরে ধুয়েছো বুক, কোমল জ্যোৎস্নার মতো যোনি
তুমি কথা দিয়েছিলে···
এবার তোমার কাছে হয়েছি নিঃশেষে নতজানু
কথা রাখো ! নয় রক্তে অশ্বক্ষুর, স্তনে দাঁত, বাঘের আঁচড় কিংবা
উরুর শীৎকার

মোহমুদ্গারের মতো পাছা আর দুলিও না, তুমি হৃদয় ও শরীরের ভাষ্য
নও, বেশ্যা নও, তুমি শেষবার
পৃথিবীর মুক্তি চেয়েছিলে, মুক্তি, হিমযুগ, কথা দিয়েছিলে তুমি
উদাসীন সঙ্গম শেখাবে ।

ঘুম

শীতের মদিরেক্ষণ আমাদের ওষ্ঠে লেগে আছে,
করতলে ঘুম নামে, ঘুমে উষ্ণ হয়ে আসে ললাট তোমার,
এবার ঘুমোবো আমরা দুইজনে, বসন্তের দেরী নেই আর ।

যদি পাতা ঝরে যায়, যদি ফুল এ বসন্তে একবারও না ফোটে
টেবিলে আলপিন-গাঁথা ছারপোকার মুহুর্মুহু বাঁচার প্রয়াস
যদি থেমে যেতে দেখি, সূর্য তার অন্তিম আগুনে
কিছু ভয় সেঁকে নিতে যদি নীল ফুসফুসের রন্ধ্রেরও ভিতরে লুকোয়
তবু এই মধ্যরাত্রে কিছুক্ষণ আমরা ঘুমোবো দুইজনে,
শীতের মদিরেক্ষণ আমাদের ওষ্ঠে লেগে আছে ।

শেষ যাত্রী

শেষ ট্রেন ছেড়ে গেছে, এখন এ প্ল্যাটফর্মে আমরা সকলে
হাঁটু গুঁজে বসে থাকবো, সারারাত আলো জ্বলবে স্থির
শ্মশানযাত্রীর মতো ঘুমচোখে কালহরণের খুব শান্ত কৌতূহলে
কম্বলে শরীর মুড়ে আমরা সব বসে আছি অস্পষ্ট, গম্ভীর।

শেষ ট্রেনে কারা গেল ? আমাদেরই মাসতুতো ও পিসতুতো ভায়েরা,
রাত্রির পোশাক পরে বাঙ্কে চেপে এতক্ষণে ঘুমুচ্ছে আরামে
চিরকাল ঘড়ি বেঁধে ঠিক-ঠিক ট্রেনে চেপে মহা সুখে চলে যাবে এরা
পৃথিবীর সব দ্রব্য অনেক যাচাই করে কিনে নেবে ঠিক-ঠিক দামে।

আমরা সব কটা ট্রেন ছেড়ে দিয়ে প্রতিদিন প্ল্যাটফর্মে থাকবো এ-ক'জন
পাখির নখের মতো—উপমায় বলতে গেলে—গায়ে বেঁধে শীতের বাতাস,
ঘুরঘুরে পোকার মতো হকারেরা একে-একে লাভের হিসেবে দেয় মন
শহরের গৃহস্থেরা রাত্রির পরম ব্রত এই প্রহরে মানবে বারোমাস।

স্টেশনের কিছু দূরে ব্রিজ, তার নিচে এক রাত্রি-জাগা নদী
শীতল নিশ্বাস নেয়,
আমারও বুকের মধ্যে অন্ধকার জল—
আহা ঠিক এ-সময়ে এক ভাঁড় চা পেতাম যদি !

পাওয়া গেল, টাকার খুচরোয় কিছু ঘাটতি হলো, দু'তিনটে অচল।

নির্বাসন

আমি ও নিখিলেশ, অর্থাৎ নিখিলেশ ও আমি, অর্থাৎ আমরা চারজন
একসঙ্গে সন্ধেবেলা কার্জন
পার্কের মধ্যে দিয়ে,—চতুর্দিকে রাজকুমারীর মতো আলো—
হেঁটে যাই, ইনসিওরেন্স কম্পানির ঘড়ি ভয় দেখালো

উল্টো দিকে কাঁটা ঘুরে, আমাদের ঘাড় হেঁট
করা মূর্তি, আমরা চারজন হেঁটে যাই, মুখে সিগারেট
বদল হয়, আমরা কথা বলি না, রেড রোডের দু'পাশের
রঙিন ফুলবাগান থেকে নানা রঙের হাওয়া আসে, তাসের
ম্যাজিকের মতো গাড়িগুলো আসে ও যায়, এর সঙ্গে মানায়
মুমূর্ষু নদীর নিশ্বাস, আমরা হেঁটে যাই, আমরা এক ভাঙা কারখানায়
শিকল কিনতে গিয়েছিলাম, ফিরে যাচ্ছি, আমি বাকি তিনজনকে চেয়ে দেখলুম,
ওরাও আমাকে আড়চোখে…
ছোট-বড়ো আলোয় বড়ো ও ছোট ছায়া সমান দূরত্বে
আমাদের, চাঁদ ও জ্যোৎস্নার মাঠে ইঁদুর বা কেঁচোর গর্তে
পা মচকে আমি পিছিয়ে পড়ি, ওরা দেখে না, এগিয়ে যায়
কখনো ওরা আলোয়, কখনো গাছের নিচে ছায়ায়
ওরা পিছনে ফেরে না, থামে না, ওরা যায়—

আমি নাস্তিকের গলায় নিজের ছায়াকে ডাকি; একশো মেয়ের চিৎকার
মেমোরিয়ালের পাশ থেকে হাসি সমেত তিনবার
জেগে উঠে আড়াল করে, এবার আমি নিজের নাম
চেঁচাই খুব জোরে, কেউ সাড়া দেবার আগেই একটা নিলামওয়ালা
'কানাকড়ি', 'কানাকড়ি' হাতুড়ি ঠোকে, একটা ঢিল
তুলে ছুঁড়তে যেতেই কে যেন বললো, 'সুনীল,
এখানে কী করছিস ?' আমি হাঁটু ও কপালের
রক্ত ঘাসে মুছে তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে সবুজ ও লালের
শিহরণ দেখি, দু'হাত উপরে তুলে বিচারক সপ্তর্ষিমণ্ডল
আড়াল করতে ইচ্ছে হয়, 'ওঠ্,বাড়ি চল্, কিংবা বল্
কোথায় লুকিয়েছিস নীরাকে ?' গলার স্বর শুনে মানুষকে
চেনা যায় না, একটি অন্ধ মেয়ে আমাকে বলেছিল, দু'চোখ উস্কে
আমি লোকটাকে তদন্ত করি ; পাপ নেই, দুঃখ নেই এমন
পায়ে চলা পথ ধরে কারা আসে। যেন গহন বন
পেরিয়ে শিকারী এলো, জীবনের তীব্রতম প্রশ্ন মুখে তুলে
দাঁড়িয়ে রইলো, যেন ছুঁয়ে দিল বেদান্তের মন্দিরচূড়ার মতো আঙুলে
নীলিমার মতো নিঃস্বতা,—যেন কত চেনা, অথচ মুখ চিনি না, চোখ
চিনি না, ছায়া নেই লোকটার এমন নির্মম, এক জীবনের শোক
বুকে এলো, 'কোথায় লুকিয়েছিস ?' 'জানি না' এ কথা

কপালে রক্তের মতো, তবু বোঝে না রক্তের ভাষা, তৃষ্ণা ও ব্যর্থতা
বারবার প্রশ্ন করে, জানি না কোথায় লুকিয়েছি নীরাকে, অথবা নীরা কোথায়
লুকিয়ে রেখেছে আমায় ! কোথায় হারালো নিখিলেশ, বিদ্যমানতায় পরস্পর
ছায়া ও মূর্তি,...আবার একা হাঁটতে লাগলুম, বহুক্ষণ
কেউ এলো না সঙ্গে, না প্রশ্ন, না ছায়া, না নিখিলেশ,না ভালোবাসা,
শুধু নির্বাসন ।

মুখ দেখাদেখি

তুমি আমার লুকানো মুখ তুলে ধরলে বারান্দার আলোর কাছে
তোমার একটু ভয়ও করলো না ?
দেরাজ খুলে টেনে আনলে পুরোনো চিঠি আলোর কাছে
তোমার একটু ভয়ও করলো না ?
গালে তোমার পাঁচটা আঙুল বসিয়ে দিলুম রাগের আঁচে
তোমার একটু ভয়ও করলো না ?
মুখের দিকে অমনভাবে আরেকবার হাঁ করে তাকালে
আরও পাঁচটা আঙুল পড়বে তোমার ঐ ননীর মতো গালে ।

মুখ লুকোই, মুখ লুকোও, দু'জনে বসি দুই দেয়ালে ফিরিয়ে মুখ
কথা বন্ধ, শব্দ বন্ধ, এখন
বুকের ভিতর চোখ ডুবিয়ে পালিয়ে যাই, বুকের মধ্যে এত অসুখ
কথা বন্ধ, শব্দ বন্ধ, এখন
বুকের মধ্যে তোমার মুখ, তোমার বুকের আরও ভিতরে
আমার মুখ
পরস্পর নিষ্পলক তাকিয়ে আছে কি না
দেখার আগেই কোন্ সাহসে, সুদক্ষিণা
বারান্দার আলোর কাছে অমন দীনহীনার
মতো দেখতে চাইলে আমার এই অনিত্য মুখ ?

মেয়েদের জন্য ভুল ছন্দে

তোমাদের জন্য বড় দুঃখ হয়, মেয়েরা, প্রায় দশ বারো বছর
কবিতার রাজ্য থেকে কবির দল উদ্বাস্তু করেছে তোমাদের,
আগে ছিলে স্বপ্নে কিংবা পার্কে কিংবা অন্ধকারে এবং সহাস্যে
রাশি রাশি কবিতায় ভঙ্গি দিতে
বাঁদিকের একটা ভাঙা পাঁজরার জানালা দিয়ে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে
ছোকরা কবিদের প্রাণ নখে ধরতে, সাইরেনের বাঁশিতে ভুলিয়ে
ওদের মগজে বসে নিজেদের রূপশ্রীর বন্দনা লেখাতে।
হায়, আজ তোমাদের নিঃসঙ্গ সৌন্দর্যের জন্য বড় দুঃখ হয়।

যদিও সম্প্রতি দেখছি তোমাদের শরীরের বাহার খুলেছে আরও বেশি
চামড়ায় মসৃণ গন্ধ, বুকটুক চমৎকার, দাঁত দেখলে আরও কথা শুনতে
ইচ্ছে হয়
ওষ্ঠাধর ভেজা ভেজা, শীতের দেশের মতো হাসাহাসি পোশাকের নিচে
এসব কিসের জন্য, এই দ্রুত জেগে ওঠা, প্রতীক্ষার তীব্র আক্রমণ ?
সন্ধের পরেও বাড়ির বাইরে থাকতে পারো, একা একা সব রাস্তা চেনা
বিবাহের আগেই এই পৃথিবীটা ধ্বংস হবে কিনা ঠিক না জেনে
বায়োলজিকাল ফুর্তি করা চলে, সাতজনের সঙ্গে এক সুরে হল্লা করে
অন্তত সাতটি আত্মা নিয়ে খেলা যায়—মনে হয়, ওদিকে যে সাতজন
বদমাইশ
ঊনপঞ্চাশ বায়ু পকেটে ভরেছে, ওরা ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁয়ে
রক্ত খাবে, ফাঁকা ঘর পেলেই করবে বিষম গুণ্ডামি
এবং পরের দিন পড়ন্ত বিকেলে আর বকুল গাছের নিচে দাঁড়াবে না।

প্রেমের ভাষায় খুব উন্নতি হয়েছে এই দু'হাজার বছর চর্চায়
না ভেবেই বলা যায় ঝকঝকে, কে আর বিশ্বাস করে ওসব ইয়ার্কি
কবিতার পাগলামি থামেনি যদিও, আজও নাকি যুবকেরা রক্ত দিয়ে
কবিতায় মাতামাতি করে
সেই রক্তে তোমরা নেই, হায় মেয়েরা, তোমরা বিমানে আছো, মন্ত্রীত্বে বা
আদালতে, সিংহাসনে, বিদেশ মিশনে,
এমনকি ঘরেও আছো, সব সময় আশেপাশে খেতে বসতে শুতে
শুধু কবিতায় নেই, আহা, এ কোথায় চলে এলে নিঃসঙ্গ নির্মম নির্বাসনে !

অবেলায়

আমার নিঃসঙ্গ জাগা ভাঙে না কোথাও ঘুমঘোর
অতিরিক্ত অবিশ্বাস মানুষের পাশাপাশি হাঁটে
মানুষ না প্রতিবিম্ব ? অবিশ্বাস না মায়ার শোক ?
আমার নিঃসঙ্গ জাগা অবেলায় অস্থির ললাটে
গম্ভীর ধ্বনির মধ্যে ভেসে রয়, অফুরন্ত অলীকের পাশাপাশি হাঁটে ।

জ্বলন্ত জিরাফ

শেষ কবে নারীহত্যা করেছি আমার ব্যক্তিগত স্বর্গে ? বাথরুমে—ছ'মাস আগে, সেই থেকে চোখে ভালো দেখতে পাই না । সাতদিন পর্যন্ত আয়নায় হাসির প্রমাণ লেগে ছিল—এ ছাড়া চোখের জল জমিয়ে রেখেছিলাম বেসিনে । সেই ঠাণ্ডা চোখের জলে রোজ মুখ ধুতাম ও কুলকুচো করেছি জানালা দিয়ে । প্রতিবেশী এসে বিরাট আপত্তি জানালো : এতদিন পেচ্ছাপ করা সহ্য করেছি, তা বলে কি কুলকুচো করাও । তার ছোট বাড়ির রং সাদা ছিল ।

পুলিশ এসে বলেছিলো, এই নিয়ে সাতটা খুনের জন্য তুমি মোট তেরোটা ছুরি ভেঙেছো । ইস্পাতের এ-রকম অনটনের দিনে তোমার অমন বিলাসিতা । এর পর থেকে তোমার ঐ খামখেয়ালির জন্য যত খুশি সিল্কের রুমাল বা ধুতরোফল ব্যবহার করতে । কিন্তু ইস্পাতের অপচয়ের মতো বে-আইনি । দু' বছর অন্তত ঘানি ঘোরাতে ।—আমার ঘড়ি ছিল না বলে ক'টা বাজে দেখার জন্য আমি মণিবন্ধটা কানের কাছে । রক্ত চলাচলের স্পষ্ট শব্দ ও সময় ।

টেলিফোন মিস্ত্রি অভিযোগ জানালো, আমার ঘরে রেডিও নেই কেন । সরমা অনুযোগ করেছিল, আমার ঘরে কোনো ছবি নেই । আমি ওকে টেবিলের সম্পূর্ণ খালি সতেরোটা ড্রয়ার দেখিয়েছিলাম । ও দূরের জ্বলন্ত জিরাফ একেবারে লক্ষ্য করেনি । সেই পাপেই ওর মৃত্যু হলো । দাঁতের ডাক্তার আমার পায়ে ঘা করে দিয়েছিলো বলে আমি আর কখনও সে শুয়ারের বাচ্চা জীবাণুসমুদ্রের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাইনি । তার বদলে আমি এখন পেচ্ছাপ ও কান্নার সম্পর্ক নিয়ে বই লিখছি । এখন রাত্রি কি দিন চেনা যায় না ।

পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না

পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না
আয়না
ভেঙে
বিচ্ছুরণ
একদিন
বিস্ফোরণ হয়
বুক ভেঙে কান্না এলে কান্নাগুলি ছুটে যায় ধূসর অন্তিমে
স্বর্গের অলিন্দে—
স্বর্গ থেকে
তারপর ঢলে পড়ে
মহিম হালদার স্ট্রীটে
প্রাচীন গহ্বরে
মধ্যরাতে।

জানলা ভেঙে বৃষ্টি এলে বুকে যে রকম পাপ হয়
যে-রকম স্মৃতিহীন মহিম হালদার কিংবা আমি ও মোহিনী
পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রী-শরীর চরিত্র নদীর····
দীপকের মাথাব্যথা হাঁসের পালক ছুঁয়ে হাসাহাসি করে
যে-রকম শান্তিকিনেতন কোনো ত্রিভুবনে নেই
দীপক ও তারাপদ দুই কম্বুকণ্ঠ জেগে রয়····
যে-রকম তারাপদ গান গায় গোটা উপন্যাসে সুর দেয়া
কবিতার লাইন ছুঁড়ে পাগলা-ঘন্টি বাজিয়ে ঘুরেছে—
নিকষ বৃত্তের থেকে চোখগুলি ঘোরে ও ঘুমোয়,
শিয়রে পায়ের কাছে বই-বই-বই
তিন জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্র-রচনাবলী লুটোয় পাপোশে।

আরো নিচে, পাপোশের নিচ এক আহিরীটোলায়
বৃষ্টি পড়ে,
রোদ আসে,
বিড়ালীর সঙ্গে খেলে
বেজন্মা বালিকা—

ছাদে পায়চারী করে গিরগিটি,
শেয়াল ঢুকেছে নীল আলো-জ্বলা ঘরে
রমণী দমন করে বিশাল পুরুষ তবু কবিতার কাছে অসহায়—
থুতু ও পেচ্ছাপ সেরে নর্দমার পাশে বসে কাঁদে—

এ রকম ছবি দেখে বাতাস অসহ্য হয়, বুকের ভিতরে বুক
কশা অভিমানে
শব্দ অপমান করে— ভয় আমাকে নিয়ে যায় পুনরায় দক্ষিণ নগরে
মহিম হালদার স্ট্রীটে ঘুরে ফিরে ঘুরে আমি মহিম, মহিম
বলে ডাকাডাকি করি, কেউ নেই, মহিম, মহিম, এসো তুমি আর
আমি ও মোহিনী
ফের খেলা শুরু করি, মহিম ! মোহিনী !
কোনো সাড়া নেই। ক্রমশ গম্ভীর হয় বাড়িগুলি, আলো
হাড় হিম হয়ে আসে স্মৃতিনষ্ট শীতে।

প্রেমবিহীন

শেষ ভালোবাসা দিয়েছি তোমার পূর্বের মহিলাকে
এখন হৃদয় শূন্য, যেমন রাত্রির রাজপথ
ঝকমক করে কঠিন সড়ক, আলোয় সাজানো, প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে
প্রতীক্ষা আছে আঁধারে লুকানো তবু জানি চিরদিন
এ পথ থাকবে এমনি সাজানো, কেউ আসবে না, জনহীন, প্রেমহীন
শেষ ভালোবাসা দিয়েছি তোমার পূর্বের মহিলাকে।

রূপ দেখে ভুলি কি রূপের বান, তোমার রূপের তুলনা
কে দেবে ? এমন মূঢ় নেই কেউ, চক্ষু ফেরাও, চক্ষু ফেরাও
চোখে চোখে যদি বিদ্যুৎ জ্বলে কে বাঁচাবে তবে ? এ হেন সাহস
নেই যে বলবো,যাও ফিরে যাও
প্রেমহীন আমি যাও ফিরে যাও
বটের ভীষণ শিকড়ের মতো শরীরের রস
নিতে লোভ হয়, শরীরে অমন সুষমা খুলো না
চক্ষু ফেরাও, চক্ষু ফেরাও !

টেবিলের পাশে হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়ালে, তোমার
বুক দেখা যায়, বুকের মধ্যে বাসনার মতো
রৌদ্রের আভা, বুক জুড়ে শুধু ফুলসম্ভার,—
কপালের নিচে আমার দু' চোখে রক্তের ক্ষত
রক্ত ছেটানো ফুল নিয়ে তুমি কোন্ দেবতার
পূজায় বসবে ? চক্ষু ফেরাও, চক্ষু ফেরাও, শত্রু তোমার
সামনে দাঁড়িয়ে, ভীরু জল্লাদ, চক্ষু ফেরাও !

তোমার ও রূপ মূর্ছিত করে আমার বাসনা, তবু প্রেমহীন
মায়ায় তোমায় কাননের মতো সাজাবার সাধ, তবু প্রেমহীন
চোখে ও শরীরে এঁকে দিতে চাই নদী মেঘ বন, তবু প্রেমহীন
এক জীবনের ভালোবাসা আমি হারিয়ে ফেলেছি খুব অবহেলায়
এখন হৃদয় শূন্য, যেমন রাত্রির রাজপথ ।

রাখাল

লাল ও সবুজ আলোর মধ্যে অনন্তকাল
আমি ডাইনে তাকাই পিছন ফিরে অন্ধকার গলিতে
অনন্তকাল পিছনে নয়, ডানদিকে নয়, সবুজ ও লাল—
সুখের মতো ভূবিস্তৃত, উরুদ্বয়ে শোকের মতো, দৃষ্টি থেকে ঘুমের মতো
পেরিয়ে যাই, কুসুম এবং ফলের কাছে বীজের মতো
দীক্ষা নিতে,
মৃত্যু থেকে সঙ্গোপনে শূন্য ঘরে, দ্রাক্ষাবনের
ছাই বাতাস, জ্ঞানী মাথার খুলি, নদীর ভাঙা পাড়ের শুকনো পাতা—
পেরিয়ে যাই মাঝরাতের পাঠশালার হাজার চোখ, ধূসর খাতা,
পেরিয়ে যাই ভূমিকম্প, সুচের সরু গর্ত দিয়ে অনন্তকাল
রেশমী প্যান্ট, কোমরবন্ধ, হাতে চুরুট ; তবু আমায় বলো, 'রাখাল' ।

পৌঁছোনো যাবে না

সিঁড়ির উপর থেকে ছুটে এল অতি দ্রুত মেফিস্টোফিলিস
বিশাল দুই বাহু মেলে তেড়ে বলে উঠলো, সাবধান !
তিন লক্ষ প্রতিধ্বনি যেন বলে উঠলো, সাবধান !
এক পা উপরে গেলে বাঁ হাতের উল্টোদিকে
মারবো তোকে বিষম তুফান
উপরে বৃষ্টিতে শুধু বিষ অহর্নিশ
আমার আয়ত্তাধীন পাতালে গড়িয়ে গেছে অমৃতের ফল

এই কথা শুনে অন্ধকারে এক গোয়েন্দা ঈগল
ডানা ঝাপটে উড়ে গিয়ে বসলো টেলিপ্রিন্টারের ঘাড়ে—
নগরীর সব লোক ছুটেছে দুর্জ্ঞেয় পারাবারে
শরীরের রক্তবীজ, যা ছিল প্রেমের মতো শস্তা, অনর্গল
আর জন্ম দেবে না ফসল ।

আমি মধ্যপথে একা ফ্ল্যাটবাড়ির সিঁড়িতে, আঁধারে ।
উপরে জানলার কাছে যদি একবার দাঁড়াতাম
ভাঙা আয়নার মতো অসংখ্য রূপসী সেই রুগ্‌ণ মেয়েটির
সমস্ত শরীর ছুঁয়ে, কী জানি সম্পন্ন হতো কিনা মনস্কাম
অথবা মানস নেই, অস্তিত্ব ভাঙার শব্দ প্রতিধ্বনিময় ।

খিদে

কী বিষম দুঃখ এসেছিল আজ ভোরবেলায়, কাঠবাদাম, চকলেট, স্ট্রবেরি
অথবা এগফিলিপ !—তার বদলে পোড়া সিগারেট
বিনা অনুপানে খেয়ে শেষ করলুম, হেমন্ত শিশির
ভুরুতে ও ওষ্ঠে মাখা কত ভালো, কত ভালো তার চেয়েও
প্রাইভেট কবিত্ব !

ফুলের বিছানা পেতে রেখেছিলে, আমি যাবো দু'তিনদিন পরে
হায় রে বাতাস থেকে কোন হাঁস ছেঁচে নেবে ফুলের দুর্গন্ধ ? আমি কাল

মাটিতে লুকোনো বৃষ্টি শুঁকে শুঁকে ছ'জন লোকের
দরজায় গিয়েছিলাম, কেউ জানে না কোন ঘরে ফুলের বিছানা,
কোন দরজার ফুটো চমৎকার খাপ খাবে আমার বসন্তে।

আঁতুড়ে ঘরের পাশে মধু নেই—ত্রিভঙ্গ বুড়ির হাহাকার
আটাশ বছর পার হয়ে এলো, বেলা হলে আটাশ বয়েসী
এই ছ'জন ষণ্ডামার্কা—চোখ বেঁকানো দুপুরের রোদে—
বড় হুলস্থূল করে,—ভোর থেকে না খেয়ে আছি, কিংবা বলা যায়
আজীবন!

তবু বারান্দার থেকে হাতছানি!—এলোচুলে ভ্রমরাক্ষি,—ওহে
সাত লাইন কবিত্ব চাও? নাকি খাওয়াদাওয়া নিয়ে নোনতা আলোচনা
চলতে পারে? ঠোঁট খেতে কেমন লাগে কিংবা বুক, তবে সাফ কথা
আমি কিন্তু নিজের শরীর থেকে কিছুই ঝরাতে চাই না এই দুঃসময়ে।

ছ'জন লোকের মুখ দেখে দেখে পচে গেল চোখ, গেল ফুল
নাক পরিষ্কার করে এক-একবার দুনিয়া কাঁপানো
শ্বাস নিতে ইচ্ছে হয়, ডাক্তারের বরাভয় পেলে সন্দীপন
গরম দুধের সঙ্গে গল্প লিখবে, আমি কার কাছে যাবো, গিয়ে বলবো,
মশায়, চোখের
চামড়াখানা বাদ দিয়ে, বুকের পাঁজর ছেঁচে, রক্ত ধুয়ে, দাঁতগুলো তুলে
আমাকে নতুন একটা লোকের মতন ক'রে দিন না, বেঁচে যাই এ-যাত্রায়।

কয়েক মুহূর্তে

কোনোদ্বিধানেই আমি অসম্ভব ভালোবাসা এইমাত্রতোমারচিবুকে
রেখে এলুম ১১টা১০এ চোখঘুমেযদিঅতনা জড়াতো
পৃথিবীর সবদরজাখুলে আমি অসম্ভব শব্দশুনে অসম্ভব ধবলমিনার
প্রতিনিধিরেখে তুচ্ছএকযৌবনেরপুণ্যফলে
তোমারদ্বিধারমধ্যেচলেযেতাম ভয় নেই ১০৮ চুম্বনের দাগ
থাকবেনাসকালে ওইবুকেরভিতরেমণিচুরিযায়নি
বুকশুধুমুখের গরমে

কিছুক্ষণডুবেছিলযোনিরভিতরেজিভলবণেরস্বাদছাড়াআর
কিছুইআনেনিতবু অসম্ভব ভালোবাসাবাসিহোল অসম্ভব
এইনিয়েতোমাকেআমার
একুশটাপুনর্জন্মদেওয়াহোল এতমৃত্যুমানুষেরওজানাছিল

একটি কবিতা লেখা

প্রতিধ্বনি তুমি তো স্বর্গের দিকে গিয়েছিলে
কেন ফিরে এলে ?

একদিনে লিখিনি। 'প্রতিধ্বনি' শব্দটা অত্যন্ত দুর্বোধ্য ও অবাস্তব ভাবে মাথার মধ্যে কয়েকদিন ঘুরঘুর করতে থাকে। শেষ কবিতা লেখার দেড়মাস পর। কী সাধারণ কথা এই প্রতিধ্বনি, তবু তারও একটা দাবি টের পাই। অসহায়ের মতো আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে চাই, তৎক্ষণাৎ কোনো কবিতা লিখতে আমার ইচ্ছে না। কিসের প্রতিধ্বনি তা জানি না। জীবন কাটছে কী রকম—অবিরল দুপুর, বিদেশের চিঠি, পয়সা নেই, সন্ধেবেলা থেকে মধ্যরাত্রি অসম্ভব চোখ বুজে ছোটাছুটি, অপরের কবিতায় ঈর্ষা, পুলিশের প্রতি হাসাহাসি। প্রতিধ্বনিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, অর্থাৎ খুব দূরে পাঠিয়েছিলাম, নিশ্চিত তা হলে স্বর্গে, আমার ব্যক্তিগত দূত। প্রথম লাইনটা তৈরি হয়ে যায়। যেন প্রতিধ্বনিকে বলেছিলাম, তুমি স্বর্গে যাও, গিয়ে বলো, আমি আসছি।

বাঙ্গুর কলোনি দিয়ে দুপুরে হাঁটছিলুম। পাশের মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছিল হয়তো, আমি দেখিনি। 'কোনো কবিতা লিখছো, সুনীল ?' না, মাত্র একটি লাইন ভেবেছি। অত্যন্ত স্মার্ট ভঙ্গিতে নীরেনদা বললেন, 'দাঁড়াও, ওই ছেলেটির একটা বল করা দেখি, তারপর তোমার—।' মাঠের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। একটা রোগা ছেলে বেজির মতো ছুটে এসে হলুদ বাড়ির দেওয়ালের দিকে বাতাপী লেবু ছুঁড়লো। ইম্বল কোথায় ? আমি তারপর আর কিছু দেখতে পেলুম না। 'বলো, তোমার লাইনটা।' বলে, আলতো ভাবে জিজ্ঞেস করি, 'দিকে'র বদলে 'পানে' বসালে কেমন হয় ? স্বর্গের পানে ? 'আমার মনে হয় তোমার 'দিকে'ই বসানো উচিত, কেননা',...আরও কিছু কথা হয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণে আমি দ্বিতীয় লাইনটা পেয়ে গেছি। '**কেন ফিরে এলে** ?' যেহেতু না ফিরে উপায় নেই।

যেহেতু আমার সময় পূর্ণ হয়নি। প্রতিধ্বনি এখনও পুণ্যগর্ভা হয়নি। পূর্ণ না পুণ্য ? যাই হোক, ও দুটো একই। অর্থাৎ এবার কবিতাটা না লিখে আমার উপায় নেই।

বাড়ি ফিরতে অনেক বেলা হলো। স্নান করে খেয়ে টেবিলে বসবো ভেবেছিলাম। সিগারেট নেই। ভাতের পর সিগারেট না টেনে কবিতা লেখা ? বাইরে সিগারেট কিনতে বেরিয়ে হাতের সামনে একটা বাস পেয়ে কলেজ স্ট্রীট চলে যাই। বিকেল থেকে তারপর অন্ধকার। পরদিন সকালে প্রণবেন্দু ও উৎপল এলো। আমরা তিনজনে মিলে ছ'জন মানুষের গলার আওয়াজ শুনলুম। আর একটু থাকবেন ? না। তুমি এখন বেরুবে ? না। অলিন্দের কবিতাটা লেখা হয়ে গেছে ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালকেই কপি করে—। তখনও তৃতীয় লাইনটা পাইনি। দুপুরে দীর্ঘ মিছিলের পিছনে পিছনে মন্থর বাস।

আবার সকালে, চা খাওয়া হলো, প্রচুর সিগারেট হাতে, তন্নতন্ন করে কাগজ পড়াও শেষ হয়েছে। এবার—? এবার মুখোমুখি হতেই হবে। হাতের সামনে প্রথম সাদা কাগজে ঝট্ করে লাইন দুটো লিখে ফেললুম। লিখে অনেকক্ষণ বসে থাকি। তৃতীয় লাইন নেই। যে কোনো কবিতার তৃতীয় লাইনই বোধ হয় সব চেয়ে শক্ত। এভরি থার্ড থট ইজ মাই কিলার,— না, আমি তখন জ্বরের ঘোরের মতন ঐ দুটি লাইন আবার লিখি :

প্রতিধ্বনি,তুমি তো স্বর্গের দিকে গিয়েছিলে
কেন ফিরে এলে

এবার প্রতিধ্বনির পর একটা কমা দিয়েছি, শেষে জিজ্ঞাসা দিইনি।

এই আমূল নশ্বর, শূন্যমাঘ, শরীরের কাছে—

একটু চেয়ার ছেড়ে উঠতেই ওই লাইনটা মনে পড়ে। 'আমূল' শব্দটা আমি পাই একটা মাখনের (খালি) টিনের প্রতি চোখ পড়তে। কিন্তু সেই সময় আমি পেচ্ছাপ করতে যাই। সুতরাং, ও শব্দটা বসাতে ইচ্ছে হলো পুরুষের দণ্ড অর্থে। শুধু শরীরই নশ্বর নয়, ও জিনিসটা আরও আগেই নশ্বর যে। 'শূন্যমাঘ' শব্দটা কেন বসিয়েছি, ফ্র্যাঙ্কলি, জানি না।

পবন-পদবী তুমি, প্রতিধ্বনি, শরীর ও রাত্তিরের চোখ মারামারি
তোমার না দেখা ছিল ভালো

পবন-পদবী শব্দ দুটো কি খুব ভারী হয়ে গেল ? হয়তো। লাইনটার গতি ঠিক রাখার জন্য অনায়াসেই হাওয়া বা বাতাস আরূঢ় বসাতে পারতুম। দুটি শব্দেরই

শুরুতে 'প', সামান্য একটু ধ্বনি মাধুর্যের লোভে পড়লুম, বুড়ো বয়সে চুরি করে কণ্ডেন্সড্ মিল্ক খাবার মতো, গোপন লোভে ও শব্দ দুটোই রাখা হলো। লিখতে লিখতে হঠাৎই অন্যমনস্ক ভাবে বুধবার রাত্রির কথা মনে পড়ে, অন্ধকার ময়দান, প্রমত্ত বান্ধবদল, ঠাণ্ডা লোহার রেলিংয়ে হেলান দেওয়া সেই কস্তাডুরে লাল রঙের শাড়ী পরা ধরা-মেয়ে, তার পাগলাটে হাসি, শরীরে অদ্ভুত গন্ধ। আমি রাত্রির থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার কবিতায় আনতে চাই, তখনই উপরের লাইনটার শেষ অংশ মাথায় খেলে। পরের লাইনগুলি স্বাভাবিক ভাবেই আসে :

উত্তর সমুদ্র থেকে উড়ে এসেছিল সাদা হাঁস জ্যোৎস্নাময়
তারা নয় বাদামী অসুখ, নয় বুকের ভিতরে রাখা মুখ
মুখের প্রথম গুরু চোখ তার অসম্ভব জোচ্চুরিতে অর্ধেক স্তব্ধতা
জিতে এনে, রানীকে জানাতে চেয়েছিল, বহু রানী ও নারীর কাছে
শিখে এসে অপরূপ উরু ব্যবহার,—
মৃত্যু হাঁটু গেড়ে বসে সে সমস্ত নোট করে গেছে।

কারা বার বার ফিরে আসে ? যেমন জ্যোৎস্নার হাঁস ও মাথাধরা ইত্যাদি। আমার মাথাধরার রং বাদামী। বুকের মধ্যে সবারই একটা গোপন মুখ রাখা আছে। আমি তার চোখ দেখতে পেলাম। চোখ অতিশয় বাচাল, যদি না সে অর্ধেক স্তব্ধতা জয় করে নিতে পারতো। এই সবই তো বলাই বাহুল্য। বস্তুত, আমি নারী লিখতে গিয়ে ভুল করে রানী লিখে ফেলি। তারপর রানীকে কাটতে গিয়ে রাজ-রোষের ভয় হয়। রানী শব্দটা দেখতেও বেশ। রেখে দিই, মনে হয়, সব নারীই তো আসলে রানী। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে, না, ঠিক নয়, সব নারী নয়। সুতরাং পরে দুটোকে আবার আলাদা করে সরিয়ে দিতে হয়। মৃত্যুর কথাটা অকারণ খেয়াল। লিখে ফেলেই খুব হাসি পায়। একলা বসে খুক খুক করে হাসি। মৃত্যু আজকাল হয়েছে অবিকল খবরের কাগজের রিপোর্টারের মতো। খাঁটি স্ক্যাণ্ডাল মঙ্গার একটি। যে-কোনো গুজব শুনেই এসে হাজির হয় যখন তখন, সর্দি-কাশি-মাথাধরা টিটেনাস—কিছু একটা হলেই খাটের পাশে এসে দাঁড়াবে। কি রকম হাঁটুগেড়ে বসে শর্টহ্যান্ডে নোট নিচ্ছে !

স্পেস্ ! অর্থাৎ আবার বাড়ি থেকে বেরুতে হলো। পরের লাইনগুলি তখন ছায়ামূর্তির মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। মাঝরাত্রে জাগ্রত মানুষের ঘরের জানলার ঝিল্লিতে যেমন স্বপ্নেরা অপেক্ষা করে (এই উপমাটা আমার বারবার মাথায় আসে)। ডালহৌসিতে তারাপদ হাত ধরে টেনে রেখেছে, ও ওর ভবিষ্যৎ

জীবনের কিছু কথা জানাতে চায়, কিন্তু আমি তখন আমার গোপন গত জীবন নিয়ে বিষম বিব্রত, হাত ছাড়িয়ে চলতি ট্রামে লাফিয়ে উঠলুম। সকালে প্রণব সেই দৃশ্য সহ্য করতে পারেনি, যখন হাসপাতালে ডাক্তার আমার ডান হাত থেকে এক সিরিঞ্জ রক্ত টেনে নিচ্ছিল। এক ঘণ্টা পর বাড়িতে, প্রথমেই মনে পড়ে, 'তোমাকে বিদায় দিয়ে' ;

তোমাকে বিদায় দিয়ে আমি পরশয্যায় ঘর্মাক্ত
স্তনের দুধের আঠা, মাসের তিনদিন রক্ত, প্রতিশোধ, ঘুম অন্ধকারে
বিস্মৃতির পদশব্দ, বৃষ্টির মতন দ্রুত পাঁইট, বহু বুকখোলা
হা-হা শব্দে, ভিজে
অতি ঐশ্বরিক কোনো প্রাণীর মতন লিপ্ত হয়েছিলাম, অয়ি প্রতিধ্বনি,
তুমি তো স্বর্গের দিকে—আত্মার সরল শব্দ, মেঘ, মায়া পাহাড়
পেরিয়ে
ঘাই হরিণীর ডাক যেমন সমুদ্র পাড়ে ফেরে…

'ঘাই হরিণীর',—শব্দটা জীবনানন্দের থেকে প্রত্যক্ষ হয়ে গেল, কিন্তু আর উপায় নেই, সময় নেই, অসম্ভব খিদে পেয়েছে। এ কবিতার হাত থেকে নিষ্কৃতি চাই। আজ বিকেলে কথা রাখতে হবে। কিন্তু উঠতে পারছি না, মন বলছে, আর একটা লাইন বাকি আছে, শেষ লাইন। পরপর বিদ্যুতের মতো আঠারোটা লাইন মাথায় এলো, রেলগাড়ির কামরার মতো, একই রকম দেখতে অথচ এক নয়। খিদে-পেটে কী সমস্ত চমৎকার লাইন যে মাথায় আসে, অথচ খেয়ে উঠে তার একটাও মনে থাকে না। কিন্তু ওগুলো এ কবিতার লাইন নয়। একটা পুরোনো লাইনই বারবার দাবি জানাচ্ছে। হ্যাঁ নিশ্চিত, তুমিই এসো :

'কেন ফিরে এলে ?' কেন ফিরে এলে ?

নীরা তোমার কাছে

সিঁড়ির মুখে কারা অমন শান্তভাবে কথা বললো ?
বেরিয়ে গেল দরজা ভেজিয়ে, তুমি তবু দাঁড়িয়ে রইলে সিঁড়িতে
রেলিং-এ দুই হাত ও থুতনি, তোমায় দেখে বলবে না কেউ থির বিজুরি
তোমার রং একটু ময়লা, পদ্ম পাতার থেকে যেন একটু চুরি,
দাঁড়িয়ে রইলে
নীরা, তোমায় দেখে হঠাৎ নীরার কথা মনে পড়লো ।

নীরা, তোমায় দেখি আমি সারা বছর মাত্র দু'দিন
দোল ও সরস্বতী পুজোয়—দুটোই খুব রঙের মধ্যে
রঙের মধ্যে ফুলের মধ্যে সারা বছর মাত্র দু'দিন—
ও দুটো দিন তুমি আলাদা, ও দুটো দিন তুমি যেমন অন্য নীরা
বাকি তিনশো তেষট্টিবার তোমায় ঘিরে থাকে অন্য প্রহরীরা ।

তুমি আমার মুখ দেখোনি একলা ঘরে, আমি আমার দস্যুতা
তোমার কাছে লুকিয়ে আছি, আমরা কেউ বুকের কাছে কখনো
দু'হাত জোড় করে ছুঁইনি শূন্যতা, কেউ বুকের কাছে কখনো
কথা বলিনি পরস্পর, চোখের গন্ধে করিনি চোখ প্রদক্ষিণ—
আমি আমার দস্যুতা
তোমার কাছে লুকিয়ে আছি, নীরা তোমায় দেখা আমার মাত্র দু'দিন ।

নীরা, তোমায় দেখে হঠাৎ নীরার কথা মনে পড়লো !
আমি তোমায় লোভ করিনি, আমি তোমায় টান মারিনি সুতোয়
আমি তোমার মন্দিরের মতো শরীরে ঢুকিনি ছল ছুতোয়
রক্তমাখা হাতে তোমায় অবলীলায় নাশ করিনি ;
দোল ও সরস্বতী পুজোয় তোমার সঙ্গে দেখা আমার—সিঁড়ির কাছে
আজকে এমন দাঁড়িয়ে রইলে
নীরা, তোমার কাছে আমি নীরার জন্য রয়ে গেলাম চিরঋণী ।

আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি

আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ
এই কি মানুষজন্ম ? নাকি শেষ
পুরোহিত-কঙ্কালের পাশা খেলা ! প্রতি সন্ধেবেলা
আমার বুকের মধ্যে হাওয়া ঘুরে ওঠে, হৃদয়কে অবহেলা
করে রক্ত ; আমি মানুষের পায়ের কাছে কুকুর হয়ে বসে
থাকি—তার ভেতরের কুকুরটাকে দেখবো বলে । আমি আক্রোশে
হেসে উঠি না, আমি ছারপোকার পাশে ছারপোকা হয়ে হাঁটি,
মশা হয়ে উড়ি একদল মশার সঙ্গে ; খাঁটি
অন্ধকারে স্ত্রীলোকের খুব মধ্যে ডুব দিয়ে দেখেছি দেশলাই জ্বেলে—
(ও গাঁয়ে আমার কোনো ঘরবাড়ি নেই !)

আমি স্বপ্নের মধ্যে বাবুদের বাড়ির ছেলে
সেজে গেছি রঙ্গালয়ে, পরাগের মতো ফুঁ দিয়ে উড়িয়েছি দৃশ্যলোক
ঘামে ছিল না এমন গন্ধক
যাতে ক্রোধে জ্বলে উঠতে পারি । নিখিলেশ, তুই একে
কী বলবি ? আমি শোবার ঘরে নিজের দুই হাত পেরেকে
বিঁধে দেখতে চেয়েছিলাম যীশুর কষ্ট খুব বেশী ছিল কি না ;
আমি ফুলের পাশে ফুল হয়ে ফুটে দেখেছি, তাকে ভালোবাসতে পারি না ।
আমি কপাল থেকে ঘামের মতন মুছে নিয়েছি পিতামহের নাম,
আমি শ্মশানে গিয়ে মরে যাবার বদলে, মাইরি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ।

নিখিলেশ, আমি এই রকম ভাবে বেঁচে আছি, তোর সঙ্গে
জীবন বদল করে কোনো লাভ হলো না আমার—এ কি নদীর তরঙ্গে
ছেলেবেলার মতো ডুব সাঁতার ?—অথবা চশমা বদলের মতো
কয়েক মিনিট আলোড়ন ? অথবা গভীর রাত্রে সঙ্গমনিরত
দম্পতির পাশে শুয়ে পুনরায় জন্ম ভিক্ষা ? কেননা সময় নেই,
আমার ঘরের
দেয়ালের চুন-ভাঙা দাগটিও বড় প্রিয় । মৃত গাছটির পাশে উত্তরের
হাওয়ায় কিছুটা মায়া লেগে আছে । ভুল নাম, ভুল স্বপ্ন থেকে বাইরে এসে
দেখি উইপোকায় খেয়ে গেছে চিঠির বাণ্ডিল, তবুও অক্লেশে

হলুদকে হলুদ বলে ডাকতে পারি। আমি সর্বস্ব বন্ধক দিয়ে একবার
একটি মুহূর্ত চেয়েছিলাম, একটি...., ব্যক্তিগত জিরো আওয়ার ;
ইচ্ছে ছিলো না জানাবার
এই বিশেষ কথাটা তোকে। তবু, ক্রমশই বেশি করে আসে শীত, রাত্রে
এ রকম জলচেষ্টা আর কখনও পেতো না, রোজ অন্ধকার হাতড়ে
টের পাই তিনটে ইঁদুর। ইঁদুর নয় মূষিক ? তা হলে কি প্রতীক্ষায়
আছে অদূরেই সংস্কৃত শ্লোক ? পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর এই
অবেলায়
কিছুই মনে পড়ে না। আমার পূজা ও নারী হত্যার ভিতরে
বেজে ওঠে সাইরেন। নিজের দু'হাত যখন নিজেদের ইচ্ছে মতো
কাজ করে
তখন মনে হয় ওরা সত্যিকারের। আজকাল আমার
নিজের চোখ দুটোও মনে হয় এক পলক সত্যি চোখ। এ রকম সত্য
পৃথিবীতে খুব বেশি নেই আর।

স্মৃতির প্রতি

বড় ঠাণ্ডা লাগে স্মৃতি, এ যেন কেমন এক চতুষ্কোণ দ্বীপে শুয়ে থাকা
চতুর্দিকে এক সুবাতাস,
এত প্রজাপতি দেখলে দুর্দিনের জন্য ভয় হয়।
আলো টলমল করে অন্তিম শিয়রে, আরও একটু কম আলো
গোলাপ বাগানে ঝুঁকলে সহনীয় হতো।
কত রাত ঘুম আসেনি, কত রাত ডুবে গেছি বিষম কঠিনতম ঘুমে
কি জানি কেমন তন্দ্রাঘোরে !
জানলার ঝিলমিলিতে অথবা কার্নিসে কত স্বপ্ন গুটি মেরে
প্রতীক্ষায় ছিল, তারা পল্লবে আসন পায়নি, ফিরে গেছে,—আজ
সেই সব না দেখা স্বপ্ন ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নিতে চায় ; আঃ !
চতুর্দিকে এত সুবাতাস—
এত প্রজাপতি দেখলে দুর্দিনের জন্য ভয় হয় !

বড় ভয় লাগে ওই ওষ্ঠাধরে অসহ্য অমিয়
গ্রীবার একটু নিচে নখের আঁচড় দেখলে বজ্রপাত, রক্তবৃষ্টি হয়
হঠাৎ এগারোটায় চকিতের জন্য কেন নীরা তুমি, ফিরে এলে সার্কুলার
রোডে ?
আজ আমি জনতার, আজ আমি পলাতক চতুষ্কোণ দ্বীপে ।

তিনজন একসঙ্গে লাইব্রেরির মাঠে বসেছি, তিনজন উনিশ,
এখন সজ্জিত মঞ্চ ঢের ভালো তিন দৃশ্যে তিন হত্যাকারী,
সামান্য পিঁপড়েও আজ রক্ত চেনে, চোখের মণিকে খুব সুখাদ্য জেনেছে,
আমার বোতাম নেই, সেফটিপিন কিনতে গিয়ে হঠাৎ ফুটপাথে হিরণ্ময়
কাঠ হয়ে মরে রইলো, আমি তার আততায়ী,—আমি নয়, আমি ?
আমি নয়, আমি নয়, মুক্তি দাও হিরণ্ময়, জানো, আমি নয় !
যাকে হত্যা করতে চাই,···তারা সব আগে থেকে হঠাৎ ফুটপাথে
ঢলে পড়ে যায়,
এখন আমার ভয় প্রজাপতি ফুলের বাগানে
যারা তার থেকে আরও দূরে আছে তাদের ডাক-নাম ভুলে গেছি ।

নিয়তি

নরকের চারপাশে কেমন কেয়ারি করা সুন্দর বাগান
আমরা দু'জনে ওই ফুল-বাগানে
বিকেলে বেড়াতে যাব আজ
হাওয়ায় উড়বে চুল, গুনগুন স্বরে প্রিয় গান
গেয়ে উঠব একসঙ্গে, কৌতুকে চকিত করে নরক-সমাজ ।
গোলাপকুঞ্জের পাশে এসো এইখানে একটু বসি
তীব্র ঘন নীল আলো চতুর্দিকে উজ্জ্বল করেছে
তোমার গ্রীবার ভঙ্গি, স্তনের সবল রেখা হঠাৎ আমাকে
করে বিষম সাহসী
দেয়ালের এই পাশে আমরা দু'জনে আছি কি উল্লাসে,
উষ্ণতায় বেঁচে ।

কঠিন শাস্তির ঘর থেকে ঐ যে দেখ হিরণ্ময়
চেয়ে আছে আমাদের দিকে,
সুকুমার মূর্তিখানি ছিন্নভিন্ন, চক্ষু থেকে মুছে গেছে
সমস্ত বিস্ময়
গলায় ছুরির দাগ, তবু কি দর্পিত রোখ—আজ মনে হয়
আমারও সমস্ত পাপ আঙুলের নখের প্রতীকে
তোমার চুলের মধ্যে খেলা করে দ্বিধাময় আদরে সম্প্রতি ;
স্বর্গের অপ্সরী হয়ে থাকবে তুমি—
হিরণ্ময় ও আমার সমান নিয়তি ।

না লেখা কবিতা

কুসুমের বুক থেকে ঝরে গেছে সব পবিত্রতা ; এই লাইনটা নিয়ে মহা মুস্কিলে পড়েছি । লিখেই মনে পড়ে, না না, আমি বলতে চাই স্ত্রীলোকের শরীর থেকে সব রূপ উবে গেছে । কিন্তু এ কথাটা কিভাবে লিখবো বুঝতে না পেরে, কুসুমের বুক থেকে ঝরে গেছে ইত্যাদি । তখন মনে হয়—কেন, এভাবে ঘুরিয়ে লিখবো কেন, সোজাসুজি লিখবো, আমার কাকে ভয় ? কথাটা কি ভাবে জানাবো ভাবতে বসি । ভাবতে-ভাবতে ঘুম পায়, মনে পড়ে—গড়িয়াহাটের ট্রাম লাইনের উপর দিয়ে পেত্নীরা শেয়ালের গলার বকলশ্ ধরে বেড়াতে বেরিয়েছি—কলকাতা এই রকম—এ কথাও লিখতে হবে । কিন্তু লেখার সময় আসে কুসুম, রূপের বদলে পবিত্রতা । আমি কুসুম সম্বন্ধে কি জানি ? কিছুই না । পবিত্রতা সম্বন্ধেই বা কী জানি ? তখন মনে হয় স্ত্রীলোকের সব রূপ উবে গেছে তাও কি জানি ? তবে কেন ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পীডে ছুটে যাওয়া একটি মেয়ের এক পলক মুখ দেখে এমন প্রেমে পড়ি যে সাতদিন আহারে রুচি থাকে না ? তবে কেন বেলা বারোটায় একটি মেয়েকে ঘুমোতে দেখে এমন হঠাৎ অসহ্য কষ্ট হয়েছিল যে মনে হয়েছিল দীনের চেয়ে দীন হয়ে যাই, একবার হাঁটু মুড়ে ভিখারীর মতো ওর হাতের স্পর্শ ভিক্ষে করি । সেইজন্যই কি কবিতাটা লিখতে গেলেই মনে পড়ে অন্য ? নিরীহ কুসুমের প্রতি অকারণ কপট ক্রোধ ? এইসব ভাবতে ভাবতে আমার কিছুই হয় না, বারবার ঘুম আসে । বরং যদি দুটো নিয়েই লিখতাম তবে দুটি কবিতা অন্তত লেখা হতো । না হয় হতোই বা ওরা কন্ট্রাডিক্টারি । তার বদলে খেলো লজিক আমাকে নিয়ে গেল মর্মান্তিক নিঃসঙ্গতার দিকে ।

ভ্রমণ

চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম, একা, অহঙ্কার অত্যন্ত গম্ভীর
নাকের ক' লক্ষ শিরা কাঁপে যেন ঠোঁট ওল্টায় চিবুক পর্যন্ত
শরীর বিমর্ষ নয়—হাঁসের পালকসম ভারী অনুরাগী
গোধূলির, জলপ্রপাতের, কুচো আমিষের, হলুদ স্বর্গের
চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি যেমন দাঁড়ানো যায় একা
যেমন দাঁড়ানো যায় জলে
পর্বত শিখরে
যেমন হঠাৎ মুখ পাখিদের সঙ্গে উড়ে যায়
মুখহীন চেয়ে থাকা যেমন শৈশব থেকে ভাসে
সিন্দুকের ঝনাৎকার, সীমানা ছাড়িয়ে যায় লক্ষ
বিকেলের ওড়াওড়ি
যেমন দাঁড়ানো যায় একা হিম স্ত্রীলোকের বুকের ভিতরে।

কে যেন স্বর্গের থেকে চ্যুত হয় অহরহ, চ্যুত হয় স্বর্গেরও পরিধি
সটান ভূপৃষ্ঠে নয়, আরো নিচে, পাতাল বা খ্রীস্টান নরকে
নরকে প্রবাসী আছি বহুকাল, চিঠি লিখো,
কেয়ার অব অনুতাপ শাখা
সোনালি সাপের চোখ ডাক পিয়নের মতো উৎকণ্ঠা ওড়ায়
সায়াহ্নের ম্লান যত্ন···ভেঙে যায় চিৎকারের গলা
আবার হঠাৎ যেন ফিরে আসে প্রহরী ও সবুজ নিশান
একা বৃষ্টিপাত
আবার হঠাৎ যেন ফিরে আসে বহু মুখ,
অন্ধকারে ফুলের উত্থান—

পতনের পদশব্দ হয়
সুনীল সুনীল বলে ডাক দেয় পার্কের রেলিং-এ
মৃত্যু ও মায়ের কণ্ঠ পরস্পর বিপরীত দিকে ছুটে যায়—
আবার হঠাৎ ঘুম ঘুমের ভিতর থেকে ডুবন্ত দ্বীপের
রঙ কিংবা নিবেদন নিয়ে আসে, প্রেতকণ্ঠে সুনীল সুনীল
হিজল বনের পাশে খোলা প্রান্তরের দিকে ভাসে।

জাগরণ কোনোদিনও ক্ষমাশীল নয়, যেন জাগরণ বহু জাগরণ
যেমন নারীর ঘুম শরীরের কলরবে খেলা
যেমন রাত্রির মধ্যে ভিজে পায়ে বাড়ি ফেরা,
অন্ধকারে চোখ ভিজে যায়
ভালোবাসা খুঁজে নেয় ঘাতকের চক্ষু, বুক পেতে দেয়
ছুরির সম্মুখে
কোনো কণ্ঠস্বর কোনো উত্তর জানে না—
স্বর্গ নরকের চেয়ে কতখানি দূরে থাকে কবিতার খাতা ?

অমলের স্ত্রীর জন্য

আমি খুব দূর, দূর দেশ থেকে অলক্ষ্যে বাণ ছুঁড়ি
তুমি কাছে এসে এক কণা কস্তুরী
তুলে নিলে করকমলে
সখী, আজ আর আমাকে বলো না নিষ্ঠুর হতে
আমাকে বলো না অমলের
শবযাত্রায় কাঁধ দিতে, আমি আজ গঙ্গার স্রোতে
থুতু ফেলবো না, দেখো এই মুখ, এ কি নিষ্ঠুর মানুষের মুখ ?
আমার শরীর, দেখো, চেয়ে দেখো এ কি মনে হয়
বারুদে ভর্তি সিন্দুক ?

দেয়ালের পাশে দাঁড়ালে তোমাকে খুবই মানায়
খুব বড়ো ঘর, আধো-নীল কোনো দেয়ালে—
তুমি নও কিছু রূপসী, তোমার চোখ ছোট,
শুধু হঠাৎ কখনও খেয়ালে
হেসে ওঠো পাগলিনীর মতন, একলা ঘরের দেয়ালে—
রোদ এসে পড়ে চিবুকে তোমার দুঃখ জানায়
দুঃখে দেয়ালে দাঁড়ালে তোমাকে খুবই মানায়
দুঃখ তোমার গন্ধের মতো ফেটে পড়ে ঐ দেয়ালে—
আমাকে বলো না নিষ্ঠুর হতে, আমাকে বলো না অমলের
মৃত্যু সইতে, মৃত্যু আমায় অসুখ দেয় না কাঁপায় না বুক
সখী, আমি আজ তোমার ও করকমলের
কস্তুরী নোবো, দেখো এই মুখ এ কি নিষ্ঠুর মানুষের মুখ ?
মৃত্যু আমাকে অমৃত দেয় না কাঁপায় না বুক
আমি আজ কাছে দাঁড়িয়ে দেখবো তোমার অসুখ ।

আমি ও কলকাতা

কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে
আমি এর সর্বনাশ করে যাবো—
আমি একে ফুস্‌লিয়ে নিয়ে যাবো হলদিয়া বন্দরে
নারকোল নাড়ুর সঙ্গে সেঁকো বিষ মিশিয়ে খাওয়াবো—
কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে।

কলকাতা চাঁদের আলো জাল করে, চুম্বনে শিয়াল কাঁটা
অথবা কাঁকর
আজ মেশাতে শিখেছে,
চোখের জলের মতো চায়ে তুমি চিনি দিতে ভুলে যাও, এত
উপপতি
তোমার দিনে দুপুরে, ঊরুতে সম্মতি !
দিল্লীর সুপ্রিমকোর্টে, সুন্দরী, তোমাকে আমি এমন সহজে
যেতে দিতে পারি ? তার বদলে হৃদয়ে সুগন্ধ মেখে সন্ধেবেলা
প্রখর গরজে
তোমার দু' বাহু চেপে ট্যাক্সিতে বাতাস খেতে নিয়ে যাবো—
হোটেলে টুইস্ট নাচবে, হিল্লোলে আঁচল খুলে বুকে রাখবে দু'দুটো
ক্যামেরা
যদু.....মধু এবং শ্যামেরা তুড়ি দেবে ;
শরীরে অমন বাজনা, আয়নার ভিতরে অতি মহার্ঘ আলোর মতো
তুমি, তোমার চরণে
বিশুদ্ধ কবিতাময় স্তাবকতা দক্ষিণ শহর থেকে এনে দিতে পারি
সোনার থালায় স্থলপদ্ম চাও দুই হাতে ?
তুমি খুন হবে মধ্যরাতে।

কলকাতা, আমার হাত ছাড়িয়ে কোথায় যাবে, তুমি
কিছুতে ক্যানিং স্ট্রীটে লুকোতে পারবে না—
চীনে-পাড়া-ভাঙা রাস্তা দিয়ে ছুটলে, আমিও বাঘের মতো
ছুটে যাবো তোমার পিছনে
ডিঙিয়ে ট্র্যাফিক বাতি, দুঃখের বড়বাজার, রোগীর পথ্যের মতো
চৌরঙ্গি পেরিয়ে

আমার অনুসরণ, বায়ুভূত নিরালম্ব আত্মার মতন ভঙ্গি
কাতর ভালোবাসার, প্রতিশোধে—
কোথায় পালাবে তুমি ? গঙ্গা থেকে সব কটা জাহাজের মুখগুলো
ফিরিয়ে
অন্ধকার ময়দানে প্রচণ্ড সার্চলাইট ফেলে
টুঁটি চেপে ধরবো তোমার—
তোমার শরীর ভরা পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে বারুদ ছড়িয়ে
আমার গোপন যাত্রা, একদিন শ্রেণীযুগে জ্বালবো দেশলাই—
উড়ে যাবে হর্ম্যসারি, ছেটকাবে ইটকাঠ, ধ্বংস হবে
সব লাস্য, অলঙ্কার, চিৎপুরের অমর ভুবন
আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলে যদি, তোমার সহমরণ
তবে কে বাঁচাবে ?

অনর্থক নয়

বেয়ারা পাঠিয়ে কারা টাকা তোলে ব্যাঙ্ক থেকে ?
আমি তো নিজের সইটা এখনো চিনি না
বিষম টাকার অভাব ! নেই। শুধু হৃৎপিণ্ডে হাওয়া টেনে নিয়ে
হাসি কুলকুচো করি। মাথায় মুকুট নেই বলে
কেউ ধার দিতেও চায় না।
কিছু টাকা জমা আছে ব্লাড ব্যাঙ্কে। সামান্য।
কাঁটা ছাড়ানো মাছের মতন
গদ্য লিখলে ক্যাশ আসে। পারি না। কবিতায় দশ টাকা
তাই বা মন্দ কি, কত দীর্ঘ দিন বন্ধুদের টেবিলে বসিনি।
কতই তো দিলে বিধি—চোখ, নাক, হাত, ডিগ্রি, জিভ, ঘোরাঘুরি
কয়েকখানা বড়ো সাইজ উপন্যাস শেষ করার সামর্থ্য দিলে না ?

শিল্পের জননী নাকি দুঃখ ? সর্বনাশ, আমার তো কোনো দুঃখ
নেই। খুব গোপনে জানাচ্ছি
(একমাত্র টাকা কিংবা দুঃখ না-থাকার-দুঃখ যদি গণ্য হয় !)
কে কোথায় পায়নি প্রেম, এর সঙ্গী ভোগ করছে ওর সন্ধেবেলা
এসব চমৎকার লাগে।

কে যেন আমায় কথা দিয়েছিল ! কথা সাঁতরে গেছে অন্ধকারে—
ভয়ঙ্কর জানালা খুলে রাত দুটোয় এক ঝলক আলো এসে পড়ে
মাঝে মাঝে চোখে মুখে । অমনি চেঁচিয়ে উঠি উল্লাসে মুখ তুলে :
বিশ্বাসঘাতিনী ভাগ্যে হয়েছিলে নারী, তাই বেঁচে থাকা এত রোমাঞ্চের !

নেশাফেশা কিছু নেই, দুঃখ নেই, গোপনে চুপচাপ বাঁচতে চাই
তাও কত শক্ত দেখছি, চারবেলা অদ্ভুত চাকরি, ঘুমহীন চোখে
কবিতার আরাধনা
কেন এই আরাধনা ? ওভারটাইম দশ টাকা ?
ছোট ছোট ঝাললঙ্কা কিংবা ঠিক টিনের চিরুনির মতো রোদে
পঞ্চাশটা কাবুলিকে স্বপ্ন দেখে আজ দুপুরে চমকে গেছি ট্রামে ।

কোবর্ন স্ট্রীটের মোড়ে বুড়ো দরবেশ চাইলো অমরত্ব খুবই আন্তরিক
কপালে কুষ্ঠের কাদা—তিনটে নয়া পয়সা দিয়ে মানুষের মতো অভিমানে
সংকেতবিহীন কণ্ঠে জানালুম :
যদি রাস্তা চিনতে পারো, যাও হে অনন্তধামে সন্ধের আগেই
ঈশ্বরের পাশে একটি তোমার জন্যেই খালি আসন রয়েছে আমি জানি
পরমুহূর্তেই আমি পাশের পাগলির কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়ে—
—তিনটে পয়সা দাও ভাই আজ আমাকে,
গাড়ি ভাড়া নেই বহু দূরে যেতে হবে ।

মায়ের তোরঙ্গ থেকে সিঁদুরের গুঁড়ো ঝেড়ে আজও
সম্রাট পঞ্চম জর্জ কাটামুণ্ডে সহাস্য বয়ান
যাও মাছের বাজারে ইয়োর ম্যাজেস্টি, পুঁইশাক, সিগারেট, কুমড়োয়
দেখি কতো তোমার মুরোদ ! সব ম্যাজিক ভুলে গেছি—
একত্রিশ তারিখে শুনছি অ্যালয়ের কুশব্দ ইয়ার্কি
এখানে ওখানে নদী—কালো জল, প্রত্যহ স্নান সেরে বহু পবিত্র গণ্ডার
চৌরঙ্গির চতুর্দিকে হুটোপুটি করে—হাসে, মেয়েদের খোলা তলপেটে
সুড়সুড়ি দেয় কিংবা ঠোঁট চাটে, নুন ঝাল মিশিয়ে
প্রথম শীতের এই মনোরম সন্ধ্যাগুলি কাঁটা চামচে দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে
সুস্বাদে চিবিয়ে খায় । সমস্ত রাস্তাই আজ ভিড়ে ভর্তি ভিড়ে
ভর্তি, অসম্ভব, আমি হঠাৎ কোথায় আজ হারালুম আমার নিজস্ব
গোপন প্রস্থান পথ—এ দুর্দিনে ? ফাটকার বাজারে !

এক সন্ধেবেলা আমি

এই হ্রদে ঈশ্বর ছিলেন
এই হ্রদে ঈশ্বর ছিলেন
ঈশ্বর, তোমার ভূমিকম্প এসে মুছে দিল তোমার মহিমা ;
এই বৃক্ষ ঈশ্বর আমার
এই বৃক্ষ ঈশ্বর আমার
ঈশ্বর, তোমার বজ্র তোমাকেই পোড়ালো বীভৎস
ঈশ্বর, তোমার মতো নিরীশ্বর আর কেউ নেই !....

★

নীরা, তুমি অমন সুন্দর মুখে তিনশো জানালা
খুলে হেসেছিলে, দিগন্তের মতন কপালে বাঁকা টিপ,
চোখে কাজল ছিল কি ? না, ছিল না ।
বাসস্টপে তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল স্বপ্নে বহুক্ষণ...
কেমন সামান্য হয়ে বসেছিলে, দেড় বছর পর আমি আজও আছি
কত লোভহীন—
পাগলামি ! স্বপ্ন থেকে নেমে দূর বাসস্টপে একা হেঁটে যাই ।...

★

নদীর পাড়ে বসেছিলাম, নদী আমায় কোনো কথাই বলেনি
শুকনো পাহাড় বললো আমায় নদীর কথা—
নারীর কাছে গিয়েছিলাম, নারী আমায় কোনো কথাই বলেনি
ধুলোয় ভরা গ্রন্থ শুধু বললো আমায় নারীর ভাষা ।...

★

'এ বছর আর বন্যা হবে না, ঐ দ্যাখো ব্রিজ, ঐ দ্যাখো বাঁধ—'
কে জানে কোথাও কোনো দীর্ঘশ্বাস ছিল কিনা,
মরা দামোদর পায়ে হেঁটে এসে ছেলেটা মেয়েটা শক্তিগড়ের
দিকে চলে গেল, কে জানে কোথাও কোনো দীর্ঘশ্বাস ছিল কিনা ।...

★

আমার ঠাকুরদাদা মন্দিরের পুজুরী ও ঘণ্টা বাজাতেন
ছোটমাসী নামাবলী কেটে ব্লাউজ বানিয়েছেন লো-কাট ;
ছোটমাসী, তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে গিয়ে
প্রথম যৌন আনন্দ পেয়েছিলাম ।

একই স্বপ্ন দু'জনে দেখেছি

যেন কাল মরে যাবো ক্ষণকাল সেই কথা ভেবে
গোধূলির দিকে আমি বিদায়ের অস্ত্র তুলে ধরি
গোধূলি কি ফসলের বিবর্তন ? নাকি উল্লুকের
প্রশান্ত নাচের ভঙ্গি ? দুঃখ ঝরে রক্তের মতন, ঝরে যায়
কিংবা রক্ত দুঃখের মতন ? যেন কাল মরে যাবো
ক্ষণকাল সেই কথা ভেবে আমি গোধূলির কাছে
কালো শিল্প দীক্ষা নিতে আসি ।

থামে না বাতাস, এত দীর্ঘশ্বাস তোমাকে মানায় ?
বলো বলো চুপ করে চেয়ে থাকা কবরের পাশে বসা নয়
মূর্খেরা বিশ্রাম করে ইজেরের ইলাস্টিক খুলে
সুখ
ভাঁড়ারে জমানো আছে, যেমন ফুলের কাছে কাঁচা পয়সা
রোজ ঝনঝনায়
আমি তার চেয়ে ঢের দূরে, আমি প্রত্যেক উত্তর
শেখাই প্রেতের কণ্ঠে, প্রত্যেক অনভিপ্রেত মুখ

গোধূলিকে মান্য করে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দু'একজন
হাসপাতালে মরে,
দু'একজন হাসাহাসি করে যায় বিকেল চারটেয় রেস্তোরাঁয়
অতিশয় চেষ্টা পেলে কোনো কোনো পাখি ডুব দেয়
লবণ সমুদ্রে
এবং ওঠে না ।

কি যেন হয়নি শেষ, ঘুমের আবেশে অন্ধকারে
মনে পড়ে, না মনে পড়ে না, কিংবা মনে পড়া মনের গহ্বর
নারীর লজ্জার মতো খুলে যায়, সন্তর্পণে নিজেকে ঠকিয়ে
দশদিকে চেয়ে দেখি, যেন কেউ হঠাৎ না দেখে, যেন চোখ
বিদায়ের হেমন্তের অপ্রেমের অসুখের বিস্মৃতির ললাট এড়িয়ে
মহিষ বাহন হয়ে ফিরে আসে, হাসে জ্যোৎস্না কপিশ মায়ায়—
মনে কেন এত খুশি—যেন একই বালিশে দু'জনে মাথা রেখে
আমি ও আমার মৃত্যু শুয়ে আছি চুপচাপ, শুয়ে আছি, যেন
একই স্বপ্ন দু'জনে দেখেছি।

নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা

এই কবিতার জন্য আর কেউ নেই, শুধু তুমি নীরা
এ কবিতা মধ্যরাত্রে তোমার নিভৃত মুখ লক্ষ্য করে

ঘুমের ভিতরে তুমি আচমকা জেগে উঠে টিপয়ের
থেকে জল খেতে গিয়ে জিভ কামড়ে এক মুহূর্ত ভাববে
কে তোমার কথা মনে করছে এত রাত্রে—তখন আমার
এই কবিতার প্রতিটি লাইন শব্দ অক্ষর কমা ড্যাশ রেফ্
ও রয়ের ফুট্‌কি সমেত ছুটে যাচ্ছে তোমার দিকে, তোমার
আধোঘুমন্ত নরম মুখের চারপাশে এলোমেলো চুলে ও
বিছানায় আমার নিশ্বাসের মতো নিঃশব্দ এই শব্দগুলি
এই কবিতার প্রত্যেকটি অক্ষর গুনিনের বাণের মতো শুধু
তোমার জন্য, এরা শুধু তোমাকে বিদ্ধ করতে জানে

তুমি ভয় পেয়ো না, তুমি ঘুমোও, আমি বহু দূরে আছি
আমার ভয়ঙ্কর হাত তোমাকে ছোঁবে না, এই মধ্যরাত্রে
আমার অসম্ভব জেগে ওঠা, উষ্ণতা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও
চাপা আর্তরব তোমাকে ভয় দেখাবে না—আমার সম্পূর্ণ আবেগ
শুধু মোমবাতির আলোর মতো ভদ্র হিম,

তোমার শিয়রের কাছে যাবে—এরা তোমাকে চুম্বন করলে
তুমি টের পাবে না, এরা তোমার সঙ্গে সারারাত শুয়ে থাকবে
এক বিছানায়—তুমি জেগে উঠবে না, সকালবেলা তোমার পায়ের
কাছে মরা প্রজাপতির মতো এরা লুটোবে। এদের আত্মা মিশে
থাকবে তোমার শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে, চিরজীবনের মতো

বহুদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হলে ঝর্ণার জলের মতো
হেসে উঠবে, কিছুই না জেনে। নীরা, আমি তোমার অমন
সুন্দর মুখে বাঁকা টিপের দিকে চেয়ে থাকবো। আমি অন্য কথা
বলার সময় তোমার প্রস্ফুটিত মুখখানি আদর করবো মনে মনে
ঘরভর্তি লোকের মধ্যেও আমি তোমার দিকে
নিজস্ব চোখে তাকাবো।
তুমি জানতে পারবে না—তোমার সম্পূর্ণ শরীরে মিশে আছে
আমার একটি অতি ব্যক্তিগত কবিতার প্রতিটি শব্দের আত্মা।

চোখ বিষয়ে

আমি তোমাদের কোন্ অনন্ত ছায়ায়
শুয়ে আছি, শুয়ে রবো, আমি তোমাদের
থেকে বহু দূরে তবু ছায়ার ভিতরে
শুয়ে আছি, জেগে আছি, শিয়রে ও পায়ে
ছায়া পড়ে, ছায়া কাঁপে, চোখের ছায়ায়
মাছ খেলা করে, ভাসে, আমি তোমাদের
মাছের মতন চোখে ছায়ার সাঁতারে
তুলে আনি, তোমাদের গোলাপজামের
মতো চোখ ভালোবাসি, মুখে দিই, দাঁতে
'তোমাদের' ভালোবাসাময় চোখগুলি
ভেঙে যায়, মিশে যায়, হেমন্তবেলায়
শিরীষ ফুলের মতো তোমাদের চোখ
আমাকে পালন করে গোধূলি ছায়ায়।

'তোমাদের' শব্দখানি অনেক কুয়াশা
যেমন শব্দের কাছে নীরবতা ঋণী
যেমন নীরব ফুল সব বন্দনার
চেয়ে শ্রেষ্ঠ, ভ্রষ্ট ফুল যেমন বুকের
কাছে হাত জোড় করে, ছায়ায় শয়ান
ফুল ও বুকের চেয়ে কোমল পাছার
সঙ্গীতের মতো ভঙ্গি যেমন অনেক
দূর মনে হয়, আমি মনের কুয়াশা
'তোমাদের' মুখে রাখি, তোমাদের চোখ
কাজলের মতো লাগে, চোখে চোখে ছুঁয়ে
আমি দেখি, শুয়ে থাকি, যেন বিপুলের
ভিতরে নিঃস্বতা কাঁপে, চঞ্চলতা যেন
ছায়ায় গোপন, মুখ মুখশ্রী লুকোয়—

মুখের ভিতরে চোখ ভাঙে মিশে যায়।

দুপুরে রোদ্দুরে

জ্যোৎস্নার মতো শীতের রোদ, বাসের হাতল ধরে আমি দাঁড়িয়ে
রইলাম, ঋজু, পকেটে পঞ্চাশ, হাওয়া, বুক খোলা, ডানহাতে বইগুলি—
একটা কালো কোটপরা লোক অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে আমার পা মাড়িয়ে দিয়েই
একজন স্ত্রীলোকের বুকে টোকা মারলো, স্ত্রীলোকটির উরু পর্যন্ত
লাল মোজা, খুবই অন্যমনস্ক দুটি আগ্নেয়গিরি তার বুকে, কাচের
এপাশ থেকে তার মুখ অন্ধকারে নিহত সারসের মতো, সে খুব
দুঃখিত স্বরে বললো, হ্যারিংটন (হু ওয়জ হ্যারিংটন ?) স্ট্রীট, মনে
হল সে সারা সকাল ধরে কেঁদেছে, কেননা তার চূর্ণ চুলে রোদ পড়েছিল, সে
আমাকে দেখতে পায়নি। অদূরে যে থ্যাঁতলানো পায়রাটাকে দেখে আমি
শিউরে
উঠেছিলাম, কালো কোটপরা লোকটির আড়াল থেকে সে তাও দেখতে পেল না
সে বললো, রোক্‌কে।
বাস অনেক দূর এসেছে, সে মরা পায়রাটাকে খুঁজে পাবে না।

রোকোকো কথাটা খুব সুন্দর। যেমন বুকলিক, কিন্তু প্যাস্টোরাল
নয়, একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ তিনশো মাইল দূরে চলে গেল....
এখন হঠাৎ ময়দানে নেমে পড়লে আমি কি ফের রাখাল সেজে বাঁশী
বাজাতে পারবো ? 'ভালোবাসা ছিল ভালোবাসার অনেক আগে'—
লম্বা গাছের মাথার উপরে ক্রেন ঝুঁকে আছে, নিখিলেশ কথা বলছে একটা
মেয়ের সঙ্গে, মেয়েটা পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে, হাঁ করে মেয়েটা
নিজের শরীরে কথা ঢোকাচ্ছে, আমি চলে যাবার পর এক মুহূর্ত
ওরা চোখ বুজে ছিল, ঋষিদের মতো স্বভাবতই নিখিলেশ চোখ বন্ধ করে
থাকে।

অন্ধকারে লাল গোলাপ আমার ভালো লাগা চলবে না, কেননা
কমলবাবুর আগেই ভালো লেগেছে, কালো পোশাক ইয়েট্‌সের খুব পছন্দ
ছিল, তার চেয়েও খারাপ....দিনের আলোয় কেন ফুটেছিস সাদা ফুল ?

ছাদের টবে পেচ্ছাব করেছিলাম, সেখানে তবু সুন্দর এক ঝাড় বেলফুল
ফুটেছে, না, লোকটা একটুর জন্য চাপা পড়লো না, আশ্চর্য, লোকটার
হাতে একটা ক্যালেন্ডার, ক্ষমা করুন, কে যেন বললো, না, কে যেন বললো,
দয়া করুন, ক্ষমা করুন, না, না, চোপরাও, না, না—অসম্ভব
এমন দয়াহীন, দয়াপ্রার্থী মানুষের বীজাণু আমার কানের মধ্য দিয়ে ঢুকে
যাক আমি চাই না। আমি বরং রোদ্দুরে একা।

মায়াজাল

দেড় বছর পর অমন চোখ তুলে প্রথম তাকালে
নীরা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন
চৌকো টেবিল, দুপাশে নম্বর আলোর পদরেখা
নীরা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন
মুখের পাশে ঘোরে ধূপের গন্ধ, যেমন ছবিময় পারস্য গালিচা
হাসির ভাঙা স্বর, আলতো সন্ধ্যায় দু' গজ দূর থেকে পরস্পর—
নীরা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন ?

দরজা বন্ধ ও জানলা খোলা, নাকি জানলা বন্ধ খোলা দরজায়
মানুষ আসে যায়, 'বিদেশ থেকে কবে ফিরলে সুনীল ?'
আমার উত্তরে তোমার জোড়া ভুরু, ঈষৎ চশমায় লাস্য, অথবা
সব রকম কাঁচে ছবিও ফোটে না !
তোমার নামে আনা ছোট্ট উপহার ফিরিয়ে নিয়ে যাই লুকিয়ে
নীরা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন
শুধু ও দুটি চোখ, শুধু ও দুটি চোখ দেখতে এতদূর
ছুটে এলাম ?

ক্লান্তির পর

আমি তোমার অধর থেকে ওষ্ঠ তুলে তাকিয়ে দেখি মুখের দিকে
তুমি তোমার কোনো কথাই রাখোনি
কথা ছিল কি এমন করে কান্না, এমন
চোখের দুই পাশ মুচড়ে তাকানোর ?
কথা ছিল কি বিকেলবেলা ঘড়ির নিচে মায়ার খেলা
আদর পেয়ে মাজরীর মতো শরীর বাঁকানো ?
হাওয়ায় এখন নদীর মতো শব্দ ওঠে
তিনটি কথা বলতে এসে তোমার ঠোঁটে
চোখের মধ্যে দেখতে পেলাম মনোহরণ ;
এখন আমার দুঃখ হয় না, রাগ হয় না, ঈর্ষা হয় না
এখন তোমার শরীর থেকে ফুলের গয়না
হাওয়ায় দাও ছড়িয়ে, কেউ এসে তোমায় রক্ষা করুক—

তুমি ভেঙেছো দুঃখ দিনের কঠিন পণ
নদীর শব্দ ছাড়িয়ে এখন বেজে উঠলো মেঘের মতো দুই ডমরু।

সখী, এবার স্পষ্ট কথা বলার দিন এসেছে
দু'পাঁচ বছর বাঁচবো কিনা কেউ জানি না—
আমার কথা শীতের দেশের পাখির মতো ঝরে পড়ে
চিঠি পেয়েছি হিয়েরোগ্লিফিক্‌স্‌ অক্ষরের স্বরান্তরে
বরফ ফেটে অকস্মাৎ বেরিয়ে আসে জলস্তম্ভ
আমি যখন তোমার বুকে মুখ ডুবিয়ে গন্ধ শুঁকি
বৃক্ষ তখন আত্মা পায়, বায়ুতে এসে নিরালম্ব···
ফুলের মধ্যে সূর্যমুখী
ফুটবে আজ দেরিতে খুব, সবুজ ঘরে জ্বলে এখন কমলা আলো
রক্ত আমার অবিশ্বাসী, সন্ধেবেলা দুটো নেশাই লাগলো ভালো
ক্লান্ত মাথা সরিয়ে এনে চোখ রেখেছি তোমার গালে
শরীর খুলে অন্য শরীর, কেন এমন লোভ দেখালে ?
কিছুই বলা হলো না, তুমি কথা রাখোনি, সেই দুঃখে অভিমানে
শ্বাসকষ্ট হলো আমার, চোখেও জল এসেছিল।
চোখ সে কথা ভালোই জানে
আমি
দ্বিধার মধ্যে ডুবে গেলাম !

মৃত্যুদণ্ড

একটা চিল ডেকে উঠলো দুপুর বেলা
বেজে উঠলো, বিদায়,
চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি, বিদায়,
বিদায়, বিদায় !
ট্রামলাইনে রৌদ্র জ্বলে, গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি
হঠাৎ যেন এই পৃথিবী ডেকে দেখালো আমায়
কাঁটা বেঁধানো নগ্ন একটি বুক ;
রূপ গেল সব রূপান্তরে আকাশ হল স্মৃতি
ঘুমের মধ্যে ঘুমন্ত এক চোখের রশ্মি দেখে
অন্ধকারে মুখ লুকালো একটি অন্ধকার।

হঠাৎ যেন বাতাস মেঘ রৌদ্র বৃষ্টি এবং
গলির মোড়ের ঐ বাড়িটা, একটি দুটি পাখি
চলতি ট্রামের অচেনা চোখ, প্রসেশনের নত মুখের শোভা
সমস্বরে ডেকে বললো, তোমায় চিরকালের
বিদায় দিলাম, চিরকালের বিদায় দিলাম, বিদায় ;
চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি, বিদায়, বিদায়, বিদায় ।

নীরা ও জীরো আওয়ার

এখন অসুখ নেই, এখন অসুখ থেকে সেরে উঠে
পরবর্ত্তী অসুখের জন্য বসে থাকা । এখন মাথার কাছে
জানলা নেই, বুক ভরা দুই জানলা; শুধু শুকনো চোখ
দেয়ালে বিশ্রাম করে, কপালে জলপট্টির মতো
ঠাণ্ডা হাত দূরে সরে গেছে, আজ এই বিষম সকালবেলা
আমার উত্থান নেই, আমি শুয়ে থাকি, সাড়ে দশটা বেজে যায় ।

প্রবন্ধ ও রম্যরচনা, অনুবাদ, পাঁচ বছর আগের
শুরু করা উপন্যাস, সংবাদপত্রের জন্য জল-মেশানো
গদ্য থেকে আজ এই সাড়ে দশটায় আমি সব ভেঙেচুরে
উঠে দাঁড়াতে চাই—অন্ধ চোখ, ছোট চুল—ইস্ত্রিকরা পোশাক ও
হাতের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে আমি এখন তোমার
বাড়ির সামনে, নীরা থুক্ করে মাটিতে থুতু ছিটিয়ে
বলি : এই প্রাসাদ একদিন আমি ভেঙে ফেলবো ! এই প্রাসাদে
এক ভারতবর্ষব্যাপী অন্যায় । এখান থেকে পুনরায় রাজতন্ত্রের
উৎস । আমি
ব্রীজের নিচে বসে গম্ভীর আওয়াজ শুনেছি, একদিন
আমূল ভাবে উপড়ে নিতে হবে অপবিত্র সফলতা ।

কবিতায় ছোট দুঃখ, ফিরে গিয়ে দেখেছি বহুবার
আমার নতুন কবিতা এই রকম ভাবে শুরু হয় :

নীরা, তোমায় একটি রঙিন
সাবান উপহার
দিয়েছি শেষবার ;
আমার সাবান ঘুরবে তোমার সারা দেহে।
বুক পেরিয়ে নাভির কাছে মায়া স্নেহে
আদর করবে, রহস্যময় হাসির শব্দে
ক্ষয়ে যাবে, বলবে তোমার শরীর যেন
অমর না হয়....
অসহ্য ! কলম ছুঁড়ে বেরিয়ে আমি বহুদূর সমুদ্রে
চলে যাই, অন্ধকারে স্নান করি হাঙর-শিশুদের সঙ্গে
ফিরে এসে ঘুম চোখ, টেবিলের ওপাশে দুই বালিকার
মতো নারী, আমি নীল-লোভী তাতার বা কালো ঈশ্বর-খোঁজা
নিগ্রোদের মতো অভিমান করি, অভিমানের স্পষ্ট
শব্দ, আমার চা-মেশানো ভদ্রতা হলুদ হয় !

এখন আমি বন্ধুর সঙ্গে সাহাবাবুদের দোকানে, এখন
বন্ধুর শরীরে ইঞ্জেকশন ফুঁড়লে আমার কষ্ট, এখন
আমি প্রবীণ কবির সুন্দর মুখ থেকে লোমশ ভ্রূকুটি
জানু পেতে ভিক্ষা করি, আমার ক্রোধ ও হাহাকার ঘরের
সিলিং ছুঁয়ে আবার মাটিতে ফিরে আসে, এখন সাহেব বাড়ির
পার্টিতে আমি ফরিদপুরের ছেলে, ভালো পোশাক পরার লোভ
সমেত কাদা মাখা পায়ে কুৎসিত শ্বেতাঙ্গিনীকে দু'পাটি
দাঁত খুলে আমার আলজিভ দেখাই, এখানে কেউ আমার
নিম্নশরীরের যন্ত্রণার কথা জানে না। ডিনারের আগে
১৪ মিনিটের ছবিতে হোয়াইট ও ম্যাকডেভিড মহাশূন্যে
উড়ে যায়, উন্মাদ ! উন্মাদ ! এক স্লাইস পৃথিবী দূরে,
সোনার রজ্জুতে
বাঁধা একজন ত্রিশঙ্কু, কিন্তু আমি প্রধান কবিতা
পেয়ে গেছি প্রথমেই, ৯, ৮, ৭, ৬, ৫....থেকে ক্রমশ শূন্যে
এসে স্তব্ধ অসময়, উল্টোদিকে ফিরে গিয়ে এই সেই মহাশূন্য,
সহস্র সূর্যের বিস্ফোরণের সামনে দাঁড়িয়ে ওপেনহাইমার
প্রথম এই বিপরীত অঙ্ক গুনেছিল ভগবৎ গীতা আউড়িয়ে ?
কেউ শূন্যে ওঠে কেউ শূন্যে নামে, এই প্রথম আমার মৃত্যু

ও অমরত্বের ভয় কেটে যায়, আমি হেসে বন্দনা করি :
ওঁ শান্তি ! হে বিপরীত সাম্প্রতিক গণিতের বীজ
তুমি ধন্য, তুমি ইয়ার্কি, অজ্ঞান হবার আগে তুমিই সশব্দ
অভ্যুত্থান, তুমি নেশা, তুমি নীরা, তুমিই আমার ব্যক্তিগত
পাপমুক্তি । আমি আজ পৃথিবীর উদ্ধারের যোগ্য ।

বিড়াল

হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠলো ধড়মড়িয়ে বিমলা
ও কে গেল, কে পালালো, ও দস্যু,....
মায়ের পাশে শুয়ে ছিল, হঠাৎ কেউ ছিঁড়লো বুকের জামা
সারা শরীর জুড়ে রইলো নখের দাগ, বুকটা অমন গরম
করে গেল
ও কে গেল, কে পালালো, ও দস্যু—
ও কেউ নয়, ভয় পাসনি বিমলা,
ও তো বিড়াল
চুরি করে মাঝরাত্রে দুধ খেয়ে পালালো !

একবার হাসপাতালে যাও

একবার হাসপাতালে যাও সুস্থ একটি আপেলের মতো
শায়িতা মূর্তিরা সব তোমাকে ঠোকরাবে চোখে চোখে
ছিমছাম নার্সেরা ঘুরবে, অবিশ্বস্ত নম্রতায় নত
দৈনিক চাকরির মতো আত্মীয়েরা মুহ্যমান ধরাবাঁধা শোকে ।

কেউ বা যকৃৎরোগী, ফুসফুসে পোকা পুষছে কেউ
মাতাল গোরার হাতে হাড়ভাঙা কোণে একজন
ডেটলের কটুগন্ধ নিয়ে আসে সাময়িক বাতাসের ঢেউ—
এরা সব বেঁচে আছে, সাক্ষী আছে বুকের স্পন্দন ।

তুমি এসে লঘু পায়ে বোসো এক রোগিনীর পাশে
সুস্থ করতল দিয়ে একবার ছুঁয়ে দাও বিবর্ণ শরীর

দুধের অর্ধেক তাকে খেতে দিয়ে সরটুকু ফেলে দাও
অলীক বিশ্বাসে
দুই চক্ষু দিয়ে বলো : চিরদিন এই পৃথিবীর

একজন রোগার্ত থাকবে অন্যজন চিরদিন সুখের প্রতীক।
একজন বিকেলবেলা বহুদূর পথ ভেঙে হাসপাতালে এসে
মাটির মানুষ হয়ে বসে থাকবে, অন্যজন দুই হাতে জানালার শিক
ধরে থাকবে প্রতীক্ষায়, প্রতীক্ষার স্বাদ ভালোবেসে।

তিন ঘণ্টা বিচ্ছেদ

ভালোবাসা ছিল কাল সন্ধেবেলা, এখন দুপুরে একটু বিরক্ত লাগছে
তা হলে মাঝরাত অবধি আমাদের ভালোবাসা থাক না মুলতবি!
কিছুক্ষণ দুজনেই দূরে থাকি,
তুমি যাও ফিল্‌মে কিংবা রেস্তোরাঁয় বা সখী-সম্মেলনে,—
অথবা বাথরুমে গিয়ে গান গাও ;
তিন ঘণ্টা কাটাবো আমি অন্য জায়গায়,
তুমি যাও,
না, চোখে থাকবে না নেশা অথবা ক্লান্ত হবো না
খুব ভালোবাসবো রাত্রে শুয়ে।

এ বাড়ি নিলাম হবে যেন কাল,
এই খাট, আলনা ঠোঁট, বুক আলমারি
যেন কাল থাকবে না—এই ভেবে এ কি মারাত্মক আঁকড়ে থাকা।
শরীরের নোনতা ঘাম, চুম্বনের এঁটো থুতু সারাক্ষণ স্বাস্থ্যকর নয়।
সন্ধ্যার আকাশ থাক,
দেখবো না পথে পথে নতমুখে মানুষের শোভা
একবার তবুও বাইরে ;—নির্বোধ হুল্লোড় এত চতুর্দিকে
এর মধ্যে কিছু কি আনন্দ
খুঁটে তোলা যায় না ? কিংবা দেখা যাক না একলা থাকতে কী রকম লাগে—

কোথাও মানুষ আজ একা নেই,
যেন সাইরেনের শব্দে সকলেই হুড়োহুড়ি করে
এক ঘরে কাটাচ্ছে দিন, বুকের মধ্যেও একটু জায়গা নেই।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে পুনশ্চ সিঁড়ির
উপরে তাকিয়ে দেখি, কোন এক অশরীরী পঙ্গু নিশাচর
হাহাকারে কান ধরে টেনে রাখে ;
সন্ধেবেলা কোথাকার তালাবন্ধ সদর দরজার
সামনে দাঁড়িয়ে আমি ? তা হলে কি ফিরে যাবো
খাটের নিচের নিরালায়
শার্ট প্যান্ট এবং শরীরখানা খুলে রেখে বলে উঠবো আমি :
বহুদিন কথা হয়নি, ঝিনুকের মধ্যে তুমি কী রকম রয়েছো ভ্রমর ?

মালতী

স্বপ্ন ভুল দেখা হলো, তবু এ অন্ধকারে
জেগে ও ঘুমোতে ভালো লাগে, কে বারেবারে
জ্যোৎস্না ফুলের মধ্যে নির্জন মুখ গুঁজে
বসে থাকে ? ভোর রাত্রি যেন আমায় খুঁজে
হাওয়ায় উড়াল দিয়ে এলো চাইবাসায়,
স্বপ্নে বহু কথা হলো ছেকাছেনি ভাষায়
ডাক বাংলোর মাঠে, মালতী অত ভোরে
চোখ বুজে জেগে ছিল, আমি কি ঘুমঘোরে
এক থেকে বহু হই ? তার আঁচল ছিঁড়ে
স্তন ও হৃদয় দেখি আড় চোখে, গভীরে
অবিশ্বস্ত পরিতাপ, চার বন্ধু আমরা
পাঁচ টাকা নিয়ে খেলি।
অনেক রক্তক্ষরা
স্বপ্নের বিষাদে মুখ পরস্পর ফিরিয়ে
শরীরের পাঁচ টাকা দুই মুঠিতে নিয়ে
আমাদের খেলা হয়, হয় না শেষ খেলা
বারবার জেগে উঠি, এদিকে ঢের বেলা।

শব্দ ২

আমায় অনুসরণ করে আঠাশ বছর পেরিয়ে আসা শব্দ
যেন তাকায় অতিকুসীদ, যেন হরণ দাবি করে
যেন আমার বুকের মধ্যে তুঁত পোকার মতো নড়ে
অনুসরণ অনুসরণ শব্দ শব্দ ওঁ শব্দ

অতি ক্ষিদেয় খেয়েছিলাম সাতশো বিবেক, শব্দ বললো, 'আমি আছি'
শব্দ আমায় ট্রাম ভাড়া দেয়, বায়োস্কোপে টিকিট কাটে
খুনের রক্তে চোখ ভেসে যায়, দৈবে ঘুরি ঘোর ললাটে
অন্ধকারে মুখ দেখি না মুখের ভয়ে, শব্দ বললো, 'আমি আছি !' ওঁ শব্দ

আঠাশ বছর পবিত্রতার তুক শেখালো, বিনা সুদে আগাম লগ্নী
ওঁ স্বর্ণ ওঁ প্রেম ওঁ বেশ্যা ওঁ মধু ওঁ ভূঃ ওঁ দুঃখ
ওঁ ছায়া ওঁ কাম ওঁ মায়া ওঁ স্বর্গ ওঁ পাপ ওঁ অগ্নি

আঠাশ বছর শিল্প ভেবে হাতে রইলো সবুজ খড়ি
এখন এলাম ঋণের ভয়ে ইস্টিশানে তড়িঘড়ি
কেউ দেখেনি শরীর আমার শরীরীভূত, জ্বলে উঠলো তবু হঠাৎ
নাদ অগ্নি । ওঁ অগ্নি

আঠাশ বছর অনুসরণ যেন হরণ দাবি করে
যেন আমার বুকের মধ্যে তুঁত পোকার মতো নড়ে
অনুসরণ অনুসরণ শব্দ শব্দ মৃত্যুশব্দ । ওঁ শব্দ

কাটামুণ্ডের দিবাস্বপ্ন

আঠাশ বছর কাটলো, মৃত্যুর এখনো দেরী একশো আঠাশ
নদীর ওপারে, শুকনো হাড়ের পাহাড়ে
সব বন্ধুদের ভাঙা কবরখানায় ফুলমালা দীর্ঘশ্বাস
দিয়ে যাবো, পৃথিবীর শেষ শোকসভায়
দেখাবো বিষম ভেল্কি একা ঝুনো হাড়ে ।

হাওয়ায় উড়িয়ে যাবো পাণ্ডুলিপি, শতাব্দীর পাঁশুটে হাওয়ায়
সিগারেট টানতে হলে বইগুলো ছিঁড়ে
চমৎকার জ্বেলে নেবো, একটু বেশী ধোঁয়া হবে, তা হোক, শরীরে
ছারপোকার খুনোখুনি বন্ধ হবে তবুও অন্তত ।
পৃথিবীর গাছগুলি সে-সময় পাতাহীন, ফুলহীন, কিন্তু আপাতত
জেনে নেওয়া যাক তবু, কে তুমি বকুল, শাল কিংবা দেবদারু
মনে রেখো তোমরা, ওহে স্থির
একদিন চরাচর অবশ্যই বিষম বধির
হয়ে যাবে, তখন কে আর কাব্য না খেয়ে না দেয়ে লিখবে
আমাদের মতো
অথবা বিরলে বসে পড়বে-শুনবে, দুঃখ পেতে যাবে ।

এবং অস্থির গাছ লাল নীল হলুদ গোলাপী
কুমারী বা সদ্যোজায়া তোমাদের প্রতি ওষ্ঠপুটে
জানাতে পারিনি প্রেম, কিংবা আহা, তোমাদের শরীরের প্রতি
অঙ্গ খুঁটে
এমন রূপের স্তোত্র আমরা ক'জন এই পুরাতন পাপী
ছাড়া আর কেবা লিখবে ? কেবা দেবে অমরত্ব, আর কেউ দেবে না !
সতত সঞ্চারমানা আজো যারা, কোনোদিন দেখা হয়নি
গৌরী, কৃষ্ণা অথবা শ্যামলী
প্রলয়ের আগে শেষ কথা আমি বলি
ও মসৃণ শোভাগুলি মৃত্যু কিংবা বিবাহের আগে এসে
কবিতার ভিতরে লুকাও
ঠিকানা বা ফোটোগ্রাফ, অথবা অকুণ্ঠে চলে এসো সশরীরে
পৃথিবীর শেষতম কবির দু'চোখ ছুঁয়ে যাও !

'সকল ছন্দের মধ্যে আমিই গায়ত্রী'

ছিলাম বাসনা লঘু, ছন্দ এসে আমাকে সুস্থির হতে বলে
প্রিয় বয়স্যের মতো তার দন্ত পঙ্‌ক্তি
আমি তাকে দূর হয়ে যেতে বলি নতুন বন্ধুর খোঁজে

আমি ছন্দহীন হতে হতে ক্রমশ ধর্মদ্রোহী অগোপন
পাষণ্ড হয়ে যাই।

তবু সে দরজার কাছে মুখ চুন, আমি তাকে পালঙ্কের নিচ থেকে
জুতো মুখে করে আনতে হুকুম করেছি!
দ্বিধা নেই, সে এনেছে, সমালোচকের কানে মেরেছে চপ্পল।

সে আমার হাত ধরে স্ফটিকবর্ণের এক নারীর সান্নিধ্যে
টেনে আনে, মাত্রাহীন আঙুল তুলে নারীকে দেখিয়ে বলে,
সকল ছন্দের মধ্যে এই সে গায়ত্রী, তুমি নাও,
গায়ত্রীর মতো নারী শুয়ে আছে, বিশাল জঘন মেলে,
পর্ব ভেঙে ইশারায় আমাকে উপুড় হতে বলে
আমি তার শরীর বিস্তৃত করি, দুই বক্ষোদেশ ছিঁড়ে ক্রমশ পয়ারে
নিয়ে আসি, উরুদ্বয়ে কিছু কথ্য অশ্লীলতা মিশিয়ে চকিতে
খুলে ফেলি আরবের অলঙ্কার, যদিও নিশ্চিত
কাঙাল কুকুর হয়ে মাঝে মাঝে আমি বড় মিলন প্রত্যাশী।

আমার ছায়া

সতীশের মৃত্যু হলো, জিভ দিয়ে চেটেছিল শ্বেতবর্ণ বিষ।
আমরা সব বেঁচে আছি ঠিকঠাক, কী আশ্চর্য, দেখ হে সতীশ,
ব্যস্ত হয়ে কাজ করছি উদ্ভিদের মতো এক লেবরেটরিতে
রোদ্দুর মেশাচ্ছি দেহে প্রতিদিন, ঝরে যাইনি বর্ষা কিংবা শীতে।
তোমার নবোঢ়া পত্নী কিস্তি হারে শেলাইয়ের কল কিনেছে কাল
দিনরাত ঘর্ঘর শব্দ, টুকরো কাটা ছিটকাপড়, নানান জঞ্জাল
রোজ তাকে ঘিরে থাকবে, সময়ের দাম পাবে গুনে বারোমাস,
আমিও এক-একদিন হঠাৎ হাজির হয়ে করে বসবো চায়ের ফরমাশ।
একটা হাত টেনে তার রেখা গুনে ভবিষ্যৎ বানাবো নির্ভীক,
কপালে অশেষ দুঃখ! বললে, তুমি টিকটিকির সঙ্গে মিশে বলবে ঠিক ঠিক!

ফোটো হয়ে ঝুলে থাকবে, হা সতীশ, নাকের উপর বসবে মশা
নিতান্ত ডাক্তারি মতে আমি ও তোমার পত্নী করবো শোয়া-বসা।
অধুনা স্বাধীনা নারী আমাকে ছুঁয়েই হয়তো তোমার মৃত্যুর কথা বলবে
একদিন
তোমার জীবন ছিল কী শীতল, মানুষেরই মতো, তবু মনুষ্যত্বহীন।
পিঁপড়ের মতন তুমি জীবনকে খুঁটে-খুঁটে চেয়েছো বাঁচাতে
রমণী-শরীর ঘিরে চামচিকে হয়ে শুধু জেগে উঠতে রাতে।
এই সব কথা শুনে আমিও তখন উঠে দাঁড়াবো আলস্যে, কিছু ক্লান্ত
তেতো মনে।
নিজেকে চিমনির ধোঁয়া মনে হতে পারে হয়তো বাইরের নির্জনে।
দীর্ঘ কালো ছায়া পড়বে স্বল্পালোকে চকচকানো পিচ-বাঁধা পথে
কার ছায়া ? আমারই তো,—বলে আমি মিশে যাবো সশরীরে
অদৃশ্য জগতে।

অসমাপ্ত

মেঘের সঙ্গে কথা বলিনি, তাই বিস্মরণে দুঃখ নেই
পাতা পোড়ানো গন্ধ মনে পড়ে, ছেলেবেলার পাতা পোড়ানো
গন্ধ, কলকাতায় পাতা পোড়ে, গন্ধ পাই না—

কেউ কি ময়দানে গিয়ে গান গেয়ে কুকর্ম করেনি ?
আমি রক্ষী ছিলাম, আমি খাকি পোশাকের মতো মুখে
চুপ করে গাছের পাশে দাঁড়াতে দেখেছি। হাওয়ায়
মেয়েদের নিশ্বাস দু' একজন আলাদাভাবে চিনতে পারতো
এ ছাড়া সিংহাসন
হারানো দুঃখে ভোরবেলা সম্রাটের প্রেত হয়ে যাওয়া
এ ছাড়া সিংহাসন
পেয়ে প্রেতের কলঙ্কহীন সম্রাটের সারারাত্রি জুড়ে।

যৌবন আসতে বড় দীর্ঘ সময় লাগে, প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি
উরু ও জিভের ঘোরতর দ্বন্দ্ব যেদিন শেষ হয়
তার পরেই বিস্মরণ, আগে সাদা মেঘ, আমি মেঘের সঙ্গে
কখনো কথা বলিনি। ময়দানের অন্ধকারে নিজেও খাকি
পোশাকের মতো মুখে দাঁড়িয়েছিলাম, চেয়ে দেখেছি বিরক্তিকর
রাত্রির রাস্তা—বিচার বিভাগীয় তদন্তের মতো নির্বোধ দীর্ঘ।

'তুমি কেমন আছো ? কতদিন দেখিনি তোমাকে—'
এ কথা কেউ শৈশবে শোনে না, শুধু এরই জন্য
অপেক্ষা যৌবনের, অন্ধকারে গাছের পাশে—ভালোবাসা
আসে ও চলে যায়
আমি ঘুমের মধ্যে অনেক ভালোবাসা বেসেছি
ও ভালোবাসা ভেঙে যায়
যারা ভালোবাসে না তারা শরীরে সুখী হয়ে পেনশন পায়
খামের চিঠি নানা ঠিকানায় ঘুরলে কেউ অভিমান করে না
পেটে আগুন জ্বলে, গ্রন্থের পাতা পোড়ে, গন্ধ পাই না।
প্রথম নরক দর্শনের আগে জেগে ওঠে ছেলেবেলার গন্ধ
'তুমি কেমন আছো ? কতদিন দেখিনি তোমাকে—'
হঠাৎ হু হু করে ওঠে, বুক মুচড়ে অসম্ভব দীর্ঘ নিশ্বাস
ছুটে আসে—মনে হয় ব্যর্থ অন্ধকারে দাঁড়ানো—
সন্দীপন অসুখ দেখেছিল, আমি অন্ধকারে অন্ধকার ছাড়া কিছুই
দেখিনি।

দ্বিধা

ভালোবাসা ছিল তাই আমি অত ঘৃণায়
ডুব দিতে ভয় পাইনি
মানুষ মেরেছি রক্ত মোছার আঁচল
সামনেই ছিল, সঞ্জীবনীর আয়না
কে কাকে দেখায়, কার মুখ কার ওষ্ঠ
উষ্ণ ললাট চায় না—

ঘোরে ধাতু, ঘ্রাণ শাসন করেন হেডিস
পাহাড় চূড়ায় দুঃখের কাছে যাইনি
ভালোবাসা ছিল নাকি ঘৃণা ছিল ? এখন
ঠিক মনে নেই, ঠিক যেন মনে পড়ে না ।

বহুদিন পর প্রেমের কবিতা

বুকের ভিতরে যেন মুচড়ে উঠলো একুশে এপ্রিল
একুশে এপ্রিল, ওকি চুলের ভিতরে কার ক্ষীণ বজ্রমুষ্টি ?
বিষম লোভের মধ্যে ছুটোছুটি—দূর শহর, অব্যক্ত মন্দিরে
ব্রীজের অনেক নিচে চাঁদ, আঃ সহ্য হয় না এমন জ্যোৎস্নায়
জলের বিমর্ষ শব্দ, এক আনার টিকিট পেরিয়ে
ওপারে পৌঁছুলে ট্রেন, স্টেশনের একুশে এপ্রিল
রাত্রি দিয়েছিল ।

চোরকাঁটা ভরা মাঠে মরা সাপ, যেও না ডিয়াব
আর ও দিকে, দূরে কাছে কোথাও বা অপর সাপের
অসহবাসের কষ্ট অতি বিষ হয়ে আছে, আমি
মেয়েসাপ বড় ঘৃণা করি···এত চাঁপা ফুল কোথায় ফুটেছে
এমন সতেজ গন্ধ···অথবা কি বী-হাইভ ব্রাণ্ডির ?
কখন খেয়েছো ? আঃ! হোল্ড মি টাইট, আঃ, এমন ধারালো
নোখ রেখো না, উঁ, আ, হুঁ হুঁ উঁ, আঃ, আঃ, আ—
বিষ নেই আমার ঠোঁটে বা জিভে বিষ নেই, মৃত্যু নেই, আ
হোল্ড মি টাইট ডিয়ার,···আমার শরীর নেই কাকে ধরবে, আ—
বিষ দিও না ঠোঁটে, প্লিজ, জরায়ুর মধ্যে একটা বিষপিণ্ড দিও না
আ—উঁ, হুঁ, হুঁ, উঃ, লাগে, লাগে আঃ আরো মারো; আমাকে
নিষ্ঠুর ভাবে মারো !

কে ছিল তোমার সঙ্গে মা শেরি, কে ছিল সেই একুশে এপ্রিল ?
ইংরেজি সোহাগ বাক্য কে বলেছে ? অত ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্নারাতে
মানুষ বিষম অন্ধকার হয়
চোখ মুখ চেনা যায় না, ভিজে ঘাসে শরীরে শরীর···
আ আম সিনা, সিনা দা পোয়েট, কে তোমায় বলেছিল ফিসফিসিয়ে, আমি ?
দেখো এই করতল, অবিশ্বাস কত রুক্ষ, এই চোখ দেখে বোঝা যায়
কতদিন পলক ফেলেনি, কলকাতা শহরে কোনো কবি নেই, সবাই পুলিশ
তাই ট্রাফিকের এত গণ্ডগোল, লণ্ঠন জ্বালার চেয়ে অগ্নিকাণ্ডে কতটা সুবিধে
সকলেই জেনে গেছে,···আমার মাথায় শীত, মাংসের বাজারে
ভয়াবহ নামডাক, সরলতা ছিল সেই সন্ধেবেলা, আজ
আমাকে আবার তুমি ডাক দেবে ? কোথায় নদীর সেই ছলচ্ছল শব্দ, দূরে
বিষণ্ণ মাল্লার গান—সেদিনের কথা ভেবে কেন আজ খুশির বদলে
বুক ভরে কুয়াশায়, চোখ জ্বালা করে ওঠে, যেন একজীবন
গাছের ছায়ায় একা বসে আছি, কোনোদিন নারীর হৃদয়ে
হেলাইনি এই মাথা, বিস্মরণে এত কৃতঘ্নতা,
এবার ফিরিয়ে নাও একুশে এপ্রিল !
এবার ফিরিয়ে দেবো একুশে এপ্রিল আমি, ও মুকুট আমায় মানায় না

হাওয়া এসে

নারী শুধু মুখ লুকোবার জন্য, যখন ঝর্ণায় দেখি মুখ
তখন নারীর কথা মনে পড়ে, হাওয়ায় কার্পাস ফুল ভেসে যায় ;
হলুদ আঁচল মাখা যুবতীর পাশে বসে দেখি ঐ কার্পাসের ওড়াওড়ি ।
নদীর সম্মুখ
ঢেকে গেছে কুয়াশায়, শোনা যায় বন্যা-রোধ কামানের তুড়ি
আঁচল সরিয়ে রাখি বুকে ঠাণ্ডা মুখ—
হাওয়া এসে কার্পাসের মতো নিয়ে যায় গাঙ্গেয় সভ্যতা
'নারীকেও নিয়ে যায়' !

এই হাত ছুঁয়েছিল

আহা রে সোনার মূর্তিও কি অবিরল ঝরে যাবে
রাত্তিরে, রোদ্দুরে, বৃষ্টিপাতে পরপুরুষের হাতে
স্তনবৃন্ত দুটি কোন্ খোলা সুইচ ? ছুঁয়ে দিলে হাত কেঁপে ওঠে
এই হাত ছুঁয়েছিল বহু কৃমি, বুকে বাঁধা পাশবালিশ, রক্ত, যেন
রক্তের লালায়
লোভহীন ডুবে মরা, এই হাত ছুঁয়েছিল অশ্রুহীন চোখের চিৎকার
এই হাত ছুঁয়েছিল
এই হাত
সুড়ঙ্গের মতো গলি, খুচরো টাকা নিয়ে ছুটে বিদ্যুতের মতো···
পিছনে জুতোর শব্দ, ঘুমন্ত আয়নার মুখে সিগারেট, এই হাত !

বুকের ভিতরে কোনো বাষ্প নেই কুয়াশায় অন্ধকারে তবু দেখা হল
পুরোনো সিন্দুকে যেন লুকোনো গিনির মতো ঝলসে উঠলো চোখ
স্তনবৃন্ত দুটি কোন্ খোলা সুইচ্, ছুঁয়ে দিলে হাত কেঁপে ওঠে
এই হাতও কেঁপে ওঠে !
ক' কোটি ডাক্তার আছে পৃথিবীতে । পরশুরামের মতো সবগুলোকে মেরে
ওদের রক্তের হ্রদে বেঁচে উঠতে চাই ।
গাছের ছায়ার মতো জ্যোৎস্না এই জ্যোৎস্নার ভিতরে কেউ বেঁচে নেই ।
আকাশের নিচে গাছ, আঁধার পাতার ঝাড়, পাতার ভিতরে স্রোত, সেই
স্রোতের শিরায় নির্মমতা ; আপাতত নির্মমতা আঁচল সরিয়ে
বলে, 'ঐ যে আলো, গেটে দাঁড়ানো মাসতুতো ভাই, আজ তবে যাই ?'

যাও, আর কোনোদিন তুমি একা অন্ধকারে গ্রীবা
এনো না আমার কাছে, যাও, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি
বহুক্ষণ থাকবো, আমি কুকুর আটকাবো, যাও, আজ ভয় নেই
আর কোনোদিন নয় । আজ যাও, ভয় নেই, দাঁড়িয়ে রয়েছি ॥

নারী ও নগরী

ওকে ডাকো, ডেকে বলো ও যেন অমন ঘুমঘোর
না দেখায় খোলা বুকে, গলিপথ বা নিয়ন আলোকে
এমন ঘুমের মধ্যে নিমন্ত্রণ কেন ? যদিও কলকাতা ঘুম জানে না
তবু সে কি স্ত্রীলোকের কাছে গিয়ে ঘুম শিখবে ঘুঙুর ও
তবলার সঙ্গতে ?

প্রণয় ও রান্না ছাড়া বাকি সব স্ত্রীলোকেরা জানে
সেও বড় কাঁচা জানা, যেমন এ শহরের ড্রেন ও হাইড্র্যান্ট
পয়ঃপ্রণালীর এই এলাহি কাণ্ডকারখানা সেও ঢের দূর
স্ত্রীলোকের প্রণালীর চেয়ে—অন্ধকার ময়দানে একলা গিয়ে
ও কি জানে চুপ করে বসে থাকতে ? কলকাতা অনেক কিছু জানে ।
কখনো বেশ্যার মতো নরম নর্দমা তুলে ধরে বটে, তবু
সে সব ট্রাফিক-জ্যাম ঢের ভালো, সে কি তোমাদের ছেঁড়া
মন দেওয়া-নেওয়া

বুকে শুয়ে রামকৃষ্ণ নাম কত উপকারী শরৎ শেখালো
ওকে ডাকো, ডেকে বলো, ধর্ম জীবনের অঙ্গ, ও কিছু জানে না !
ও কি জানে খুনোখুনি—চকিতে ঝলসায় ছুরি রক্তপাত নেই—
জাঙিয়ার বুক পকেট থেকে টাকা কি ভাবে পকেটমারি হয়—
করপোরেশনের ভোটে জরাসন্ধ ছিঁড়ে দুই ফাঁক হয় ফের জুড়ে যায়
চুমু খেতে হলে চাই বিনোবা ভাবের পারমিশান···
এ সব ওর শেখার, ওকে বলো ব্যবসা শিখতে নিমতলায় যাক
অথবা বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট ঘুরে যাক অ্যাসেম্বলিতে—
গোয়েন্দা গল্পের কারখানায় ।

এবার কবিতা লিখে

এবার কবিতা লিখে আমি একটা রাজপ্রাসাদ বানাবো
এবার কবিতা লিখে আমি চাই পনটিয়াক গাড়ি
এবার কবিতা লিখে আমি ঠিক রাষ্ট্রপতি না হলেও
ত্রিপাদ ভূমির জন্য রাখবো পা উঁচিয়ে—
মেষপালকের গানে এ পৃথিবী বহুদিন ঋণী !
কবিতা লিখেছি আমি চাই স্কচ, সাদা ঘোড়া, নির্ভেজাল ঘৃতে পক্ক
মুরগীর দু'ঠ্যাং শুধু, বাকি মাংস নয়—
কবিতা লিখেছি তাই আমার সহস্র ক্রীতদাসী চাই—
অথবা একটি নারী অগোপন, যাকে আমি প্রকাশ্যে রাস্তায় জানু ধরে···
দয়া চাইতে পারি !

লেভেল ক্রসিংয়ে আমি দাঁড়ালেই শুনতে চাই তোপধ্বনি
এবার কবিতা লিখে আমি আর দাবি ছাড়বো না
নেড়ি কুত্তা হয়ে আমি পায়ের ধুলোর থেকে গড়াগড়ি দিয়ে আসি
হাড় থেকে রক্ত নিংড়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছি, ভিক্ষে চেয়ে মানুষের
চোখ থেকে মনুষ্যত্ব খুলে—
কপালের জ্বর, থুতু শ্লেষ্মা থেকে কবিতার জন্য উঠে এসে
মাতাল চণ্ডাল হয়ে নিজেকে পুড়িয়ে ফের ছাই থেকে উঠে এসে
আমরা একলা ঘরে অসহায়তার মতো হা-হা স্বর থেকে উঠে এসে
কবিতা লেখার সব প্রতিশোধ নিতে দাঁড়িয়েছি ।

অচেনা

তোমার হাতে গোলাপ, তুমি ফুলের কাছে ঋণী রইলে···
তোমার হাতে গোলাপ, তুমি ফুলের কাছে ঋণী রইলে···
বাসের অমন ভিড়ের মধ্যে মেয়েটা
আমাকে এক লাইন কবিতা দিয়ে হঠাৎ নম্র-নেত্রপাতে
বেলগাছিয়ায় নেমে গেল রক্ত গোলাপ হাতে
বাকিটা পথ রইলো শুধু ঘামের গন্ধ, ব্রিজের ধুলো
তোমার হাতে গোলাপ, তুমি আমার কাছে ঋণী রইলে ।

দাঁতের ব্যথায় ভুগছেন একজন দার্শনিক

যেন তিনটে শীত ঋতু জমলো তাঁর দাঁতের গোড়ায়
আহা উহু ছাড়া অন্য কথাগুলি অর্ধেক সোচ্চার
পঞ্চাশোর্ধ্ব দার্শনিক লম্বমান করুণ শয্যায়
শিয়রের জানলা খোলা, গৃহভৃত্যগুলি সব বেল্লিক নচ্ছার।
সারাদিন লোক আসছে, সম্পাদক, অধ্যাপক, আমি, কিছু
উচ্চিংড়ের মতো ছাত্র, বাল্যবন্ধু প্রবীণ কেরানী
'অনিত্য দেহের মোহ', 'মায়াচক্র' ইত্যাকার
স্বলিখিত পুস্তকের বাণী
চারিদিকে মুখভঙ্গী করে ; আর সুখ, আহা সুখ,
এতদিনে জানা গেল, কোন্ মন্ত্রে ভর করে নির্বোধের বুক !
ভূমার উপমা ছেড়ে ঘুরে ফিরে দাঁতের গোড়ায় যাচ্ছে মন
পৃথিবীর সারবস্তু উষ্ণ জল, বোরিক-কটন !

দু'জনের কাছে ঋণ

একজনের কাছে কিছু ক্ষমা ভিক্ষা আছে, আরেকজনের কাছে প্রতিশোধ
তোমরা দু'জন আজ কোথায় রয়েছো ?
দুই ঋণ
আমি দু'জনের কাছে ঋণী
আমি ক্ষমা চাইবো, আমি ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেবো।
নতজানু হয়ে বসবো বহু অশ্রুজলে, মাটির মায়ায় দুই হাত
কপালের থেকে কিছু রক্তবিন্দু, ক্ষমা করো, একজীবন যাপন করেছি
আমার বিশ্বাস ছিল, ক্ষমা করো, আমার দর্পিত পদভার
আমার শব্দের প্রতি মায়া ছিল, ক্ষমা করো, ফুল-ছেঁড়া বিকেলে
আমি বারান্দার কাছে—ক্ষমা করো, আমি মধ্যরাত ভেঙে একা
ওষুধের কারখানা লুণ্ঠন করেছি, ক্ষমা করো !
আমি ভিখারির হাত থেকে নিজে ভিখারি হয়েছি
অন্ধ মানুষের পাশে হেঁটেছি চোখ বুজে
স্ত্রীলোকের ইশারায় বহু ভুল অরণ্যে গিয়েছি
আজ নতজানু, ক্ষমা করো, ক্ষমা, কেউ একজন।

আমি প্রতিশোধ নেবো, আমার রক্তের মধ্যে হা-হা শব্দে
আগুন জ্বলেছে
শিরাগুলি টানটান, চোখ জেগে, কেউ একজন, আমি প্রতিশোধ নেবো—
আমার কব্জির পাশে রেখেছিলো নোংরা হাত
আমার বুকের খুব কাছাকাছি ভিয়েৎনাম জাগিয়ে তুলেছে
আমার চোখের দিকে এমন তাচ্ছিল্য চোখে চেয়েছিল
আমার স্বপ্নের মধ্যে বিদায়ের ঘণ্টা বাজিয়েছে
আমি প্রতিশোধ নেবো, ক্ষমা চেয়ে প্রতিহিংসা নিতেও ভুলবো না।

দেখা হবে

ভ্রূ-পল্লবে ডাক দিলে, দেখা হবে চন্দনের বনে—
সুগন্ধের সঙ্গ পাবো দ্বিপ্রহরে বিজন ছায়ায়
আহা কী শীতল স্পর্শ হৃদয়-ললাটে, আহা, চন্দন, চন্দন
দৃষ্টিতে কি শান্তি দিলে, চন্দন, চন্দন
আমি বসে থাকবো দীর্ঘ নিরালায়!

প্রথম যৌবনে আমি অনেক ঘুরেছি অন্ধ, শিমুলে জারুলে
লক্ষ লক্ষ মহাদ্রুম, শিরা-উপশিরা নিয়ে জীবনের কত বিজ্ঞাপন
তবুও জীবন জ্বলে, সমস্ত অরণ্য-দেশ জ্বলে ওঠে অশোক আগুনে
আমি চলে যাই দূরে, হরিণের ত্রস্ত পায়ে, বনে বনান্তরে অন্বেষণ।

ভ্রূ-পল্লবে ডাক দিলে…এতকাল ডাকোনি আমায়
কাঙালের মতো আমি এত একা, তোমার কি মায়া হয়নি,
শোনোনি আমার দীর্ঘশ্বাস?
হৃদয় উন্মুক্ত ছিল, তবুও হৃদয় ভরা এমন প্রবাস!…
আমার দুঃখের দিনে বৃষ্টি এলো, তাই আমি আগুন জ্বেলেছি,
সে কি ভুল?
শুনিনি তোমার ডাক, তাই মেঘমন্দ্র স্বরে গর্জন করেছি, সে কি ভুল?
আমার অনেক ভুল, অরণ্যের একাকীত্ব, অস্থিরতা, ভ্রাম্যমাণ ভুল!

এবার তোমার কাছে…এ অন্য অরণ্য আমি চিনে গেছি
এক মুহূর্তেই
সর্ব অঙ্গে শিহরন, ক্ষণিক ললাট ছুঁয়ে উপহার দাও সেই
অলৌকিক ক্ষণ
তুমি কি অমূল-তরু, স্নিগ্ধজ্যোতি, চন্দন, চন্দন
দৃষ্টিতে কি শান্তি দিলে চন্দন, চন্দন
আমার কুঠার দূরে ফেলেদেবো,চলো যাই গভীর গভীরতম বনে ।

বন্দী, জেগে আছো

সূচিপত্র

গহন অরণ্যে ১২১, চিনতে পারোনি ১২১, ছায়ার জন্য ১২২, দুটি অভিশাপ ১২৩, একদিন··· ১২৪, অনন্ত মুহূর্ত ১২৫, বাণী-বন্দনা ১২৬, চিঠি ১২৭, নীরার অসুখ ১২৭, মূক ব্যবহার ১২৮, আথেন্‌স থেকে কায়রো ১২৯, ডাকবাংলোতে ১৩০, কেউ কথা রাখেনি ১৩১, শব্দার্থ ১৩৩, নদীর ওপারে ১৩৩, মাটি ১৩৪, ছেলেটা ১৩৪, অরূপ রাজ্য ১৩৫, ভালোবাসা ১৩৬, জয়ী নই, পরাজিত নই ১৩৭, পাথর ১৩৮, বাড়ি ফেরা ১৩৮, নীরার হাসি ও অশ্রু ১৪০, ইচ্ছে ১৪১, জলের সামনে ১৪১, জীবন ও জীবনের মর্ম ১৪২, শব্দ ১৪৩, নিসর্গ ১৪৪, দ্বারভাঙা জেলার রমণী ১৪৪, উত্তরাধিকার ১৪৫, নীরার পাশে তিনটি ছায়া ১৪৬, বন্দী, জেগে আছো ? ১৪৬, সিন্ধিতে এক উৎসবে ১৪৭, আত্মা ১৪৯, ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি ১৪৯, শরীর অশরীরী ১৫০, আজ সকালবেলা ১৫২, ধান ১৫৩, কৃতঘ্ন শব্দের রাশি ১৫৩, সারা জীবন বেড়াতে এলে ১৫৪, আরও নিচে ১৫৫, তুমি ১৫৬, কঙ্কাল ও সাদা বাড়ি ১৫৭, নিরাভরণ ১৫৮, প্রবাসের শেষে ১৫৮

গহন অরণ্যে

গহন অরণ্যে আর বারবার একা যেতে সাধ হয় না—
শুকনো পাতার ভাঙা নিশ্বাসের মতো শব্দ
তলতা বাঁশের ছায়া, শালের বল্লরী,
সরু পথ
কালভার্টে, টিলার জঙ্গলে একা বসে থাকা কী রকম নিঝুম বিষণ্ণ
বড় হিংস্র দুঃখময়।
অসংখ্য আত্মার মতো লুকোনো পাখি ও প্রাণী, অপার্থিব নির্জনতা
ফুলের সুবর্ণরেখা গন্ধ, সামনে ঢেউ উৎরাই—
অসহিষ্ণু জুতোর ভিতরে বালি, শিরদাঁড়া ব্যথা পেতে দ্বিধা করে
কেননা বুকের মধ্যে চাপা হাওয়া, করতলে মুখ।
গহন অরণ্যে আর বারবার একা যেতে সাধ হয় না—
তবু যেতে হয়
বারবার ফিরে যেতে হয়।

চিনতে পারোনি ?

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
তুমি আমার বাল্যকালের খেলার সঙ্গী
মনে পড়ে না ?
কেন তোমার ব্যস্ত ভঙ্গি ?
কেন আমায় এড়িয়ে যাবার চঞ্চলতা !
আমার অনেক কথা ছিল, তোমার জামার বোতাম ঘিরে
অনেক কথা
এই মুখ, এই ভুরুর পাশে চোরা চাহনি,
চিনতে পারোনি ?

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
আমি তোমার বাল্যকালের খেলার সঙ্গী
মনে পড়ে না ?

আমরা ছিলাম গাছের ছায়া, ঝড়ের হাওয়ায় ঝড়ের হাওয়া
আমরা ছিলাম দুপুরে রুক্ষ
ছুটি শেষের সমান দুঃখ—
এই দ্যাখো সেই গ্রীবার ক্ষত, এই যে দ্যাখো চেনা আঙুল
এখনো ভুল ?
মনে হয় না তোমার সেই নিরুদ্দেশ সখার মতো ?
কেন তোমার পাংশু চিবুক, কেন তোমার প্রতিরোধের
কঠিন ভঙ্গি
চিনতে পারোনি ?

যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো,
শত্রু নই তো, আমরা সেই ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী
মনে পড়ে না ?
আমরা ছিলাম নদীর বাঁকে ঘূর্ণিপাকে সন্ধেবেলা
নিষিদ্ধ দেশ, ভাঙা মন্দির, দু' চোখে ধোঁয়া
দেবী মানবীর প্রথম দ্বিধা, প্রথম ছোঁয়া, আমৃত্যু পণ
গোপন গ্রন্থে এক শিহরন, কৈশোরময় তুমুল খেলা···
লুকোচুরি খেলার শেষে কেউ কারুকে খুঁজে পাইনি
দ্যাখো সে মুখ, চোরা চাহনি
একই আয়না
চিনতে পারো না ?

ছায়ার জন্য

গাছের ছায়ায় বসে বহুদিন কাটিয়েছি
কোনোদিন ধন্যবাদ দিইনি বৃক্ষকে
এখন একটা কোনো প্রতিনিধি বৃক্ষ চাই
যাঁর কাছে সব কৃতজ্ঞতা
সমীপেষু করা যায় ।
ভেবেছি অরণ্যে যাব—সমগ্র সমাজ থেকে প্রতিভূ বৃক্ষকে খুঁজে নিতে
সেখানে সমস্তক্ষণ ছায়া
সেখানে ছায়ার জন্য কৃতজ্ঞতা নেই

যেখানে রক্তিম আলো নির্জনতা ভেদ করে খুঁজে নেয় পথ
মুহূর্তে আড়াল থেকে ছুটে আসে কপিশ হিংস্রতা
গাঢ় অন্ধকার হলে আমি অসতর্ক অসহায়
জানু পেতে বসে বলব,
বহুদিন ছায়ায় কেটেছে এ জীবন—
হে ছায়া, আমারই হাতে তোমার ধ্বংসের মন্ত্র
বুকের ভিতরে ছিল শ্বাস—তার পরিক্রমা ঘূর্ণি দুনিয়ায়
ভূতলে অশুভ শব্দ, আঁচের মতন লাগে পাতার বীজন—
তবু শেষবার
পুরোনো কালের মতো বন্ধু বলে ডাকো
বল্কল বসন দাও, দাও রসসিক্ত ফল, দ্বিধাহীন হয়ে একটু শুয়ে থাকি
শেষ প্রহরের আগে
এই হত্যাকারী হাতে শেষবার প্রণাম জানাই।

দুটি অভিশাপ

সমুদ্রের জলে আমি থুতু ফেলেছিলাম
কেউ দেখেনি, কেউ টের পায়নি
প্রবল ঢেউ-এর মাথায় ফেনার মধ্যে
মিশে গিয়েছিল আমার থুতু
তবু আমার লজ্জা হয়, এতদিন পর আমি শুনতে পাই
সমুদ্রের অভিশাপ।

মেল ট্রেনের গায়ে আমি খড়ি দিয়ে এঁকেছিলাম
নারীর মুখ
কেউ দেখেনি, কেউ টের পায়নি
এমনকি, সেই নারীরও চোখের তারা আঁকা ছিল না
এক স্টেশন পার হবার আগেই বৃষ্টি, প্রবল বৃষ্টি
হয়তো বৃষ্টির জলে ধুয়ে গিয়েছিল আমার খড়ির শিল্প
তবু আমার লজ্জা হয়, এতদিন পর আমি শুনতে পাই
মেল ট্রেনের অভিশাপ।

প্রতিদিন পথ চলা কি পথের বুকে পদাঘাত ?
নারীর বুকে দাঁত বসানো কি শারীরিক আক্রমণ ?
শীতের সকালে খেজুর-রস খেতে ভালো-লাগা
কি শোষক সমাজের প্রতিনিধি হওয়া ?
প্রথম শৈশবে সরস্বতী-মূর্তিকে আলিঙ্গন করা কি পাপ ?
এসব বিষয়ে আমি মনস্থির করতে পারিনি
কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনতে পাই
সমুদ্র ও মেল ট্রেনের অভিশাপ !

একদিন…

একদিন তোমার হাত ধরে জয়পুরের রাস্তা দিয়ে বেড়াবো,
অসমাপ্ত পাহাড়কে বলবো, আমরা এসেছি ।
একটা শুকনো নদীর গর্ভে নেমে গিয়ে মরা ঝাঁঝি
হাতে তুলে নিয়ে বলবো, মনে আছে
ঝাড়লণ্ঠনের বিচ্ছুরিত আলোর মতন আনন্দ খেলা করবে শরীরে ।
কোনোদিন জয়পুর যাইনি, কিন্তু জানি কোথায় জয়পুর আছে—
চিনতে আমার ভুল হবে না !
ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে একটা ভয়হীন মিনারে ঠেস দিয়ে
হাওয়া থেকে আঁচল ফিরিয়ে আনবে তুমি
তোমার মকরমুখো সুবর্ণ কঙ্কণে রিনিঝিনি শব্দ উঠলে
আমি লীয়মান সূর্যরশ্মির দিকে তাকিয়ে বলবো,
এবার অম্বা মন্দিরে ঠিক সাতটা ঘণ্টা বাজবে
শুধু শব্দ নয়, তার প্রতিধ্বনি, শুধু অর্জন নয়, তার উপহার
ফিরে আসবে তখন, কে যেন বলবে, জানতাম !
মর্মরে প্রতিফলিত মুখশ্রী প্রশ্ন করবে, সত্যি, সব মনে আছে ?
আমি সবকটা বোতাম খুলে হেসে বলবো,
বাঃ, জলের ধারে বসে থাকার ছবি কখনো মুছে যায় ?
প্রতিটি নিশ্বাস দীর্ঘ—এইরকম দুঃখহীন খুশির মধ্যে
হাত ধরাধরি করে ছুটতে ছুটতে শুনতে পাবো
রাজপুতানীদের মান-ভাঙার গান

কেউ উচ্চারণ করবে না, তবুও সবাই বলবে,
আঃ, কি সুন্দর বেঁচে আছি, উড়বে লাল রঙের ধুলো
এক মুহূর্তের জন্য সমস্ত মৃতেরাও জেগে উঠে ধন্যবাদ দিয়ে যাবে
পাথুরে সবল রাস্তা যেখানে বাঁক ঘুরে ঢালু হয়ে নেমেছে
সেখানে আমরা থমকে দাঁড়ালে ভেসে আসবে তরতাজা দৃশ্যের ঘ্রাণ
ময়ূরের আত্মীয়ের মতন সন্ধ্যা অকস্মাৎ উল্লসিত হয়ে ঘোষণা করবে :
এই নাও, আজ এই জয়পুর তোমাদের ।

অনন্ত মুহূর্ত

মধ্যাহ্ন-বাগানে এসে ঝুঁকে আছে সাতফুট আলো
আমি জানি
ওখানে শয়তান দাঁড়িয়ে নেই ।
আমার বাঁ পাশে একটি বাজে পোড়া আমলকী বৃক্ষ
তাকে আমি গোপনে হিন্তাল বলে ডাকি
তার নিচে অতি স্বচ্ছ দর্পণ গোষ্পদ
ওখানে অপ্সরীরা খেলা করে না
সাতফুট স্থির আলো, আমি জানি
ওখানে কেউ দাঁড়িয়ে নেই ।

এখন সকালবেলা অপরাংশে মেঘ ছায়া মেঘ
পাগলাটে একদল পাখি ঝগড়া করে মাটিতে লুটোয়
ফের উড়ে যায়, ওরা
নিহত আমলকী গাছে কখনো বসে না
লাল টিপ ফুলের ঝাড়ে ব্রাহ্মণ গরুটি খুব নিঃশব্দ
আমি চেয়ে আছি পুবে, ওদিকে দেয়াল ভাঙা,
পলেস্তারা খসা
বাগানে উত্তর গেটে কখন এসেছে এক নারী, এলোচুল
বাঁ হাত রেলিঙে ভর
ঢুকবে কি ঢুকবে না সেই দ্বিধায় মুখশ্রী তার রহস্যময়
গভীর নিশ্বাসে তার দুই স্তন ফুলে উঠে কানকানি করে

আমি তাকে এক পলক দেখে ফের চোখ রাখি
ভাঙা দেয়ালের দিকে
সেখানে কিছুই নেই—
আপাতত এই আমার অনন্ত মুহূর্ত।

বাণী-বন্দনা

জাগো, জেগে ওঠো বাণী, আজ অন্ধকার, আজ
বড় বেশি তপ্ত অন্ধকার, আজ জাগার সময়
ওরে বিষের পুত্তলি, তোর এত ঘুম ?
পয়োমুখ বিষের ছুরির মতো জিভ, ঐ বিষ দৃষ্টি
ঐ দেহ-বল্লরীর বিষ ঘাম, এ সবই তো এখন আঁধারে
মানুষের প্রাণ চায় ; বাণী, কুহকিনী
আচমকা দুয়ার খুলে প্রেমিক ও পূজারীকে নীল করো
কবির দু-কানে ঢালো প্রার্থিত গরল আর শ্রেষ্ঠী কিংবা
রাজপুরুষের
ব্যাকুল ঠোঁটে ও মুখে ছোবলের মতো চুমু, লুব্ধ প্রতিহারী
তোমার উন্মুখ স্তনে মুখ দিয়ে টানে গুপ্তবিষ, বিষ, বিষ
অন্ধকার বিষে ভরে যাক
বাণী, ওরে বিষকন্যা, তোর নগ্ন শরীরের দুলে ওঠা মোহিনী মায়ায়
অ্যারিস্টট্‌লকে তুই ঘোড়া কর, সূর্যকে ভ্রূভঙ্গি হেনে
শিরোপালোভীকে দুই পদাঘাত উপহার দিয়ে
প্রগাঢ় তামসে তোর নাচের উৎসব শুরু হোক।
আজ মনে হয়
বাণী, তোর জেগে ওঠা সভ্যতার একমাত্র সূচিকাভরণ।

চিঠি

ভৌতিক পিওন যবে খেলাচ্ছলে পার হয় রাসবিহারী মোড়
আমার হুকুমে সব গাড়ি থেমে থাকে
লাল আলো, লাল আলো, ঐ শোনো কণ্ঠস্বর
ঐ দ্যাখো অশ্বত্থের বাঁকা ডাল নুয়ে আছে বিদ্যুতের দিকে
ঘূর্ণি বাতাসের মধ্যে চিঠি উড়ে যায়।

হিমানী স্তব্ধতা ভেঙে নেমে এলো অলৌকিক রোদ
বহু থেকে এক হলো একটি রমণী
তার
রুপালি স্তনের পাশে
ভবঘুরে তিনটে ফড়িং!
বৃক্ষ ও মানুষ শোভাযাত্রা করে এসেছিল, জানি
সব থেমে আছে
এ তোমার এ আমার বিশেষ মুহূর্ত নয়
পৃথিবী সমস্তক্ষণ সর্বজনীন না
এখন একজন শুধু রক্তিম আলোর নিচে
চিঠি পাবে।

নীরার অসুখ

নীরার অসুখ হলে কলকাতায় সবাই বড় দুঃখে থাকে
সূর্য নিবে গেলে পর, নিয়নের বাতিগুলি হঠাৎ জ্বলার আগে জেনে নেয়
নীরা আজ ভালো আছে?
গীর্জার বয়স্ক ঘড়ি, দোকানের রক্তিম লাবণ্য—ওরা জানে
নীরা আজ ভালো আছে!
অফিস সিনেমা পার্কে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে মুখে রটে যায়
নীরার খবর
বকুল মালার তীব্র গন্ধ এসে বলে দেয়, নীরা আজ খুশি

হঠাৎ উদাস হাওয়া এলোমেলো পাগ্‌লা ঘণ্টি বাজিয়ে আকাশ জুড়ে
খেলা শুরু করলে
কলকাতার সব লোক মৃদু হাস্যে জেনে যায়, নীরা আজ বেড়াতে গিয়েছে।

আকাশে যখন মেঘ, ছায়াচ্ছন্ন গুমোট নগরে খুব দুঃখ বোধ
হঠাৎ ট্রামের পেটে ট্যাক্সি ঢুকে নিরানন্দ জ্যাম চৌরাস্তায়
রেস্তোরাঁয় পথে পথে মানুষের মুখ কালো, বিরক্ত মুখোশ
সমস্ত কলকাতা জুড়ে ক্রোধ আর ধর্মঘট, শুরু হবে লণ্ডভণ্ড
টেলিফোন পোস্টাফিসে আগুন জ্বালিয়ে
যে-যার নিজস্ব হৃৎস্পন্দনেও হরতাল জানাবে—
আমি ভয়ে কেঁপে উঠি, আমি জানি, আমি তৎক্ষণাৎ ছুটে যাই, গিয়ে বলি,
নীরা, তুমি মন খারাপ করে আছো ?
লক্ষ্মী মেয়ে, একবার চোখে চাও, আয়না দেখার মতো দেখাও ও মুখের মঞ্জরী
নবীন জলের মতো কলহাস্যে একবার বলো দেখি ধাঁধার উত্তর !

অমনি আড়াল সরে, বৃষ্টি নামে, মানুষেরা সিনেমা ও খেলা দেখতে
চলে যায় স্বস্তিময় মুখে
ট্রাফিকের গিট খোলে, সাইকেলের সঙ্গে টেম্পো, মোটরের সঙ্গে রিকশা
মিলে মিশে বাড়ি ফেরে যে-যার রাস্তায়
সিগারেট ঠোঁটে চেপে কেউ কেউ বলে ওঠে, বেঁচে থাকা নেহাত মন্দ না !

মূক ব্যবহার

নিজের গলার স্বর যন্ত্রে শুনবো, ঐ যন্ত্র বলবে 'ভালোবাসি'
আর কেউ বলেনি, আমি কারুকে বলিনি।
আয়নার ভিতর দিয়ে চুরি করে গেছি বহুবার
স্বর্গের পোস্টাফিসে সন্ধেবেলা
কেউ কিছু লেখেনি ; যন্ত্র, তুমি বলো, 'ভালোবাসি'।

মানুষ হয়েছে আজ নিষ্ঠুর না বিষম লাজুক ?
কেই কারুর মুখের দিকে চোখ তুলে চায় না কথা বলে না

মাঝে মাঝে ওষ্ঠ খুলে অনুবাদে হাসাহাসি হয়—
চোখ জ্বলে যায় ঘুমে—ঘুমের ভিতর দ্বিপ্রহর,
এসো তুমি, ঘুমোবে আমার ঘরে বুকের মতন এক শীতলপাটিতে
একথা বলে না আর কেউ—
কুমারীর হাত ধরে হেঁটে যাই দীঘির উপরে
বাঁকা জ্যোৎস্না বুক ভেদ করে যায়—তবুও স্তব্ধতা, বড় স্মৃতিকষ্ট হয়,
'ফিরে এসো'—এই ধ্বনি বার বার গুমরে গুমরে ওঠে ।

যন্ত্রের সম্মুখে সব স্বীকারোক্তি হয়ে যায়, একা
মধ্যরাত্রি হু-হু'করে, অবিন্যস্ত দীর্ঘ কেশভার,
পাশের পালঙ্কে ঘুমে আছো তুমি, ক্লান্ত মুখ, বসন শিথিল
খুলেছে সায়ার গিঁট, চোখের দু' পাশে একটু ছায়া, তুমি
ঘুমোও এখন, আমি জাগাবো না—
ভালোবাসা, অবিশ্বাস—দু'জনেই আজ এত মূক
প্রতিবাদও করে না আজ গম্ভীর গর্জন
প্রেম যেন মুখ থেকে চলে যায় শরীরের সহস্র আঙুলে
মায়া লাগে,
অথচ বুকের মধ্যে কথা ছিল, ঘুম থেকে ডেকে ওঠাবার সাধ ছিল,
যন্ত্র, তুমি একদিন সাক্ষী দিও ।

আথেন্‌স থেকে কায়রো

বিমানের মধ্যে আমি টাই খুলে ফেলে, সিট বেল্ট সরিয়ে
উঠে দাঁড়ালুম
চিৎকার করে বললুম, কে কোথায় আছো ?
পেঁজা তুলোর মতন তুলতুলে মুখ দু'জন হাওয়া-সখী ছুটে এলো—
তখন মাথার উপর ও নিচে ভূমধ্য আকাশ এবং রুপালি সাগর
মাঝখানে নীল মেঘ ও ফড়িং
পিছনে সন্ধেবেলার ইওরোপ জ্বলছে দাউ দাউ আগুনে
সামনে প্রাচ্যদেশ জুড়ে অন্ধকার

আমি কর্কশভাবে বললুম, কোথায় থাকো এতক্ষণ, আমি
আধঘণ্টা আগে পানীয় চেয়েছি,
তা ছাড়া আমার খিদে পেয়েছে—
বালিকা-সাজা দুই যুবতী অপ্রতিভ ভাবে হাসলো
সেই আগুন ও অন্ধকারের মাঝখানে নারী-হাস্য খুব অবান্তর লাগে
তাদের শরীরের রেখা বিভঙ্গের দিকে চোখ পড়ে না
ভূমধ্য সাগরের অন্তরীক্ষে নিজেকে বন্ধনমুক্ত ও সরল সত্যবাদী
মনে হয় অকস্মাৎ—
পিছনে জ্বলন্ত ইওরোপ, সামনে ভস্মসাৎ কালো প্রাচ্যদেশ
এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি নিঃসঙ্গ ভারতীয়, আমি সম্রাটের পুত্র
সমস্ত পৃথিবীর উদ্দেশ্যে এখন আমি তীব্র কণ্ঠে বলতে চাই,
আমার খিদে পেয়েছে, আমার খিদে পেয়েছে
আমি আর সহ্য করতে পারছি না—
আমি কামড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে খাবার জন্য উদ্যত হয়েছি।

ডাকবাংলোতে

ফুটে উঠলো একটি দুটি টগর
কণ্ঠে মুক্তা মালা
মরি মরি

তোমরা আজ সকালবেলার প্রসন্নতা
এক মুহূর্ত শিশির ভেজা আলো
নর্মছলে তোমরা অপ্সরী।

'কি সুন্দর ঐ টগর ফুল দুটো—
খোঁপায় গুঁজবো আমি !'
প্রাক্-যুবতী বারান্দার প্রান্তে এসে আঁখি তুললো—
সদ্য ভোর, বিরল হাওয়া, ঠাণ্ডা রোদ
সাংকেতিক পাখির ডাক, উপত্যকায় নির্জনতা
আমি বেতের ইজিচেয়ারে অলস।

ফুলের থেকে চোখ ফিরিয়ে নারীর দিকে
চোখই জানে চোখের মায়া, দৃষ্টি জানে সৃষ্টির পূর্ণতা
একটি চাবি যেমন বহু বন্দী মুক্তি,
চাবির মতন
একপলকের চেয়ে দেখা
বললো আমায় :
নারী যতই রূপসী হোক, এই মুহূর্তে মুকুটহীনা ।

চেয়ার ছেড়ে উঠে, বারান্দা থেকে নেমে
টগর গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আমি হাত বাড়িয়েছি
হাত থেমে রইলো শূন্যে
পৃথিবী কাঁপে না, তবু কখনো কখনো মানুষের
ভূমিকম্প হয়

এত বাতাস, তবু দীর্ঘশ্বাস নিতে ইচ্ছে হয় না
ভুবনময় এই মোহিনী আলোর মধ্যে দুলে ওঠে বিষণ্ণতা
হাত থেমে রইলো শূন্যে
টগর গাছের পাশে হলুদ সাপ
চোখে চোখ, হিম সম্ভাষণ
কি তথ্য এনেছো তুমি, প্রহরী ?
হলুদ সাপ সকালের মূর্তিমতী স্তব্ধতাকে ভেঙে
সেই ভাঙা গলায়
বলে উঠলো :
ঘূর্ণি জলের পাশে একদিন দেখে নিও
মুখের ছায়ায় রৌদ্র-ভ্রমরীর খেলা !

কেউ কথা রাখেনি

কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনি
ছেলেবেলায় এক বোষ্টুমি তার আগমনী গান হঠাৎ থামিয়ে বলেছিল
শুক্লা দ্বাদশীর দিন অন্তরাটুকু শুনিয়ে যাবে ।

তারপর কত চন্দ্রভুক অমাবস্যা এসে চলে গেল কিন্তু সেই বোষ্টুমি
আর এলো না
পঁচিশ বছর প্রতীক্ষায় আছি।

মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলি বলেছিল, বড় হও দাদাঠাকুর
তোমাকে আমি তিনপ্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবো
সেখানে পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমর
খেলা করে!
নাদের আলি, আমি আর কত বড় হবো ? আমার মাথা এই ঘরের ছাদ
ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে তারপর তুমি আমায়
তিনপ্রহরের বিল দেখাবে ?

একটাও রয়্যাল গুলি কিনতে পারিনি কখনো
লাঠি-লজেন্স দেখিয়ে দেখিয়ে চুষেছে লস্করবাড়ির ছেলেরা
ভিখারীর মতন চৌধুরীদের গেটে দাঁড়িয়ে দেখেছি
ভিতরে রাস-উৎসব
অবিরল রঙের ধারার মধ্যে সুবর্ণ কঙ্কণ পরা ফর্সা রমণীরা
কতরকম আমোদে হেসেছে
আমার দিকে তারা ফিরেও চায়নি!
বাবা আমার কাঁধ ছুঁয়ে বলেছিলেন, দেখিস, একদিন আমরাও…
বাবা এখন অন্ধ, আমাদের দেখা হয়নি কিছুই
সেই রয়্যাল গুলি, সেই লাঠি-লজেন্স, সেই রাস-উৎসব
আমায় কেউ ফিরিয়ে দেবে না!

বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুণা বলেছিল,
যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালোবাসবে
সেদিন আমার বুকেও এরকম আতরের গন্ধ হবে!
ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি
দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়
বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮টা নীলপদ্ম
তবু কথা রাখেনি বরুণা, এখন তার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ
এখনো সে যে কোনো নারী!
কেউ কথা রাখোনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে না!

শব্দার্থ

এখন ইস্কুল বন্ধ, বালক সীমান্তে যায় চাল কিনতে
চালের বাজারে বড় খুনসুটি, চালের ভিতরে বহু হাত
চোখ ও নিশ্বাসময়, পাথর ও কীট-ভরা, তবুও সুগন্ধ ;
বালকের ভীরু হাত থলি খোলে, চেয়ে দেখে ওজনের কাঁটা—
জলস্থল অন্তরীক্ষ আগ্রহে প্রত্যক্ষ করে বালকের সুশিক্ষার দৃশ্য
পুলিশকে সিকি দিতে তারাই শিখিয়ে দেয়, ওপরে চাপায় সজনে ডাঁটা

মেঠো পথে ফিরে আসে। সুবোধ বালক, তুমি ও চাল খেয়ো না,
বিক্রি করো, কিলো-তে আটানা লাভ, সেই ভালো, শোনো,
চাল হলো শব্দ, তার অর্থ জেনে নিয়ে হাতে না তুললে
শিক্ষা অসমাপ্ত থাকে, শব্দ নয়, অর্থই তো শিক্ষার মহিমা।
এখন ইস্কুল বন্ধ, তবু দিন দিন বাড়ে বালকের সুশিক্ষার সীমা।

নদীর ওপারে

নদীর ওপারে ও কে ? ও কি মৃত্যু ? দাঁড়িয়ে রয়েছে
মুখে ভেজা হিম হাসি
হিরণ্ময়, ওকে বলো, আমি আর পাশা খেলতে ভালোবাসি না
হিরণ্ময়, ওকে বলো, আমি এই সন্ধ্যা একটু গাঢ় হলে
নদীতে আচমন সেরে যজ্ঞে বসবো
হিরণ্ময়, ওকে বলো, আমি এই সন্ধ্যা একটু গাঢ় হলে
আগুনে ঘিয়ের ছিটে দিয়ে তুলবো প্রলয় নিনাদ—

নদীর ওপারে ও কে ? ও কি মৃত্যু ? দাঁড়িয়ে রয়েছে মুখে
ভেজা হিম হাসি ?
হিরণ্ময়, ওকে বলো, শর্বাণীর চিবুকে ঐ যে
ভনভনাচ্ছে নীল ডুমো মাছি
ওরা কার দূত ? আমি আর পাশা খেলতে ভালোবাসি না—
নদীতে আচমন সেরে যজ্ঞে বসবো
ওকে শেষবার বলো, রাত্রির আগেই যেন নীল ডুমো মাছিদের ঝাঁক
উড়ে যায় প্রত্যুষের দিকে !

মাটি

বাগানখানি ফুলদানি, হাওয়ায় সেই ধাতু এবং কুসুমগন্ধ
ফুলদানিটা উল্টে রাখো, সোজা করো, মাটির নিচে ঘুমিয়ে থাক
বাগানখানি

পায়ের নিচে মাটি ছুঁয়েছি, অথবা পা, তোমারই পা
আমায় পায়ের নিচে রাখো, আমার শরীর মাটি-মাটি
আমি গায়ে ময়লা হয়ে মিশে থাকবো, সেও তো মাটি,
মাটি হলেই বাগান, তোমার ফুলদানিটা উল্টে রাখো,
সোজা করো,
আমি তোমার নোখের ধুলো, ভুরুর ঘাম, টিপের উল্টো পিঠের আঠা
কখনো সোজা, কখনো উল্টো, কখনো টিপ, কখনো আঠা !
শ্যাওলা পাতার কারুকার্য দেখে তোমার স্নানের ঘরে জ্বলুক বাতি
বাতি জ্বলুক হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ
ঘরের ঘর, আলোর আলো
ফুলদানিটা উল্টে রাখো, সোজা করো, অন্ধকারও লাগবে ভালো
বাগান ভেঙে লণ্ডভণ্ড, এত অসংখ্য উল্কাবৃষ্টি
ফুলদানিটা উল্টে রাখো, সোজা করো, আবার বৃষ্টি শেষের মাটি
মাটি হলেই বাগান, আমি নোখের ধুলোয় মিশে থাকবো, সেও তো মাটি ।

ছেলেটা

ঐ ছেলেটা পাগল,
ওর কথার কোনো মাথামুণ্ডু, ঠিকানা নেই !
ঐ ছেলেটা সমুদ্রেরও সীমানা চায়,
নদীর কাছে হাজির হয়ে
নদীকে খুব সরল হতে মিনতি করে ;
ভিখারীকেও ত্যাগ শেখাতে চেয়েছিল, ঐ ছেলেটা এমন পাগলা,
মৃত্যু দেখে শৈশবে যায়,
লেবু পাতার গন্ধে নাকি অমরত্ব !

নারীর বুকে শপথ রেখে ভেবেছিল, পাখির মতন পবিত্র প্রেম
হাওয়ায় উড়বে
হাওয়ায় উড়বে চোখের জল, যুদ্ধ যেমন মানুষকে খুব
হাসিয়ে মারে,
ঐ ছেলেটা মানুষ দেখলে ধুলো কাদায় ছবি আঁকবে
ধুলো কাদাই ছিটিয়ে বলবে, ভালোবাসতে চেয়েছিলাম,
পৃথিবীময় গোপন কথা,পৃথিবীময় গোপন কথা
অসুখ, সুখ, জননীমুখ, আকাশবাণী, ভোরের কাগজ
ভরিয়ে শুধু গোপন কথা
আলিঙ্গনে এত গোপন, রাজধানীতে এত গোপন
মানুষভরা গোপনতার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ঐ ছেলেটা
বিষের ভাণ্ড নিয়ে বিমান থেকে শূন্যে লাফিয়ে পড়ে
শূন্য থেকে ঘুরতে ঘুরতে, আকাশ, হিম-বাতাস থেকে
চোখ সরিয়ে
সভ্যতাকে ডেকে বলে—
ঐ ছেলেটা সভ্যতাকে হাসতে হাসতে ডেকে বলে,
আমায় অধঃপতন থেকে রক্ষা করো !

অরূপ রাজ্য

মায়ের গোলাপ গাছে ঠিক একটি গোলাপের মতো ফুল
ফুটে আছে
চোখের মতন চোখে দেখতে পাই ভোরবেলার মতো ভোরবেলা—
দেশলাই কাঠিতে জ্বললো বিশুদ্ধ আগুন, আমি সিগারেট মুখে নিয়ে
ছাদ থেকে নেমে আসি প্রধান মাটিতে
পায়ের তলায় ভিজে ঘাস, ঠিক পায়ের তলায় ভিজে ঘাস ।

দুঃখ নিয়ে ঘুম ভাঙলে দুঃখ জেগে রয়, মানুষ ঘুমোয় ফের
প্রহরীর বিবৃত জানুতে
মানুষ না, আমি । আমার ঘুমন্ত চলা সাম্প্রতিক বাতাসকে মনে করে
শতাব্দীর হাওয়া

মহিলাকে মনে করে স্বপ্ন। মহিলা না, নীরা।
তার দৃষ্টি দুর্গা টুনটুনি হয়ে উড়ে যায়। স্বপ্ন
তার স্তনে মল্লিকা ফুলের ঘ্রাণ। স্বপ্ন
নীরার হাসির তোড়ে চিকন ঝর্ণার শব্দ ওঠে। এও স্বপ্ন—
টুনটুনি, মল্লিকা, ঝর্ণা—ধুল্যবলুণ্ঠিত এই পৃথিবীর
অসীম ফসল হয়ে ফুটে আছে
যেমন ফসল নীরা। আমি। দুঃখে সব স্বপ্ন হয়।

ঈর্ষাও ঘুমের ভঙ্গি। সেই ঈর্ষা নারী বা নীরার সর্ব শরীরের কাছে এসে
শিকলের শব্দ করে
আমার দু' চোখ তীক্ষ্ণ ছুরি হয়, প্রাসাদ শিখর ভাঙে,
ধ্বংস করে রাজনীতি-মঞ্চ, রূপান্তর শুরু হয়
মানুষকে মনে হয় জলজন্তু, যোষিৎপ্রত্যঙ্গ যেন খাদ্য
ভালোবাসা নুন-মরিচ, নিশ্বাসে আগুন
প্রতিটি প্রত্যূষ যেন রাত্রি ভোর, রোদ্দুর তখনই হয় ক্ষুরের ফলার মতো
কুসুম কুমারী, মেঘ দুঃসময়—সব স্বপ্ন!

কখনো দুঃখের ঘুম শুরু হলে আমি জাগি, অবিকল চোখের মতন চোখে
টের পাই সাম্প্রতিক হাওয়া
সিগারেটে টান মেরে আমি খুসখুসে শব্দে হাসি
বেঁচে থাকা এই রকম
আমি এই অরূপ রাজ্যের নাগরিক
গোপাল চারায় ঠিক গোলাপ ফোটার মতো দৃশ্যমান ফসলের নিজস্ব বিভাস
পায়ের তলায় ভিজে ঘাস শুধু পায়ের তলায় ভিজে ঘাস।

ভালোবাসা

শরীর ছেলেমানুষ, তার কত টুকিটাকি লোভ
সব সাঙ্গ হলে পর, ঘুম আসবার আগে
নতুন টাকার মতন সরল নিরাবরণ
দুখানি শরীর
বিছানায় অবিন্যস্ত।

ঠাণ্ডা বুকের কাছে স্বেদময় মুখ
উরুর উপরে আড়াআড়ি ফেলে রাখা
এইমাত্র লোভহীন হাত
চরাচরে তীব্র নির্জনতা, এই তো সময় ভালোবাসার—
ভালোবাসা মানে ঘুম, শরীর বিস্মৃত পাশাপাশি
ঘুমোবার মতো ভালোবাসা।

জয়ী নই, পরাজিত নই

পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল
আমি এই পৃথিবীকে পদতলে রেখেছি
এই আক্ষরিক সত্যের কাছে যুক্তি মূর্ছা যায়।
শিহরিত নির্জনতার মধ্যে বুক টন্‌টন্‌ করে ওঠে
হালকা মেঘের উপচ্ছায়ায় একটি ম্লান দিন
সবুজকে ধূসর হতে ডাকে
আদিগন্ত প্রান্তর ও টুকরো ছড়ানো টিলার উপর দিয়ে
ভেসে যায় অনৈতিহাসিক হাওয়া
অরণ্য আনে না কোনো কস্তুরীর ঘ্রাণ
কিছু নিচে ছুটন্ত মহিলার গোলাপি রুমাল উড়ে গিয়ে পড়ে
ফণিমনসার ঝোপে
নিঃশব্দ পায় চলে যায় খরগোশ আর রোদ্দুর।

এই যে মুহূর্ত, এই যে দাঁড়িয়ে থাকা—এর কোনো অর্থ নেই
ঝর্ণার জলে ভেসে যায় সম্রাটের শিরস্ত্রাণ
কমলার কোয়া থেকে খসে পড়া বীজ ঢুকে পড়ে পাতাল গর্ভে
পোল্‌কা ডট্‌ দুটি প্রজাপতি তাদের আপন আপন কাজে ব্যস্ত
বাবলা গাছের শুকনো সব কাঁটাও দাবি করেছে প্রকৃতির প্রতিনিধিত্ব
সব দৃশ্যই এমন নিরপেক্ষ
আমি জয়ী নই, আমি পরাজিত নই, আমি এমনই একজন মানুষ
পাহাড় চূড়ায় পৃথিবীকে পদতলে রেখে, আমার নাভিমূল
থেকে উঠে আসে বিষণ্ণ, ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস
এই নির্জনতাই আমার ক্ষমাপ্রার্থী অশ্রুমোচনের মুহূর্ত।

পাথর

খণ্ড পাথর, শৌখিনতায় তুই কি চাস সজীব হয়ে উঠে দাঁড়াতে ?
অথবা তোর ভিতরে, অনেক ভিতরে, শিশুর রক্তাভ হাত যেমন কোমল
সেই কেন্দ্রে
অযুত বর্ষ সুপ্ত রয়েছে যে স্তব্ধতা, তাকেই অটুট রাখার নেশা
ঢের বেশি বড় ?

বাড়ি ফেরা

রাত্তির সাড়ে বারোটায় বৃষ্টি, দুপুরে অত্যন্ত শুকনো এবং ঝক্‌ঝকে
ছিল পথ, মেঘ থেকে কাদা ঝরেছে, খুবই দুঃখিত মূর্তি একা
হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, কালো ভিজে চুপচাপ দ্বিধায়
ট্রাম বাস বন্ধ, রিকশা ট্যাক্সি পকেটে নেই, পৃথিবী তল্লাসী হয়ে গেছে
পরশুদিন
পুলিশের হাতে শাস্তি এখন, অথবা নির্জনতাই প্রধান অস্ত্র এই
বুধবার রাত্তিরে ।

অনেক মোটরকারে শব্দ হয় না, ঘুমন্ত হেড লাইট, শুধু পাপপুণ্য
অত্যন্ত সশব্দে জেগে আছে, কতই তো প্রতিষ্ঠান উঠে যায়, ওরা শুধু
ঘাড়হীন অমর গোঁয়ার ।

মশারী ব্যবসায়ীদের মুণ্ডপাত হচ্ছে নর্দমায়, কলকণ্ঠে, ঘুমহীন ঘুম
শিখে নিয়েছে ট্রাক ড্রাইভার । দু'পাশের আলো-জ্বলা অথবা
অন্ধকার ঘরগুলোয়
জন্মনিয়ন্ত্রণ জনপ্রিয় হয়নি । অসার্থক যৌন ক্রিয়ার পর
বারান্দায় বিড়ি খাচ্ছে বুড়ো লোকটা, ঘন ঘন আগুনের চিহ্ন দেখে
বোঝা যায় কি তীব্র ওর দুঃখ ! মৃত্যুর খুব কাছাকাছি—
হয়তো লোকটা
গত দশ বছর ধরে মরে গেছে, আমি বেঁচে আছি আঠাশ বছর ।

সাত মাইল পদশব্দ শুনে কেউ পাগলামির সীমা ছুঁয়ে যায় না
এ রাস্তা অনন্তে যায়নি, ডানদিকে বেঁকে কামিনী পুকুরে
দুই ব্রীজের নিচে জল, পাৎলুন গোটানো হলো, এই ঠাণ্ডা স্পর্শ
একাকী মানুষকে বড় অনুতাপ এনে দেয়—
লাইট পোস্টে উঠে বাল্‌ব চুরি করছে একজন, এই চোট্টা, তোর পকেটে
দেশলাই আছে ?
বহুক্ষণ সিগারেট খাইনি তাই একা লাগছে, দেশলাইটা নিয়ে নিলাম
ফেরত পাবি না
বাল্‌ব চুরি করেই বাপু খুশি থাক না, দু'রকম আলো বা আগুন
এক জীবনে হয় না !···ভাগ্ শালা,···

ওপাশে নীরেনবাবুর বাড়ি, থাক । এ সময় যাওয়া চলে না—ডাকাতের
ছদ্মবেশ ছাড়া
চায়ের ফরমাস করলে নিশ্চয়ই চা খাওয়াতেন, তিনদিন পরে
অন্য প্রসঙ্গে ভর্ৎসনা
একটু দূরে রিটায়ার্ড জজসাহেবের সুরম্য হর্ম্যের
দেয়াল চকচকে সাদা, কি আশ্চর্য, আজো সাদা ! টুকরো কাঠকয়লায়
লিখে যাবো নাকি, আমি এসেছিলাম, যমদূত, ঘুমন্ত দেখে ফিরে গেলাম
কাল ফের আসবো, ইতিমধ্যে মায়াপাশ ছিন্ন করে রাখবেন নিশ্চয়ই !

কুত্তারা পথ ছাড় ! আমি চোর বা জোচ্চোর নই, অথবা ভূত প্রেত
সামান্য মানুষ একা ফিরে যাচ্ছি নিজের বাড়িতে
পথ ভুল হয়নি, ঠাণ্ডা চাবিটা পকেটে, বন্ধ দরজার সামনে থেমে
তিনবার নিজের নাম ধরে ডাকবো, এবং তৎক্ষণাৎ সুইচ টিপে
এলোমেলো অন্ধকার সরিয়ে
আয়নায় নিজের মুখ চিনে নিয়ে বারান্দা পেরিয়ে ঢুকবো ঘরে ।

নীরার হাসি ও অশ্রু

নীরার চোখের জল চোখের অনেক
নিচে
টলমল
নীরার মুখের হাসি মুখের আড়াল থেকে
বুক, বাহু, আঙুলে
ছড়ায়
শাড়ির আঁচলে হাসি, ভিজে চুলে, হেলানো সন্ধ্যায় নীরা
আমাকে বাড়িয়ে দেয়, হাস্যময় হাত
আমার হাতের মধ্যে চৌরাস্তায় খে[illegible]রে নীরার কৌতুক
তার ছদ্মবেশ থেকে ভেসে আসে সামুদ্রিক ঘ্রাণ
সে আমার দিকে চায়, নীরার গোধূলি মাখা ঠোঁট থেকে
ঝরে পড়ে লীলা লোধ্র
আমি তাকে প্রচ্ছন্ন আদর করি, গুপ্ত চোখে বলি:
নীরা, তুমি শান্ত হও
অমন মোহিনী হাস্যে আমার বিভ্রম হয় না, আমি সব জানি
পৃথিবী তোলপাড় করা প্লাবনের শব্দ শুনে টের পাই
তোমার মুখের পাশে উষ্ণ হাওয়া
নীরা, তুমি শান্ত হও !

নীরার সহাস্য বুকে আঁচলের পাখিগুলি
খেলা করে
কোমর ও শ্রোণী থেকে স্রোত উঠে ঘুরে যায় এক পলক
সংসারের সারাৎসার ঝলমলিয়ে সে তার দাঁতের আলো
সায়াহ্নের দিকে তুলে ধরে
নাগকেশরের মতো ওষ্ঠাধরে আঙুল ঠেকিয়ে বলে,
চুপ !
আমি জানি
নীরার চোখের জল চোখের অনেক নিচে টলমল ।

ইচ্ছে

কাচের চুড়ি ভাঙার মতন মাঝে মাঝেই ইচ্ছে করে
দুটো চারটে নিয়ম কানুন ভেঙে ফেলি
পায়ের তলায় আছড়ে ফেলি মাথার মুকুট
যাদের পায়ের তলায় আছি, তাদের মাথায় চড়ে বসি
কাচের চুড়ি ভাঙার মতোই ইচ্ছে করে অবহেলায়
ধর্মতলায় দিন দুপুরে পথের মধ্যে হিসি করি।
ইচ্ছে করে দুপুর রোদে ব্ল্যাক আউটের হুকুম দেবার
ইচ্ছে করে বিবৃতি দিই ভাঁওতা মেরে জনসেবার
ইচ্ছে করে ভাঁওতাবাজ নেতার মুখে চুন কালি দিই।
ইচ্ছে করে অফিস যাবার নাম করে যাই বেলুড় মঠে
ইচ্ছে করে ধর্মাধর্ম নিলাম করি মুর্গীহাটায়
বেলুন কিনি বেলুন ফাটাই, কাচের চুড়ি দেখলে ভাঙি
ইচ্ছে করে লণ্ডভণ্ড করি এবার পৃথিবীটাকে
মনুমেন্টের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলি
আমার কিছু ভাল্লাগে না।

জলের সামনে

ব্রীজের অনেক নিচে জল, আজ সেইখানে ঝুঁকেছে মানুষ
কখনো মানুষ হয়ে উঠি আমি,
কখনো মানুষ নই,
তবুও সন্ধ্যায়
ব্রীজের খিলান ধরে ঝুঁকে থেকে মনে হয় অবিকল মানুষেরই মতো
মানুষের জল দেখা, জলের মানুষ দেখা
পরস্পর মুখ ;
মানুষ দেখেছে জল বহুদিন মানুষ দেখেছে অশ্রুজল
মানুষ দেখেছে মুখ অশ্রুভেজা, ব্রীজের অনেক নিচে
হিম কালো জলে
কালো জল বহু উর্ধ্বে দেখেছে কান্নায় সিক্ত গোপন কঠিন মুখ
মানুষের মতো।

আসমুদ্র দয়া প্রার্থী আবার বৃষ্টির কাছে অতি পলাতক
কখনো নিথর জলে স্পষ্ট মুখ, কখনো তরঙ্গে ভাঙা হীন মানবীয় ।

জলের কিনারে এলে জলের ভিতরে যাওয়া, জলের ভিতরে
মানুষ যখনই যায় একা, তার অলঙ্ঘ্য শরীর
মাতৃগর্ভে বাস সম অগোপন ;
অথবা না-হোক একা,
বন্ধু ও সঙ্গিনী
অদূরেই জলযুদ্ধে ; একবার ডুব দিয়ে মীনচোখে দেখা
নারীর উরুর জোড়, খোলা স্তন কীরকম আশ্চর্য সরল—
জলেরই মতন সেও সজল, নীলের কালো,—সংখ্যাতীত জিভে
জল তার সর্ব অঙ্গ লেহন করেছে, ঠিক যেরকম
মানুষের হাত
জলের ভিতরে গিয়ে নিজের শরীরটাকে চিনে নেয়,
জলের ভিতরে
সহাস্যে পেচ্ছাপ করে লজ্জাহীন, বাতাসের মতো জল, পরাগ ছড়ায় ।

কখনো মানুষ সেজে বীয়ার-বাস্কেট নিয়ে বসেছি নারীর
কাছাকাছি সিন্ধুতটে সন্ধেবেলা, জ্যোৎস্না ভাঙে লাবণ্য হাওয়ায়
আকাশে অসংখ্য ছিদ্র, ঢেউয়ের চূড়ায় জ্বলে ফসফরাস
দেখেছিল মুখ
অথবা ঢেউয়ের দল মানুষের মুখ চেয়ে সার বেঁধে আসে—
এমন উচ্ছল জল, মানুষের মুখ দেখা যেন তার আশৈশব সাধ ।
মানুষের ছদ্মবেশে আছি, তাই চোখে আসে অশ্রু
মুখ ঢাকি ।

জীবন ও জীবনের মর্ম

জীবন ও জীবনের মর্ম মুখোমুখি দাঁড়ালে
আমি ভুল বুঝতে পারি
আমার ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয় ।
বুদ্ধের বুকের হাঁস ডানা ঝাপটায়, আমি মাংসলোভী

বিশাল বৃক্ষের ছায়া জলে ভাসে—আমি তমস্বান হয়ে ছুটে গেছি
আমি ভুল বুঝতে পারি—
বিস্মৃতিকে কতবার মনে ভেবেছি বিষণ্ণতা
ট্রেন লাইনের পাড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে বনবাসী হরিণ
কয়লা খনির ভিতরের অপরাহ্নের মতন উদাসীনতা
আমাকে নদীর পাশেও স্রোতহীন রেখেছে
চঞ্চল হাওয়ায় উড়ে গেছে কৃতঘ্নতার হাসি
আমি ভুল বুঝতে পারি
আমার ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয়।

জীবন ও জীবনের মর্ম মুখোমুখি দাঁড়ালে, সেই মুহূর্তের
বিশাল জ্যোৎস্না যাবতীয় পার্থিব ম্যাজিকের
তাঁবুর মতন ঝড়ে উল্টে যায়
মেঘ জলস্তম্ভ হতে গিয়েও ফেটে ইলশে গুঁড়ি হয়ে ছড়ায়
সমগ্র কৈশোর কালের নদীর পার থেকে ছিটকে পড়ে যায়
গুন টানার মানুষ
বারো বছরের জন্মদিনে আমার কপালে মায়ের আঙুল ছোঁয়া
লাল টিপ
মুছে গিয়েছিল কান্নায়, মুছে যায়নি।
এখন আমার ভারতবর্ষের মতন ললাটে সেই কাশ্মীর, অর্থাৎ দ্বিধা
আমি ভুল বুঝতে পারি
আমার ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে হয়।

শব্দ

বালি ঝুমকো, হলুদ নাভি, শূন্য হাস্য
রূপালি ফল, নীল মিছিল, চিড়িক চক্ষু…

চিড়িক না সুখ ? চিড়িক শব্দে ঢ্যাঁড়া বসালুম
রূপালি ফল, না রূপালি উরুত ? দ্রিদিম জ্যোৎস্না

অমনি আমার বুকের মধ্যে ভয়ের ঘণ্টা, দ্রিদিম জ্যোৎস্না
লিখে ভয় হয়
দ্রিদিম না স্মৃতি ? জ্যোৎস্না না জল ? অথবা সাগর ?
দ্রিদিম সাগর ? ঠিক ঠিক ঠিক ! নিরুপদ্রব । শূন্য হাস্য
কুন্‌কি কাফেলা, হাতেম তামস, শালু পালু লুস্‌
তামস ? আবার ভুলের শব্দ, ভয়ের শব্দ, (কাটতে কলম
থর থর করে)
তামসের চেয়ে প্রগাঢ় আমার গরিমার কাছে শূন্য হাস্য
অর্থের এত বিভ্রমে বহু অশ্রুবিন্দু, কুলুকুলু জল…

কুলুকুলু বড় মধুর শব্দ, মধুর তোমার শব্দে শব্দ
মন্দিরে বাজে দ্রিদিম ঘণ্টা, জ্যোৎস্না উধাও, তামস উধাও ।

নিসর্গ

আমলকী গাছে ঠেস দিয়ে আছে শীত
উড়ে গেল তিনটে প্রজাপতি
একটি কিশোরী তার করমচা রঙের হাত মেলে দিলে বিকেলের দিকে
সূর্য খুশি হয়ে উঠলেন, তাঁর পুনরায় যুবা হতে সাধ হলো ।

দ্বারভাঙা জেলার রমণী

হাওড়া ব্রীজের রেলিং ধরে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল
দ্বারভাঙা জেলা থেকে আসা এক টাটকা রমণী
ব্রীজের অনেক নিচে জল, সেখানে কোনো ছায়া পড়ে না
কিন্তু বিশাল এক ভগবতী কুয়াশা কলকাতার উপদ্রুত অঞ্চল থেকে
গড়িয়ে এসে

সভ্যতার ভূমধ্য অলিন্দে এসে দাঁড়ালো
সমস্ত আকাশ থেকে খসে পড়লো ইতিহাসের পাপমোচনকারী বিষণ্ণতা
ক্রমে সব দৃশ্য, পথ ও মানুষ মুছে যায়, কেন্দ্রবিন্দুতে শুধু রইলো সেই
লাল ফুল-ছাপা শাড়ি জড়ানো মূর্তি
রেখা ও আয়তনের শুভবিবাহমূলক একটি উদাসীন ছবি—
অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়ালো সে, সেই প্রধানা মচ্‌কা মাগি, গোঠের মল ঝামরে
মোষ তাড়ানোর ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠলো, ইঃ রে-রে-রে-রে—
মুঠো পিছলোনো স্তনের সূর্যমুখী লঙ্কার মতো বোঁটায় ধাক্কা মারলো কুয়াশা
পাছার বিপুল দোলানিতে কেঁপে উঠলো নাদব্রহ্ম
অ্যাক্রোপলিসের থামের মতো উরুতের মাঝখানে
ভাঁটফুলের গন্ধমাখা যোনির কাছে থেমে রইলো কাতর হাওয়া
সুডৌল হাত তুলে সে আবার চেঁচিয়ে উঠলো, ইঃ রে-রে-রে—
তখন সর্বনাশের কাছে সৃষ্টি হাঁটু গেড়ে বসে আছে
তখন বিষণ্ণতার কাছে অবিশ্বাস তার আত্মার মুক্তিমূল্য পেয়ে গেছে....
সব ধ্বংসের পর
শুধু দ্বারভাঙা জেলার সেই রমণীই সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো
কেননা ঐ মুহূর্তে সে মোষ তাড়ানোর স্বপ্ন দেখছিল।

উত্তরাধিকার

নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম ভুবন ডাঙার মেঘলা আকাশ
তোমাকে দিলাম বোতামবিহীন ছেঁড়া শার্ট আর
ফুসফুস ভরা হাসি
দুপুর রৌদ্রে পায়ে পায়ে ঘোরা, রাত্রির মাঠে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা
এসব এখন তোমারই, তোমার হাত ভরে নাও আমার অবেলা
আমার দুঃখবিহীন দুঃখ, ক্রোধ, শিহরন
নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম আমার যা কিছু ছিল আভরণ
জ্বলন্ত বুকে কফির চুমুক, সিগারেট চুরি, জানালার পাশে
বালিকার প্রতি বারবার ভুল

পরুষ বাক্য, কবিতার কাছে হাঁটু মুড়ে বসা, ছুরির ঝলস্
গূঢ় অভিমানে মানুষ কিংবা মানুষের মতো আর যা কিছুর
বুক চিরে দেখা
আত্মহনন, শহরের পিঠ তোলপাড় করা অহঙ্কারের দ্রুত পদপাত
একখানা নদী, দু'তিনটে দেশ, কয়েকটি নারী—
এ সবই আমার পুরোনো পোশাক, বড় প্রিয় ছিল, এখন শরীরে
আঁট হয়ে বসে, মানায় না আর
তোমাকে দিলাম, নবীন কিশোর, ইচ্ছে হয়তো অঙ্গে জড়াও
অথবা ঘৃণায় দূরে ফেলে দাও, যা খুশি তোমার
তোমাকে আমার তোমার বয়সী সব কিছু দিতে বড় সাধ হয়।

নীরার পাশে তিনটি ছায়া

নীরা এবং নীরার পাশে তিনটি ছায়া
আমি ধনুকে তীর জুড়েছি, ছায়া তবুও এত বেহায়া
পাশ ছাড়ে না
এবার ছিলা সমুদ্যত, হানবো তীর ঝড়ের মতো—
নীরা দু'হাত তুলে বললো, 'মা নিষাদ !
ওরা আমার বিষম চেনা !'
ঘূর্ণি ধুলোর সঙ্গে ওড়ে আমার বুক চাপা বিষাদ—
লঘু প্রকোপে হাসলো নীরা, সঙ্গে ছায়া-অভিমানীরা
ফেরানো তীর আমার দৃষ্টি ছুঁয়ে গেল
নীরা জানে না !

বন্দী, জেগে আছো ?

চরাচরে অন্ধকার, নিঃশব্দ নিশীথে ডাক ওঠে :
বন্দী, জেগে আছো ?
বন্দী কি ঘুমোয় ? না কি জাগরণই তার বন্দিশালা

মাথার ভিতর জ্বালা যাবজ্জীবন পল অনুপল
পদক্ষেপে শিকলের শব্দ—তার নিঃসঙ্গতা, অন্ধকুঠুরির
ভিতরে স্বপ্নের মতো রোদ এসে
জানায় অস্তিত্ব, এ কি নিষ্ঠুরতা—যে রয়েছে চিরকাল
জেগে, তাকে প্রশ্ন
বন্দী, জেগে আছো !

যে রয়েছে চিরকাল জেগে তার হিংস্র কঠিন মুখ
গরাদের ফাঁকে চেয়ে থাকে, তবু কপালের নিচে
প্রশ্নের জ্বলন্ত দুই শর ;
সমূহ প্রকৃতি থেকে যে-রয়েছে দূরে তার আঁধারে ঝলসানো চোখ
প্রেমের নিভৃত শিল্পে, পণ্যে, পিপাসায়, লোভে
অত্যন্ত ঘুমন্ত সব মানুষের খেলাঘরে
প্রতিপ্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় :
স্বাধীন ? স্বাধীন ?

সিন্ধ্রিতে এক উৎসবে

নর্তকী, তুমি তাকাও আমার দিকে ক্ষণকাল
আজ এ সভায় আমিই প্রধান অতিথি, আমার
চোখে চোখ রাখো একবার ।
সবুজ আলোর পরে ঝলসালো মসৃণ মঅভ
দুই সখী এসে দাঁড়ালো দু'পাশে লাল ও হলুদ
ওরা তো স্বপ্ন
রেশমী রুমাল, পীত আঙরাখা, জরির ঝালর—এসব স্বপ্ন
প্রহরীর মতো ঘাগরা কাঁচুলি সাজানো মঞ্চ—এসব স্বপ্ন
বাহু ঢাকা ফুল, ফুলের দুকূল রুপোর নূপুর—এবারও স্বপ্ন ?
শুধু ঘোরে রং, ঝম-ঝম-ঝুম রঙের শব্দ, নর্তকী, তুমি
তাকাও আমার দিকে ক্ষণকাল, আজ এ সভায়
আমিই প্রধান অতিথি, আমার
চোখে চোখ রাখো একবার ।

শত জনতার ঠিক মাঝখানে আমার আসন, নর্তকী, তুমি
যে দিকেও যাও, প্রোসেনিয়ামের যে-কোনো সীমায়—
আমার দু' চোখ তোমার অঙ্গে—লীলাময় হাত, মৃদু অঙ্গুলি—
লঘু পদযুগ, ক্ষীণ কটিতটে দারুণ দোলানি দেখে উরুদেশ
হেম দুই বুক জেগে ওঠে আজ স্তননে বর্ণে, নাচ কি শিল্প ?
ঝম-ঝম-ঝুম রঙের শব্দ, নর্তকী আজ তুমিই শিল্প ?
এক মুহূর্ত ফেরাও চক্ষু আমার দু' চোখে, ছবির নারীরা
ঠিক যে রকম চিরকাল শুধু আমাকেই দেখে, এক মুহূর্ত
তুমি দেখা দাও, আজ এ সভায় তুমিই শিল্প ।

উইংসে এসেছে রাজার কুমার, সেও তো রমণী,
ছোট শহরের নৃত্যসভায় সবাই রমণী, ওকে ভয় নেই
সাত সখী এসে তিনজন গেল, নর্তকী শুধু তুমিই শিল্প
দুই ভুরু হেনে একবার চাও, শরীর দেখেছি, তোমাকে দেখিনি
নাচ কি শিল্প ? ঢের শিল্পের দেখা হলো আজ
চোখোচোখি ছাড়া কোনো দেখা নেই
এক মুহূর্ত তাকাও···আমার সহিষ্ণুতার শেষ হয়ে এলো
এবার চেয়ারে দাঁড়িয়ে উঠবো, সিটি দিয়ে আমি ডিগবাজি খাবো
মাটিতে গড়িয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উল্টে পাল্টে লোভী জনতার
সারি সারি পায়ে চিমটি কাটবো
নাচ কি শিল্প ? ঢের শিল্পের দেখা হলো আজ মঞ্চ শিল্প
এবার সেসব ভাঙা শুরু হোক, শরীর দেখেছি তোমাকে দেখিনি
হাওয়া ভাঙে মেঘ, মেঘ কি শরীর ? শরীর আমার সহ্য হয় না
শিল্প আমার সহ্য হয় না, স্বপ্নের মতো ঝমঝুমে রং,
এক মুহূর্ত
দুই চোখে শুধু আমাকেই দেখো, আমি আজ বড় অস্থির আছি
আমি আজ এক নক্ষত্রকে হৃদয় সঁপেছি
নর্তকী তুমি সুন্দর, আমি তোমাকে চাই না, তোমার চোখের
নক্ষত্রকে খুঁজে নিতে দাও ।

আত্মা

প্রতিটি ট্রেনের সঙ্গে আমার চতুর্থভাগ আত্মা ছুটে যায়
প্রতিটি আত্মার সঙ্গে আমার নিজস্ব ট্রেন অসময় নিয়ে
খেলা করে।
আলোর দোকানে আমি হাজার হাজার বাতি সাজিয়ে রেখেছি
নষ্ট-আলো-সঞ্জীবনী শিক্ষা করে আমার চঞ্চল
অহমিকা।
জাদুঘরে অসংখ্য ঘড়িতে আমি অসংখ্য সময় লিখে রাখি
নারীর উরুর কাছে আমার পিপড়ে দূত ঘোরে ফেরে
আমার ইঙ্গিতে তারা চুম্বনের আগে
কেঁপে ওঠে।
এইরূপ কর্মব্যস্ত জীবনের ভিতরে-বাইরে ডুবে থেকে
বিকেলের অমসৃণ বাতাসে হঠাৎ আমি দেখি
আমার আত্মার একটা কুচো টুকরো
আজও কোনো কাজ পায়নি।

ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি

প্রিয় ইন্দিরা, তুমি বিমানের জানলায় বসে,
গুজরাটের বন্যা দেখতে যেও না
এ বড় ভয়ঙ্কর খেলা
ক্রুদ্ধ জলের প্রবল তোলপাড়ে উপড়ে গেছে রেললাইন
চৌচির হয়েছে ব্রীজ, মৃত পশুর পেটের কাছে ছন্নছাড়া বালক
তরঙ্গে ভেসে যায় বৃদ্ধের চশমা, বৃক্ষের শিখরে মানুষের
আপৎকালীন বন্ধুত্ব
এই সব টুকরো দৃশ্য—এক ধরনের সত্য, আংশিক, কিন্তু বড় তীব্র
বিপর্যয়ের সময় এই সব আংশিক সত্যই প্রধান হয়ে ওঠে
ইন্দিরা, লক্ষ্মীমেয়ে, তোমার একথা ভোলা উচিত নয়
মেঘের প্রাসাদে বসে তোমার করুণ কণ্ঠস্বরেও
কোনো সর্বজনীন দুঃখ ধ্বনিত হবে না
তোমার শুকনো ঠোঁট, কতদিন সেখানে চুম্বনের দাগ পড়েনি,
চোখের নিচে গভীর কালো ক্লান্তি, ব্যর্থ প্রেমিকের মতো চিবুকের রেখা

কিন্তু তুমি নিজেই বেছে নিয়েছো এই পথ
তোমার আর ফেরার পথ নেই
প্রিয়দর্শিনী, তুমি এখন বিমানের জানলায় বসে
উড়ে এসো না জলপাইগুড়ি, আসামের আকাশে
এ বড় ভয়ঙ্কর খেলা
আমি তোমাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি—
উঁচু থেকে তুমি দেখতে পাও মাইল মাইল শূন্যতা
প্রকৃতির নিয়ম ও নিয়মহীনতার সর্বনাশা মহিমা
নতুন জলের প্রবাহ, তেজী স্রোত—যেন মেঘলা আকাশ উল্টো
হয়ে শুয়ে আছে পৃথিবীতে
মাঝে মাঝে দ্বীপের মতন বাড়ি, কাণ্ডহীন গাছের পল্লবিত মাথা
ইন্দিরা, তখন সেই বন্যার দৃশ্য দেখেও একদিন তোমার মুখ ফস্কে
বেরিয়ে যেতে পারে, বাঃ, কি সুন্দর !

শরীর অশরীরী

কেউ শরীরবাদী বলে আমায় ভর্ৎসনা করলে, তখন ইচ্ছে হয়
অভিমানে অশরীরী হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যাই !
আবার কেউ 'অশরীরী' শব্দটি উচ্চারণ করলে আমি কান্নার মতন
ভয় পেয়ে তীব্র কণ্ঠে বলি, তুমি কোথায় ? লুকিও না,
এসো, তোমাকে একটু ছুঁই !
এই রকমই জীবন ও মানুষের হাঁটা চলার ভাষা—
সুতরাং 'ভাষা' শব্দটি কারুর মুখে শুনলে মনে হয় পৃথিবীর
যাবতীয় ক্ষত্রিয় গদ্যের
বিনাশ করতে যেতে হবে ।

কোথাও 'ব্রাহ্মণ' শুনলে মনে পড়ে ভাঙা মৃৎশকটের জন্য কান্না
এসবই তো আকাশের নিচে, তোমার মনে পড়ে না ?
দেখো, আবার 'তুমি' বলছি, অর্থাৎ শরীর
এখন আমি শরীরবাদী না অশরীরী ?
অশরীরী, অশরীরী, তাই তো শরীর ছুঁতে ইচ্ছে হয়,

এসো শরীর, তোমায় আদর করি
এসো শরীর, তোমায় ছাপার অক্ষরের মতো স্পষ্টভাবে চুম্বন করি
তোমায় সমাজ সংস্কারের মতন আদর্শভাবে আলিঙ্গন করি
এসো, ভয় নেই, লজ্জা করো না, কেউ দেখবে না—দেখতে জানে না
সত্যবতী, তোমার দ্বীপের চারপাশ আমি ঢেকে দেবো কুয়াশায়
তোমার মীনচিহ্নিত দেহে ছড়িয়ে দেবো যোজনব্যাপী গন্ধ—
কবিও তো সন্ন্যাসীই, সন্ন্যাসীরই মতন সে হঠাৎ কখনো
যোগভ্রষ্ট হয়ে কামমোহিত হয়—
সেই বিস্মৃত মুহূর্তের লিপ্সা বড় তীব্র, তাকে অপমান করো না
সে যখন জ্যোৎস্নাকে ভোগ করতে চায়, তখন উন্মত্তের মতন
লণ্ডভণ্ড করে রাত্রি, সে যখন পৃথিবীকে দেখে, তখন
দশ আঙুলের মতন ভয়াবহ চোখে এই শৌখিন ধরিত্রীর সঙ্গে
সঙ্গম করে—যার ডাকনাম ভালোবাসা,—আঃ কেন আবার
একথা, আমি অশরীরী এখন, আমি এখন গীর্জার অন্দরের মতন
পবিত্র বিশেষণ, সমস্ত প্রতীক অগ্রাহ্য করা শ্রেষ্ঠ প্রতীক, এখন
'সমাজ' শব্দটি শুনলে পাট ভেজানো জলের গন্ধ মনে পড়ে, কেউ
'ক্ষিদে পেয়েছে' বললে, মনে হয়, আহা লোকটি বড় নিষ্ঠাবান
অর্থাৎ ধ্যান, এখন আমার ধ্যান, আর বিস্মরণ নয়, ধ্যান—
কিন্তু যাই বলো, চারপাশে অপ্সরীর নৃত্য না থাকলে চোখ বুজে
ধ্যানও জমে না !

আবার ? আস্তে, না, শরীর নয়, আমি এখন আকাশের নিচে
চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, সমস্ত অন্তরীক্ষ জুড়ে তালগাছের মতন
দীর্ঘ কোনো কণ্ঠস্বর আমায় বলেছে, দাঁড়াও !
আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি, আমি এরকমও জানি,
চোখে জল এলে বুঝতে পারি, এও তো শরীর, পায়ের ধুলোও শরীরবাদী
আহা, শরীরের দোষ নেই, সে অশরীরীর সামনে হাত জোড়
করে দাঁড়িয়ে আছে—।

আজ সকালবেলা

মাঠের সামনের ঝুল বারান্দায় শীতের সকালে রোদ এলে
বেতের চেয়ারে আমি কবির মতন বসে থাকি
এখন রোদ্দুর দেখে অনায়াসে বলা যায়, 'হেমশস্য'
নারী নয়, বৃক্ষও প্রকৃতি
পাতার ভিতরে হাওয়া 'আন্দোলন' করে যায়
প্রসারিত সবুজের ভিতরে শিশির খোঁজে চোখ
ঠিক কবির মতন চোখ ঘোরে ফেরে আকাশে প্রান্তরে
মাঝে মাঝে বেতের চেয়ারে একা কবি হতে কে না চায় ?

মন, তুমি জেনে রেখো, এসবই দেখার যোগ্য সুস্থির শাশ্বত
যেমন ভ্রমণে যায় মানুষ ও মানুষের পোশাকের খয়েরি সুটকেস
অর্জিত ছুটির সুখে কলকাতা-আসানসোল তুচ্ছ হয়ে যায়
ইস্পাত শিল্পের কর্মী মন্দিরের শিল্প দেখে কেঁপে ওঠে সর্বাঙ্গে সরবে !
সৌন্দর্য বিখ্যাত জ্ঞান, মাঝে মাঝে চোখ চেয়ে দেখে রাখা প্রথা
হৃদয় কি শূন্য ? তবে পাহাড় শিখর থেকে দূরের শূন্যতা দেখে
মানুষের এতখানি খুশি ?
ঝর্ণার রূপের ছলা ক্যামেরায় এসে স্থির হয়
সমূল বৃক্ষের থেকে পরগাছার ফুল বেশী দামী—
এরকমই মিলে মিশে জীবনের সরল ও স্বাভাবিক সার্থক ব্যর্থতা, জেনে রেখো।

মন, তুমি তিরিশ পেরুলে, তাই যুক্তিবাদী ?
তুলনা ও প্রতিতুলনার মতো জুয়াচুরি শিখে নিয়ে বাণী উচ্চারণে বুঝি লোভ ?
এখন গভীর রাত্রে বাড়ি ফেরা চুপি চুপি গাঢ় অপরাধ ?
হাস্যকর মানুষের সামনে এসে এখন বিনীত হাস্য দিতে হবে ?
প্রকৃতিকে 'ফ্রকৃতি' না বলে ডেকে, নারীর বুকের প্রতি
জ্বলন্ত নিশ্বাস ছোঁড়া বন্ধ !
ওরে মন্দমতি, আজো শোন্
সধর্মে নিদ্রাই শ্রেয়, স্নেহসিক্ত পরধর্ম পুতনা রাক্ষসী।

ধান

হলুদ শাড়ি আর পরো না, এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি
ঘরে তোমার হল্‌দে পর্দা ! মিনতি করি খুলে রাখো
এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি ।
এপাড়া জুড়ে শানাই বাজে, ওপাড়া জুড়ে শামিয়ানা
ব্যস্ত মানুষ, সুখী মানুষ, শঙ্খ আর উলুধ্বনি, লাল চেলি
সবই থাকুক, বন্ধ রাখো গায়ে-হলুদ
এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি ।

আয় কাক আয় কাকের পাল আয় রে আয়—
গোয়াল ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে ছেলেটা ডাকে পুরোনো সুরে
ও খোকা, তুই কাক ডাকিসনে, ও ডাকা যে অলুক্ষুনে
এ বছর আর নবান্ন নেই, বান এসেছে
এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি ।

দুপুরবেলা হলদে হাওয়া উদাস হয়ে ঘুরে বেড়ায়
কোথাও কেউ কথা বললে রক্ত আলোয় তুফান ওঠে
পায়ের কাছে লুটিয়ে থাকে হিম নিশীথের নীল জ্যোৎস্না
গাছের পাতা হলুদ হয় তবুও ভয়ে
মায়ের মুখ শিশুর মতো, জলে যেমন মেঘের ছায়া, থমথমে ভয়
ও মা, তুমি ভয় পেও না
শিশুর অন্নপ্রাশন হবে অনাদিকালের গোধূলি বেলায় ।

কৃতঘ্ন শব্দের রাশি

চিঠি না-লেখার মতো দুঃখ আজ শিরশির করে ওঠে
আঙুলে বা চোখের পাতায়
নিউ মার্কেটের পাশে হঠাৎ দুপুরবেলা নীরার পদবী ভুলে যাই—
এবং নীরার মুখ ।

জলে-ডোবা মানুষের বাতাসের জন্য হাঁকুপাকু—সেই অস্থিরতা
নীরার মুখের ছবি—সোনালি চশমার ফ্রেম, নাকি কালো !
স্তম্ভের ঘড়িকে আমি প্রশ্ন করি, সোনালি ? না কালো ?
ধনুক কপালে বাঁকা টিপ, ঢাল চুলে বাতাসের খুনসুটি
তবুও নীরার মুখ অস্পষ্ট কুয়াশাময়
জালে ঘেরা বকুল গাছকে আমি ডেকে বলি
বলো, বলো, তুমিও তো দেখেছিলে ?
নীরার চশমার ফ্রেম সোনালি না কালো ?

•

সিঁড়ির ধাপের মতো বিস্মরণ বহুদূর নেমে যায়
ভুলে যাই নীরার নাভির গন্ধ
চোখের কৌতুকময় বিষণ্ণতা
নীরার চিবুকে কোনো তিল ছিল ?
এলাচের গন্ধমাখা হাসি যেন বাতাসের মধ্যে উপহাস
বিস্মৃতির মধ্যে শুনি অধঃপতনের গাঢ় শব্দ
নিউ মার্কেটের পাশে হঠাৎ দুপুরবেলা
সব কিছু ভুলতে ভুলতে আমার অস্তিত্ব
শূন্য কিন্তু মগ্ন হয়ে ওঠে—
ছিঁড়ে যায় নীল পর্দা, ভেঙে পড়ে অসংখ্য দেয়াল
হিজল বনের ছায়া চকিতে মেঘের পাশে খেলা করে
তীব্রভাবে বেজে ওঠে কৃতঘ্ন শব্দের রাশি, সেই মুহূর্তেই
চোয়াল কঠিন করে হাত তুলি, বজ্র মুঠি, ঝলসে ওঠে
রক্তমাখা ছুরি ।

সারা জীবন বেড়াতে এলে

ব্রীজের নিচে মানুষ, তুমি
সারাজীবন বেড়াতে এলে ?
ফাঁকা জীবন, হলুদ ঘর, নোংরা জলে মেয়েলি তুলো
শরীরময় টুকরো ছিট্, চুলের গন্ধ ঝাউবনের

অসমীচীন মানুষ, তুমি সারাজীবন বেড়াতে এলে ?
ঘৃণায় কাঁপে শরীর আমার, ভ্রমণ এত মাধুরীহীন ?
তিরতিরিয়ে রক্ত ছোটে—ভ্রমণ শুনলে জলপ্রপাত
ভ্রমণ শুনলে চুরি-সোহাগ, ভ্রমণ শুনলে রৌদ্রছায়া
নগর ভরা নারীর হাস্য, হীরের গয়না, কালো রুমাল
সহ্য হয় না এমন জ্যোৎস্না, সহ্য হয় না ট্রেনের ঘণ্টা
ব্রীজের নিচে মানুষ তুমি বাদামী মুখ,
সারাজীবন বেড়াতে এলে ?

আরও নিচে

সিংহাসন থেকে একটু নিচে নেমে, পাথরের
সিঁড়ির উপর বসে থাকি
একা, চিবুক নির্ভরশীল
চোখ লোকচক্ষু থেকে দূরে।
'সম্রাটের চেয়ে কিছু কম সম্রাটত্ব' থেকে ছুটি নিয়ে আজ
হলুদ দিনাবসানে পরিকীর্ণ শব্দটির মোহে
মাটির মানুষ হতে সাধ হয়। এক একদিন এরকম হয়।
আমার চোখের নিচে কালো দাগ
ব্যাণ্ডেজের মধ্যে একটা পোকা ঢুকলে যেরকম জাদুদণ্ডসম কোনো
মহিলার হাত
নিয়তি বদল করে, আলো-ছায়া-আলো ঘোরে শরীর নিভৃত সানুদেশে
দপ করে জ্বলে ওঠে হৃদয়ের পুরোনো বারুদ
তেমনিই দিনাবসান
তেমনিই মোহের থেকে মুক্ত নিচু চাঁদ—
সিংহাসন থেকে নেমে, হাত ভরা পশমের মতো এত রোমশ স্তব্ধতা।

পাথরের মসৃণ বেদীর নিচে রুক্ষ মাটি, একই দূরে পায়ে চলা পথ।
সম্রাটের শেষ ভৃত্য চিরতরে যেখানে শয়ান
তার চেয়ে দূরে, সীমার যেখানে শেষ
যেখানে উদ্ভিদ, জল মেতে আছে পাংশু ঈর্ষায়

যেখানে বিশীর্ণ হাত কাদার ভেতরে খোঁজে বালির ফসল
তার চেয়ে দূরে
যেখানে শামুক তার খাদ্য পায়, নিজেও সে খাদ্য হয়
ভেসে যায় সাপের খোলস, সেখানেও
আমার অতৃপ্তি বড় দীর্ঘশ্বাস বিষদৃষ্টি নিয়ে জেগে রয়—
মুকুট খোলার পর আমি আরও বহুদূরে নেমে যেতে চাই।

তুমি

তুমি অপরূপ, তুমি সৃষ্টির যথেষ্ট পূজা পেয়েছো জীবনে ?
তুমি শুভ্র, বন্দনীয়, নারীর ভিতরে নারী, আপাতত একমাত্র তুমি,
বাথরুম থেকে এলে সিক্ত পায়ে, চরণকমলযুগ চুম্বনে মোছার যোগ্য ছিল—
তিন মাইল দূরে আমি ওষ্ঠ খুলে আছি, পূজার ফুলের মতো ওষ্ঠাধর
আমি পুরোহিত, দেখো, আমার চামর বাহু, স্বতোৎসার শ্লোক
হৃদয় অহিন্দু, মুখ সোমেটিক, প্রেমে ভিন্ন কোপটিক খ্রীস্টান
আশৈশব থেকে আমি পুরোহিত হয়ে উঠে তোমার রূপের কাছে ঋণী
তোমার রূপের কাছে অগ্নি, হেম, শস্য, হবি—পদাঘাতে পূজার আসন
ছড়িয়ে লুকাও তুমি বারবার, তখন তন্ত্রের ক্ষোভে অসহিষ্ণু আমি
সবলে তোমার বুকে বসি প্রেত সাধনায়, জীবন জাগাতে চেয়ে জীবনের ক্ষয়
ওষ্ঠের আর্দ্রতা থেকে রক্ত ঝরে, নারীর বদলে আমি স্ত্রীলোকের কাছে
মাথা খুঁড়ি, পুরোহিত থেকে আমি পুরুষের মতো চোখে ক্রূরতা ছড়িয়ে
আঙুলে আকাশ ছুঁই, তোমার নিশ্বাস থেকে নক্ষত্রের জন্ম হলে
আমি তাকে কশ্যপের পাশে রেখে আসি।

এরকম পূজা হয়, দেখো ত্রিশিরা ছায়ায় কাঁপে ইহকাল
এমন ছায়ার মধ্যে রূপ তুমি, রূপের কঠিন ঋণ বিশাল মেখলা
আমি ঋণী, আমি ক্রীতদাস নই, আরাধনা মন্ত্রে আমি
তোমাকে সম্পূর্ণ করে যাবো।

কঙ্কাল ও সাদা বাড়ি

সাদা বাড়িটার সামনে আলো-ছায়া-আলো, একটি কঙ্কাল দাঁড়িয়ে
এখন দুপুর রাত অলীক রাত্রির মতো, অরুণা রয়েছে খুব ঘুমে—
যে রকম ঘুম শুধু কুমারীর, যে ঘুম স্পষ্টত খুব নীল ;
যে-স্তনে লাগেনি দাঁত তার খুব মৃদু ওঠাপড়া
তলপেটে একটুও নেই ফাটা দাগ, এ শরীর আজও ঋণী নয়
এই সেই অরুণা ও রুনি নাম্নী পরা ও অপরা
সুখ ও অসুখ নিয়ে ওষ্ঠাধর, এখন রয়েছে খুব ঘুমে
যে রকম ঘুম শুধু কুমারীর, যে-ঘুম স্পষ্টত খুব নীল ।

সন্ন্যাসীর সাহসের মতো শান্ত অন্ধকার, কে তুমি কঙ্কাল—
প্রহরীর মতো একা, কেন বাধা দিতে চাও ? কী তোমার ভাষা ?
ছাড়ো পথ, আমি ঐ সাদা বাড়িটার মধ্যে যাবো ।
করমচা ফুলের ঘ্রাণ আলপিনের মতো এসে গায়ে লাগে
থামের আড়াল থেকে ছুটে এলো হাওয়া, বহু ঘুমের নিশ্বাস
ভরা হাওয়া
আমি অরুণার ঘুমে এক ঘুম ঘুমোতে চাই আজ মধ্য রাতে
অরুণার শাড়ি ও সায়ার ঘুম, বুকে ঘুম, কুমারী জন্মের
পবিত্র নরম ঘুম, আমি ব্রাহ্মণের মতো তার প্রার্থী ।

নিরস্ত্র কঙ্কাল, তুমি কার দূত ? তোমার হৃদয় নেই, তুমি
প্রতীক্ষার ভঙ্গি নিয়ে কেন প্রতিরোধ করে আছো ?
অরুণা ঘুমন্ত, এই সাদা বাড়িটার দ্বারে তুমি কেন জেগে ?
তুমি ভ্রমে বদ্ধ, তুমি ওপাশের লাল রাঙা প্রাসাদের কাছে যাও
ঐখানে পাশা খেলা হয়, হু-র-রে চিৎকারে ওঠে হৃদয়ে হৃদয়ে শকুনির ঝটাপটি
তুমি যাও
ছাড়ো পথ, আমি এই নিদ্রিত বাড়ির মধ্যে যাবো ।

নিরাভরণ

পায়ে তোমার কাঁটা ফুটেছে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ?
তুমি তাহলে পিছনে থাকো
বন্ধু ছিলে উদাসীনতা, তোমারও সাধ গৃহী হতে ?
ডাইনে যাও
পোশাক, তুমি ছিন্ন হবে ? শান্তি, তোমার তৃষ্ণা পাবে ?
জিরোও এই গাছের নিচে
হলুদ বই, সাদা বোতাম, কৃতজ্ঞতা, চাবির দুঃখ, বিদায় দাও
আমার আর সময় নেই, আমি এখন
পেরিয়ে মজা দিঘির কোণ, প্রণাম করে অরণ্যের সিংহাসন, সামনে ঘুরে
দিগন্তের চেয়েও একটু দূরে যাবো ।

প্রবাসের শেষে

যমুনা, আমার হাত ধরো । স্বর্গে যাবো ।
এসো, মুখে রাখো মুখ, চোখে চোখ, শরীরে শরীর
নবীনা পাতার মতো শুদ্ধরূপ, এসো
স্বর্গ খুব দূরে নয়, উত্তর সমুদ্র থেকে যেরকম বসন্ত প্রবাসে
উড়ে আসে কলস্বর, বাহু থেকে শীতের উত্তাপ
যে রকম অপর বুকের কাছে ঋণী হয়, যমুনা, আমার হাত ধরো,
স্বর্গে যাবো ।

আমার প্রবাস আজ শেষ হলো, এ রকম মধুর বিচ্ছেদ
মানুষ জানেনি আর । যমুনা আমার সঙ্গী—সহস্র রুমাল
স্বর্গের উদ্দেশ্যে ওড়ে, যমুনা তোমায় আমি নক্ষত্রের অতি প্রতিবেশী
করে রাখি, আসলে কি স্বাতী নক্ষত্রের সেই প্রবাদ মাখানো অশ্রু
তুমি নও ?
তুমি নও ফেলে আসা লেবুর পাতার ঘ্রাণে জ্যোৎস্নাময় রাত ?

তুমি নও ক্ষীণ ধুপ ? তুমি কেউ নও
তুমিই বিস্মৃতি, তুমি শব্দময়ী, বর্ণ-নারী, স্তন ও জঙ্ঘায়
নারী তুমি,
ভ্রমণে শয়নে তুমি সকল গ্রন্থের যুক্ত প্রণয় পিপাসা
চোখের বিশ্বাসে নারী, স্বেদে চুলে, নোখের ধুলোয়
প্রত্যেক অণুতে নারী, নারীর ভিতরে নারী, শূন্যতায় সহাস্য সুন্দরী,
তুমিই গায়ত্রী ভাঙা মনীষার উপহাস, তুমি যৌবনের
প্রত্যেক কবির নীরা, দুনিয়ার সব দাপাদাপি ক্রুদ্ধ লোভ
ভুল ও ঘুমের মধ্যে তোমার মাধুরী ছুঁয়ে নদীর তরঙ্গ

পাপীকে চুম্বন করো তুমি, তাই দ্বার খোলে স্বর্গের প্রহরী ।

তুমি এ রকম ? তুমি কেউ নও
তুমি শুধু আমার যমুনা ।
হাত ধরো, স্বরবৃত্ত পদক্ষেপে নাচ হোক, লজ্জিত জীবন
অন্তরীক্ষে বর্ণনাকে দৃশ্য করে, এসো, হাত ধরো ।
পৃথিবীতে বড় বেশী দুঃখ আমি পেয়ে গেছি, অবিশ্বাসে
আমি খুনী, আমি পাতাল শহরে জালিয়াত, আমি অরণ্যের
পলাতক, মাংসের দোকানে ঋণী, উৎসব ভাঙার ছদ্মবেশী
গুপ্তচর !
তবুও দ্বিধায় আমি ভুলিনি স্বর্গের পথ, যে রকম প্রাক্তন স্বদেশ ।
তুমি তো জানো না কিছু, না প্রেম, না নিচু স্বর্গ, না জানাই ভালো
তুমিই কিশোরী নদী, বিস্মৃতির স্রোত, বিকালের পুরস্কার....

আয় খুকি, স্বর্গের বাগানে আজ ছুটোছুটি করি ।

আমার স্বপ্ন

সূচিপত্র

বাতাসে তুলোর বীজ ১৬৩, এক একদিন উদাসীন ১৬৩, যদি নির্বাসন দাও ১৬৪, বহুদিন লোভ নেই ১৬৬, শব্দ ১৬৬, আমার কৈশোরে ১৬৮, রূপালি মানবী ১৬৯, জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না ১৭০, শোকসভায় এক সন্ধ্যা ১৭১, কিশোর ও সন্ন্যাসিনী ১৭২, মুক্তি ১৭৪, যা ছিল ১৭৪, চন্দনকাঠের বোতাম ১৭৫, আমি যদি ১৭৭, গদ্যছন্দে মনোবেদনা ১৭৭, হাসন্ রাজার বাড়ি ১৭৮, তিনজন মানুষ ১৭৯, পেয়েছো কি ? ১৮০, রক্তমাখা সিঁড়ি ১৮১, দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ ১৮২, দু'পাশে ১৮৩, ধাত্রী ১৮৪, মানে আছে ১৮৫, নীরার দুঃখকে ছোঁয়া ১৮৫, কবির মৃত্যু : লোরকা স্মরণে ১৮৭, দেরি ১৯১, সেই মুহূর্তটা ১৯২, দেখা হয়নি ১৯৩, সেই ছেলেটি ও আমি ১৯৩, মানুষ ১৯৪, পতন ১৯৫, নশ্বর ১৯৬, রাগী লোক ১৯৭, বিদেশ ১৯৮, সৃষ্টিছাড়া ১৯৯, ছায়া ১৯৯, ভুল বোঝাবুঝি ২০০, প্রেমবিহীন ২০১, উনিশশো একাত্তর ২০২

বাতাসে তুলোর বীজ

বাতাসে তুলোর বীজ, তুমি কার ?
এই দিক শূন্য ওড়াউড়ি, এ যেন শিল্পের রূপ—
আচমকা আলোর রশ্মি পপি ফুল ছুঁয়ে গেলে
যে রকম মিহি মায়াজাল
বাতাসে তুলোর বীজ তুমি কার ?
পাহাড়ী জঙ্গল
থেকে
উড়ে এলে
খোলা-জানলা পাঁচকোনা ঘরে
আমার শব্দের রেশ উড়ে যায়
নামহীন নদীটির ধারে
স্বপ্নের ভিতর ফোটে স্নেহের মতন জ্যোৎস্না
বৃদ্ধ কৃষকের ছায়া
আলপথে দাঁড়িয়ে ধানের গন্ধ নেয়
ঘুমে আঠা হয়ে আসে দূরে কোনো অচেনা নারীর চোখ....
এ যেন শিল্পের রূপ
এই দিক শূন্য ওড়াউড়ি
বাতাসের তুলোর বীজ, তুমি কার ?

এক একদিন উদাসীন

এমনও তো হয় কোনোদিন
পৃথিবী বান্ধবহীন
তুমি যাও রেলব্রীজে একা—
ধূসর সন্ধ্যায় নামে ছায়া
নদীটিও স্থিরকায়া
বিজনে নিজের সঙ্গে দেখা ।

ইস্টিশানে অতি ক্ষীণ আলো
তাও কে বেসেছে ভালো
এত প্রিয় এখন দ্যুলোক
হে মানুষ, বিস্মৃত নিমেষে
তুমিও বলেছো হেসে
বেঁচে থাকা স্বপ্নভাঙা শোক !
মনে পড়ে সেই মিথ্যে নেশা ?
দাপটে উল্লাসে মেশা
অহঙ্কারী হাতে তরবারি
লোভী দুই চক্ষু চেয়েছিল
সোনার রুপোর ধুলো
প্রভুত্বের বেদী কিংবা নারী !
আজ সবকিছু ফেলে এলে
সূর্য রক্তে ডুবে গেলে
রেলব্রীজে একা কার হাসি ?
হাহাকার মেশা উচ্চারণে
কে বলে আপন মনে
আমি পরিত্রাণ ভালোবাসি !

যদি নির্বাসন দাও

যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো !
বিষণ্ণ আলোয় এই বাংলাদেশ
নদীর শিয়রে ঝুঁকে পড়া মেঘ
প্রান্তরে দিগন্ত নির্নিমেষ—
এ আমারই সাড়ে তিন হাত তুমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো ।

ধানক্ষেতে চাপ চাপ রক্ত
এইখানে ঝরেছিল মানুষের ঘাম
এখনো স্নানের আগে কেউ কেউ করে থাকে নদীকে প্রণাম
এখনো নদীর বুকে
মোচার খোলায় ঘোরে
লুঠেরা, ফেরারী !
শহরে বন্দরে এত অগ্নি-বৃষ্টি
বৃষ্টিতে চিক্কণ তবু এক একটি অপরূপ ভোর,
বাজারে ক্রূরতা, গ্রামে রণহিংসা
বাতাবি লেবুর গাছে জোনাকির ঝিকমিক খেলা
বিশাল প্রাসাদে বসে কাপুরুষতার মেলা
বুলেট ও বিস্ফোরণ
শঠ তঞ্চকের এত ছদ্মবেশ
রাত্রির শিশিরে কাঁপে ঘাস ফুল—
এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাবো ।

কুয়াশার মধ্যে এক শিশু যায় ভোরের ইস্কুলে
নিথর দীঘির পারে বসে আছে বক
আমি কি ভুলেছি সব
স্মৃতি, তুমি এত প্রতারক ?
আমি কি দেখিনি কোনো মন্থর বিকেলে
শিমুল তুলোর ওড়াওড়ি ?
মোষের ঘাড়ের মতো পরিশ্রমী মানুষের পাশে
শিউলি ফুলের মতো বালিকার হাসি
নিইনি কি খেজুর রসের ঘ্রাণ
শুনিনি কি দুপুরে চিলের
তীক্ষ্ণ স্বর ?
বিষণ্ণ আলোয় এই বাংলাদেশ…
এ আমারই সাড়ে তিন হাত ভূমি
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াবো
আমি বিষপান করে মরে যাব ।

বহুদিন লোভ নেই

বহুদিন লোভ নেই, শব্দে শিহরন, স্বপ্নে শিহরন, ঘুম
শরীরে দুপুর এলো; যেন বহুদিন লোভ নেই
বহুদিন লোভ নেই, শ্মশানের পাশে গিয়ে বিকেলে বসিনি ;

এবার তোমার কাছে চলে যাবো, 'তুমি' বহু গ্রন্থ থেকে চুরি.
এরকম যেতে হয়, বিকেলে মন খারাপ হলে তোমার ছায়ায়
না গেলে মানায় না, কিংবা চিঠি, বহু পুরোনো ভুলের
শোক থেকে ছায়ার ভিতরে জ্যোৎস্না, অথবা জ্যোৎস্নায় ধুয়ে ফেলা
শরীরের নিবেদন,—বৃষ্টি থেকে ঘুম থেকে উঠে
তোমার বিজন ভালো, অশ্রু ভালো, বুক ভালো, এমন কি সর্বস্বতা খুলে
ভাঁটফুল দেখা ভালো, চোখ বুজে চোখ রাখা ভালো ।

এরকম রাখা গেছে বহুবার, 'তুমি' নও, তাদের সবারই নাম ছিল
তাঁবুর ভিতরে সুশ্রী মুখখানি বরফের জীবনে ডুবেছে
তাঁবু মিথ্যে, সুশ্রী মিথ্যে, বরফ, জীবন, ডোবা কম মিথ্যে নয়
যেমন কবিতা মিথ্যে,
রক্তমাখা হাতে বেণী খুলে দিলে স্ত্রীলোকের যেমন আনন্দ
যেমন পৃথিবী থেকে সব গাছ খুন করেছিল পাগলা কবি
এরকম দিন গেছে, প্রতিদিন নাম জেনে ভুলে যাওয়া মুখ
লোভহীন উদাসীন, বিশাল চিৎকারে বহু মিথ্যে অসীমতা
এরকম দিন গেছে, দিনের ভিতরে শুকনো চড়া পড়ে আছে !

বহুদিন লোভ নেই, শ্মাশানের পাশে গিয়ে বিকেলে বসিনি ।

শব্দ

ঝাটিংগা নামের এক দুর্দান্ত পাহাড়ী নদীর পাশে
হারাংগাজাও নামে একটা
নম্র ছিমছাম স্টেশন
পাথুরে প্ল্যাটফর্মে একজন রেলবাবু কাঁঠালের দর করছেন

আমাদের কামরায় পর্যাপ্ত ভিড় ও হাতকড়া বাঁধা
দু'জন খুনী আসামী
এবং উজ্জ্বল স্কার্ট-পরা চারটি
সুস্বাস্থ্যবতী অহঙ্কারী খাসিয়া তরুণী,
কয়েকজন শিখ সৈনিক,
মানুষ নামের অসংখ্য মানুষ
আর, দু'পাশে বিশাল আদিম পাহাড় ও
চাপ চাপ বিশৃঙ্খল অরণ্য
দৃশ্যটি এই রকম।

জানলার পাশে বসে আমি সিগারেট টানছিলাম
ঝাটিংগা ও হারাংগাজাও এই দুর্বোধ্য নাম দুটি
মাথার মধ্যে টং টং শব্দ করে
কিছুতেই অন্যমনস্ক হতে দেয় না।
এও সেই শব্দের স্বজাতি যা ব্রহ্মস্বাদ সহোদর
এইসব শব্দের কূলপ্লাবিনী রহস্য বা আরণ্যক মাদকতা
খেলা করে আমাকে নিয়ে
ঐ দূর পাহাড়-প্রতিবেশী অরণ্য দেখলে মনে হয়
ওখানে কখনো মানুষ প্রবেশ করেনি
যদিও জরিপের কাজ পৃথিবীতে আর কোথাও বাকি নেই—
অরণ্য চোখ ফিরিয়ে আমি অহঙ্কারী নারীদের
নদীর মতন উরু দেখেই তৎক্ষণাৎ
ঝাটিংগার মাংসল জলের স্রোত ও
খুনী আসামীদ্বয়ের ধ্যাতা মুখ এবং
সৈনিকের নিস্পৃহতা—
মানুষ নামের অসংখ্য মানুষ....

খেলা ভেঙে দিয়ে আমি বললাম, শান্তনু, দেশলাইটা দাও তো—
এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আমি নিজেকে নিজের মধ্যে
বন্দী করার চেষ্টা করি
তবু একটু পরেই ঝাটিংগা শব্দটি আকাশে লাফ দিয়ে ওঠে
পাহাড়ের এ-মাথা থেকে ও-মাথা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়
এক প্রবল চিৎকার : হারাংগাজাও!

এ যেন লালডেঙ্গা বাজাচ্ছে তার সমর ভেঁপু
পাহাড়ী অরণ্যের ক্রুদ্ধ মানুষ ঘোষণা করছে নিজস্ব সীমানা
যেন আমাকেও সাড়া দিতে হবে, মনে মনে বলি,
দাঁড়াও, আমিও আসছি এক্ষুনি,
আমিও এই পৃথিবীর, তোমারই দলের
কত পাহাড় চূড়ায় এ জীবনে আর ওঠা হবে না
কত ক্ষমা চাওয়া বাকি থাকবে…
ঈষৎ নুয়ে পড়া এক রমণীর উপচে ওঠা বুকে
শেষবার চোখ রেখেছে
যমজের মতন ঐ দুই খুনী আসামী
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতের আর কোনো দোষ নেই—
মেখলা কখনো আচমকা খুলে যায় কিনা এই নিয়ে গুপ্ত গবেষণা
সমতলে উৎকট গ্রীষ্ম, এখানে ঠাণ্ডা নরম হাওয়া
হঠাৎ পাতলা মেঘ এসে নদীটি আর দৃশ্য নয়,
মাদক ছলচ্ছল ধ্বনি—
রেলবাবুটির দরাদরি শেষ হয়নি, পাথর থেকে
চুঁইয়ে পড়ছে জল
সকালের নিথর আচ্ছন্নতা খানখান করে ভেঙে
অন্তরীক্ষে বিশাল গর্জন জেগে ওঠে :
ঝা-টি-ং-গা ! হা-রা-ং-গা-জা-ও !
এই বুনো রোমাঞ্চকর শব্দ
ট্রেনের কামরা থেকে আমাকে টেনে হিঁচড়ে
বার করে নিয়ে বলতে চায়—
এসো, এসো, দ্বিধা করছো কেন, তুমিও পৃথিবীর আদিবাসী !

আমার কৈশোরে

শিউলি ফুলের রাশি শিশিরের আঘাতও সয় না
অন্তত আমার কৈশোরে তারা এরকমই ছিল
এখন শিউলি ফুলের খবরও রাখি না অবশ্য
জানি না, তারা স্বভাব বদলেছে কিনা ।

আমার কৈশোরে শিউলির বোঁটার রং ছিল শুধু
শিউলির বোঁটারই মতন
কোনো কিছুর সঙ্গেই তার তুলনা চলতো না
আমার কৈশোরে পথের ওপর ঝরে পড়ে থাকা
শিশিরমাখা শিউলির ওপর পা ফেললে
পাপ হতো
আমরা পাপ কাটাবার জন্য প্রণাম করতাম।

আমার কৈশোরে শিউলির সম্মানে সরে যেত বৃষ্টিময় মেঘ
তখন রোদ্দুর ছিল তাপহীন উজ্জ্বল
দু' হাত ভরা শিউলির ঘ্রাণ নিতে নিতে মনে হতো
আমার কোনো গোপন দুঃখ নেই, আমার হৃদয়ে
কোনো দাগ নেই
পৃথিবীর সব আকাশ থেকে আকাশে বেজে উঠছে উৎসবের বাজনা!
সাদা শিউলির রাশি বড় শুদ্ধ, প্রয়োজনহীন, দেখলেই
বলতে ইচ্ছে করতো,
আমি কারুকে কখনো দুঃখ দেবো না—
অন্তত এরকমই ছিল আমার কৈশোরে
এখন অবশ্য শিউলি ফুলের খবরও রাখি না।

রূপালি মানবী

রূপালি মানবী, সন্ধ্যায় আজ শ্রাবণ ধারায়
ভিজিও না মুখ, রূপালি চক্ষু, বরং বারান্দায় উঠে এসো
ঘরের ভিতরে বেতের চেয়ার, জানলা বন্ধ দরজা বন্ধ
রূপালি মানবী, তালা খুলে নাও, দেয়ালে বোতাম আলো জ্বেলে নাও,
অথবা অন্ধকারেই বসবে, কাচের শার্সি থাকুক বন্ধ
দূরে থেকে আজ বৃষ্টি দেখবে, ঘরের ভিতরে বেতের চেয়ার, তালা খুলে নাও।

চাবি নেই, একি! ভালো করে দ্যাখো হাতব্যাগ, মন
অথবা পায়ের নিচে কার্পেট, কোণ উঁচু করে উঁকি মেরে নাও

চিঠির বাক্সে দ্যাখো একবার, রূপালি মানবী, এত দেরী কেন ?
বাইরে বৃষ্টি, বিষম বৃষ্টি, ঝড়ের ঝাপ্‌টা তোমাকে জড়ায়
তোমার রূপালি চুল খুলে দেয়, চাবি খুঁজে নাও—
তোমার রূপালি অসহায় মুখ আমাকে করেছে আরও উৎসুক—
ধাক্কা মারো না ! আপনি হয়তো দরজা খুলবে, পলকা ও তালা
অমন উতলা রূপালি মানবী তোমাকে এখন হওয়া মানায় না
অথবা একলা রয়েছো বলেই বৃষ্টি তোমাকে কোনো ছলে বলে
ছুঁতে পারবে না, ফিরবে না তুমি বাইরে বিপুল লেলিহান ঝড়ে—
তালা খুলে নাও ।

রূপালি মানবী, আজ তুমি ঐ জানলার পাশে বেতের চেয়ারে
একলা বসবে আঁধারে অথবা দেয়ালে বোতাম আলো জ্বেলে নাও
ঠাণ্ডা কাচের শার্সিতে রাখো ও রূপালি মুখ, দুই উৎসুক চোখ মেলে দাও ।

বাইরে বৃষ্টি, বিষম বৃষ্টি, আজ তুমি ঐ রূপালি শরীরে
বৃষ্টি দেখবে প্রান্তরময়, আকাশ মুচড়ে বৃষ্টির ধারা·····
আমি দূরে এক বৃষ্টির নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছি, একলা রয়েছি,
ভিজেছে আমার সর্ব শরীর, লোহার শরীর, ভিজুক আজকে
বাজ বিদ্যুৎ একলা দাঁড়িয়ে কিছুই মানি না, সকাল বিকেল
খরচোখে আমি চেয়ে আছি ঐ জানলার দিকে, কাচের এপাশে
যতই বাতাস আঘাত করুক, তবুও তোমার রূপালি চক্ষু—
আজ আমি একা বৃষ্টিতে ভিজে, রূপালি মানবী, দেখবো তোমার
বৃষ্টি না-ভেজা একা বসে থাকা ।

জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না

আমার ভালোবাসার কোনো জন্ম হয় না
মৃত্যু হয় না—
কেননা আমি অন্যরকম ভালোবাসার হীরের গয়না
শরীরে নিয়ে জন্মেছিলাম ।

আমার কেউ নাম রাখেনি, তিনটে চারটে ছদ্মনামে
আমার ভ্রমণ মর্ত্যধামে,
আগুন দেখে আলো ভেবেছি, আলোয় আমার
হাত পুড়ে যায়
অন্ধকারে মানুষ দেখা সহজ ভেবে ঘূর্ণিমায়ায়
অন্ধকারে মিশে থেকেছি
কেউ আমাকে শিরোপা দেয়, কেউ দু' চোখে হাজার ছি ছি
তবুও আমার জন্ম-কবচ, ভালোবাসাকে ভালোবেসেছি
আমার কোনো ভয় হয় না,
আমার ভালোবাসার কোনো জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না।

শোকসভায় এক সন্ধ্যা

এইখানে বসবে এসো, অবিনাশ, বেদনার পাশের চেয়ারে
সাবধান, ছুঁয়ো না ওকে, ও বড় নশ্বর স্রোতে ভেসে যেতে চেয়ে
রূপালি আলোর চোখে থমকে আছে, উন্মোচিত চুলে
ক্ষণিক আঙুল রেখে ও যেন রক্তাক্ত সন্ধ্যা
দৃশ্যমান করে
ওর দৃষ্টি, আমি জানি, বড় ভয়ঙ্কর লক্ষ্যভেদী। সরে এসো,
অবিনাশ, স্পর্শ করো না, সাবধান!

সভাপতি বড় ক্রুদ্ধ, দেশ কাল বাণিজ্য সন্ততি
হুড়োহুড়ি করে মঞ্চে, সিগারেট খেতে উঠে গেল তিনজন
গত রাত্রে ঝড়ে ভাঙা গোলাপের ডাল থেকে ফুলগুলি ছিঁড়ে
কে শূন্যে রেখেছে গেঁথে? ফুলে বড় বিস্মরণ আসে
কে কোথায় জেগে আছে সকাল না গোধূলির শিয়রের
কাছে, ভুল হয়; চোখে ভাসে সহস্র নিয়তি।
(প্রতিটি বক্তার জন্য পুনরায় শোকসভা করে যেতে হবে একদিন)

চলো আমরা বাইরে যাই, অবিনাশ, আমাদের মত্ত কণ্ঠস্বরে
অজস্র গম্ভীর মুখে বিঘ্ন রেখা ফোটে।

বেদনা ওখানে থাক, একা স্তব্ধ, স্বপ্নদৃষ্ট, স্থির
ওর এত উগ্র রূপ, অমন উজ্জ্বল শাড়ি আজ আমাদের সঙ্গে
বড় বেমানান
তার চেয়ে শনিবার ওকে নিয়ে পেনেটিতে স-উপকরণ
বেলেল্লা নষ্টামি করে কিছুক্ষণ কাটবে চমৎকার।

চলো আমরা বাইরে যাই শঙ্কিত শোভায়, অন্ধকারে
হলুদ সর্ষের ক্ষেতে ভ্রমে বদ্ধ কৃষকের মতো
বহুদিন ভূমিকম্পে কাঁপেনি ধরিত্রী তাই মাথার উপরে
কেঁপে ওঠে চকিত আকাশ—
চতুর্দিকে গর্জমান লক্ষ লক্ষ জীবিত নিশ্বাস
কেমন উদ্‌ভ্রান্ত করে, একদা উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিল
আমাদের সঙ্গে যেতে ঠিক এই পথে হিরণ্ময়।
হিরণ্ময়, হিরণ্ময়, নাম ধরে ডেকে ওঠে
আমাদের বিপন্ন বিস্ময়।
দন্তশূলে কষ্ট পেলে লোকে বড় পরিহাস করে
তার চেয়ে মৃত্যু আরও লঘু মনে হয়।

কিশোর ও সন্ন্যাসিনী

ফকির সাহেবের প্রাচীন মাজারের কাছাকাছি আস্তানা গেড়েছিলেন সন্ন্যাসিনী
একটি কিশোর তার অল্প দূরে এসে দাঁড়াতো
আগরতলার ইজের ও চেন লাগানো হলুদ গেঞ্জি
পা দুটো ফাঁক করা, চুলে সর্ষের তেলের বাস
দ্যাখো, চিনতে পারো সেই কিশোরকে

না, তার মুখ দেখা যায় না। কিংবা অতিরিক্ত বিস্ময়ে তার
মুখচ্ছবি অস্পষ্ট।
একদিন সে গুটি গুটি এগিয়ে এসেছিল, কাছে, উবু হয়ে বসে
সন্ন্যাসিনীকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার ভয় করে না?

সন্ন্যাসিনী তাঁর পুরু ওষ্ঠধর সামান্য ফাঁক করে হেসে বলেছিলেন....
মনে আছে কী উত্তর দিয়েছিলেন ?

না, সন্ন্যাসিনীর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা দুলছিল একটু একটু
করতলে রাখা ছিল আমলকী
ধুনীর আগুনে তাঁর চোখ পাকা করমচার মতন রক্তিম
তাঁর জম্বুরার মতন দুটি বুক গেরুয়া ভেদ করে আসতে চায়
না, সন্ন্যাসিনী কী বলেছিলেন মনে নেই !

সন্ন্যাসিনী বাঁ হাতের তর্জনী তুলেছিলেন শুক্লা দ্বাদশীর
আকাশের দিকে—
কিশোর দেখলো, কোমরবন্ধে তলোয়ার এঁকে দাঁড়িয়ে আছেন কালপুরুষ
একটা প্যাঁচা উড়ে গেল চাঁদ আড়াল ক'রে
মনে আছে ?

না, শুধু মনে পড়ে সন্ন্যাসিনীর কপালের ফোঁটায়
চটচটে মেটে সিঁদুর খেতে এসেছিল কয়েকটা পিঁপড়ে
ফকির সাহেবের মাজার থেকে ভেসে এসেছিল গুগ্‌গুলের গন্ধ
রাতচরা চোখ-গেল'র সঙ্গে ডেকে উঠেছিল শকুনের ছানা
তখন অনেক রাত
আধপোড়া কাঠে ফুঁ দিয়ে ছাই উড়িয়ে সন্ন্যাসিনী হঠাৎ বলেছিলেন ক্লান্ত গলায়—
আমি আর বেশীদিন থাকবো না রে ! আমি বুকের মধ্যে
সব সময় চিলের ডাক শুনতে পাই ।
সেই কিশোর তখন সন্ন্যাসিনীর কপাল থেকে পিঁপড়ে খুঁটে
তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করেছিল,
ভয় করে ? তুমি কিছু পাওনি, তোমারও এখনো ভয় করে বুঝি ?

মুক্তি

একজন মানুষ মুক্তিফল আনতে গিয়েছিল,
সে বলেছিল, আমি ফিরে আসবো
প্রতীক্ষায় থেকো।
জানি না সে কোথায় গেছে
কোন্ হিম নিঃসঙ্গ অরণ্যে
বা কোন্ নীলিমাভুক পাহাড় চূড়ায়
জানি না তার সামনে কত দুস্তর বাধা
জানি না সে সংগ্রাম করছে কোন্
অসহনীয়ের সঙ্গে।
সে মুক্তিফল আনবে বলেছিল
সে বলেছিল প্রতীক্ষায় থাকতে
আমি দ্বাদশ বৎসর থাকবো তার জন্য পথ চেয়ে
তার পরেও সে না ফিরলে
আমাকে যেতে হবে.....

আমিও না ফিরলে যাবে আমার সন্তান-সন্ততিরা।

যা ছিল

শুকনো নদীর জলে পা ডুবিয়ে দুপুরের ক্ষণিক কৌতুকে
মন স্বচ্ছ হতে গিয়ে থমকে যায়
পাথরে শ্যাওলার ছোপ, ঝিরঝিরে স্রোতের মধ্যে
বাদামের খোসা
নদীর ওপার থেকে অনায়াসে নীরা নাম্নী মহিলাটি
কুর্চি ফুল নিয়ে ফিরে আসে
গাছের শিকড়ে রাখে সোয়েটার
সিগারেট টেনে আমি মন-খারাপ ধোঁয়া ছেড়ে
ভেঙে দিই বালির প্রাসাদ।

একদিন নদী ছিল চঞ্চলা নর্তকী,
তার তীরে
রমণীর লাস্য ছিল আরও রমণীয়
প্রবল ঢেউয়ের মতো হৃদয়ের ওঠানামা
ভুল ভাঙবার মতো অকস্মাৎ কূল ভেঙে পড়া
নদীর ওপার ছিল দীর্ঘশ্বাস যত দূরে যায়—
নীরা, মনে পড়ে, এই নদীর তরঙ্গে
তোমার শরীরখানি একদিন
অপ্সরার রূপ নিয়েছিল ?
জলের দর্পণে আমি ডুব দিয়ে পাতাল খুঁজেছি
দেখেছি তা স্বর্গ থেকে দূরে নয়, কে কাকে হারায়
তোমার বুকের কাছে নীল জল ছলচ্ছল—সীমাহীন মায়া
আমার নিভৃত সুখ, আমার দুরাশা
এখন এ শীর্ণ নদী....বুকে বড় কষ্ট হয়....
জলের সম্মুখ ছাড়া নারীকে মানায় না !

চন্দনকাঠের বোতাম

যেমন উপত্যকা থেকে ফিরে এসেছি বহুবার, পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা হয়নি
যেমন হাত অঞ্জলিবদ্ধ করেছি বহুবার, কখনো প্রার্থনা জানাইনি
যেমন নারীর কাছে মৃত্যুকে সমর্পণ করেছিলাম
মৃত্যুর কাছে নারীকে
যেমন বৃক্ষের কাছে জল্লাদের মতন গিয়েছি কুঠার হাতে
উপকথার কাঠুরেকে করেছি উপহাস
যেমন মানুষের কাছে আমিও মানুষ সেজে থাকতে চেয়েছিলাম
কৃতজ্ঞতার বদলে ফিরিয়ে নিয়েছি মুখ
যেমন স্বপ্নের মধ্যে নিজের শৈশব দেখেও চিনতে পারিনি
লোকের মধ্যে শিশুকে আদর করেছি লৌকিকতাবশত
ডাকবাংলোর বন্ধ দরজার সামনে চাবির বদলে হাতুড়ি চেয়েছিলাম

যেমন ঝামরে-পড়া অন্ধকারের মধ্য থেকে সর্বাঙ্গে ভুসো কালি মেখে
এসেছিলাম আলোর কাছে
যেমন কুকুরের দাঁতে বার বার ছুঁয়েছি স্তন ও ওষ্ঠসমূহ
যেমন জ্যোৎস্নার মধ্যে গন্ধরাজ ফুলগাছের পাশে দেখেছিলাম
এক বোবা কালা প্রেত
যেমন বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে গলা মুচড়ে মেরেছিলাম ধবল হাঁস
কান্না লুকোবার জন্য নদীতে স্নান করতে গিয়েছি
যেমন অন্ধ মেয়েটির কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়েছিল
আমার পূর্বজন্মের চেনা
অত্যন্ত মমতায় আমি তাকে উপহার দিয়েছিলাম রুপো বাঁধানো আয়না
যেমন ফিরে আসবো বলেও ফিরে যাইনি বেশ্যার কাছে
সমুদ্রের কাছেও আর যাইনি
ফিরে যাইনি ধলভূমগড়ের লালধুলোর রাস্তায়
দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিতা ধাইমা'র কাছেও যাওয়া হয়নি
যেমন ঠিকানা হারিয়ে বহু চিঠির উত্তর লেখা হয় না
তবু জেগে থাকে অভিমান
যেমন মায়ের কাছেও গোপন করেছি শরীরের অনেক অসুখ
যেমন মনে মনে গ্রহণ করা অনেক শপথ কেউ শুনতে পায়নি
বলেই মেনে চলিনি
যেমন কাঁটা বেঁধার পর রক্ত দর্শনে সূর্যাস্তের আবহমান
দৃশ্য থেকে ফিরে আসে চোখ ;

তেমনই এই চৌতিরিশ বছরে এক ট্রেনের জানলায় মুখ রেখে
আমার চকিতে দিগ্‌ভ্রম হয়
বৃক্ষসারি ছুটে যায় আমার আপাত গতির বিপরীত দিকে
পুকুরে স্নানের দৃশ্য মুহূর্তের সত্য থেকে পরমুহূর্তের অলৌকিক
আমার বুক টনটন করে ওঠে অথচ নির্দিষ্ট শোক নেই
সান্ত্বনার কথা মনে আসে না
আয়ুর সীমানা কেউ জানে না, তাই মনে হয় অনেক কিছু হারিয়েছি
কিন্তু মুহূর্তের সত্যেরই মতন, সেই মুহূর্তে শুধু মনে পড়ে
কৈশোরে হারিয়েছিলাম অতি প্রিয় একটা চন্দনকাঠের বোতাম
এখনও নাকে আসে তার মৃদু সুগন্ধ
শুধু সেই বোতামটা হারানোর দুঃখে
আমার ঠোঁটে কাতর ক্ষীণ হাসি লেগে থাকে ।

আমি যদি

পাহাড় ফাটিয়ে রাস্তা বানাতে চেয়েছে ডায়নামাইট
মানুষের জন্য রাস্তা
আজ তারা বিমান ও প্রসাদ ওড়াচ্ছে
মানুষেরই হাতে।
নদীর পাশ দিয়ে পায়ে-চলা পথ দিয়ে
হেঁটে যায় মাথায় তালপাতার টোকা পরা
একজন মানুষ
সে এসব কিছু জানে না।

পশুর থেকে বলীয়ান হবার জন্য
একদিন তৈরী হয়েছিল অস্ত্র
আজ পশুরা সব নিহত
অস্ত্রগুলি ক্রমশ শাণিত হয়ে
লকলকে জিভ বার করে খুঁজছে শিকার
শস্ত্রপাণি মহাবীর যোদ্ধা ভিয়েৎনাম ও বাংলাদেশে
নিরস্ত্র শিশুকেও ছিন্নভিন্ন করতে
দ্বিধা করে না এখন।
যা একবার শুরু হয়, তা আর থামে না।
আমি নদীর পারে ঐ তালপাতার টোকা-পরা
মানুষটির সঙ্গী হতে
পারতাম যদি....

গদ্যছন্দে মনোবেদনা

ভেবেছিলাম নিচু করবো না মাথা, তবুও ভেতরের এক কুত্তার বাচ্চা
মাঝে মাঝে মসৃণ পায়ের কাছে ঘষতে চায় মুখ, জানি তো অসীমে
ভাসিয়েছি আমার আত্মার সাদা পায়রা দূত, বলেছি মৃত্যুর চেয়েও সাচ্চা
মানুষের মতো বেঁচে থাকা—তবু তার দু' একটা পালক খসে
জ্যোৎস্নায় মন খারাপ হিমে।

মাঝে মাঝে গদি মোড়া চেয়ারে বসলেও ব্যথা করে পশ্চাৎদেশ, আমি জানি
আচম্বিতে পেয়ালা পিরিচ ভেঙে উঠে দাঁড়ানো উচিত ছিল আমার
জানলার বাইরে থেকে নিয়তি চোখ মারে, শীর্ণ হাতে দেয় হাতছানি
আমি মনকে চোখ ঠেরে অন্যমনস্ক হই, ইস্ত্রি ঠিক রাখি জামার।

এসব ইয়ার্কি আর কদ্দিন হে ? শুধু বেঁচে থাকতেই হালুয়া
টাইট করে দিচ্ছে
অথচ কথা ছিল, সব মানুষের জন্য এই পৃথিবী সুসহ দেখে যাবো,
ঠিক যে রকম
প্রত্যেক মৌমাছির আছে নিজস্ব খুপরি, কিন্তু যার যখন ইচ্ছে
উড়ে যাবার স্বাধীনতা : ফুলের ভেতরে মধু সে জেনেছে, তবু
সঙ্ঘ সভ্যতার জন্য তার শ্রম।

হাসন্ রাজার বাড়ি

গাঁয়েতে এয়েছে এক কেরামতি সাহেব কোম্পানি
কত তার ঢ্যাঁড়াক্যাড়া—মানুষ না পিপীলিকা, যা রে ছুটে যা
যা রে যা দ্যাখ গা খেলা হুরীর নাচন আর
ভাঁড়ের কেরদানি
এখেনে এখন শুধু মুখোমুখি বসে রবো আমি আর হাসন্ রাজা।

আলাভোলা হাওয়া ঘোরে, তিলফুলে বসেছে ভোমর
উদলা নদীটি আজ বড়ই ছেনালি
বিষয় বুঝলে দাদা, ভুলাতে এয়েছে ও যে দুলায়ে কোমর
যা বেটী হারামজাদী, ফাঁকা মাঠে দিব তোর মুখে চুনকালি !

কও তো হাসন্ রাজা, কি বৃত্তান্তে বানাইলে হে মনোহর বাড়ি ?
শিয়রে শমন, তুমি ছয় ঘরে বসাইলে জানালা—
চৌখুপ্পি বাগানে এত বাঞ্ছাকল্পতরুর কেয়ারি
দুনিয়া আন্ধার তবু তোমার নিবাসে কত পিদ্দিমের মালা !

জানুতে ঠেকায়ে থুতনি হাসান্ চিন্তায় বসে
মুখে তার মিটিমিটি হাসি
কড়ি কড়ি চক্ষু দুটি ঘুরায়ে ঘুরায়ে দেখে জমিন আশ্‌মান
ফিসফিসায়ে কয়, বড় আমোদে আছি রে ভাই, ছয়টি ঘরেতে ঐ যে
ছয় দাসদাসী
শমন আসিলে বলে, তিলেক দাঁড়াও, আগে দেখে লই
পদ্মের নকশায় পইড়লো কিনা শেষ টান।

তিনজন মানুষ

গাড়ি বারান্দার নিচে আমরণ অনশনে বসে আছে
তিনজন শ্রমিক
আজ তের দিন ধরে ওদের দেখছি!
শীর্ণ মুখে জ্বলজ্বলে চোখ, রুখু দাড়ি, জট-পাকানো চুল
আধো-হেলান দিয়ে বসা, ওদের ঘুম নেই, খালি পেট
তেতো জিভে ঘুম আসে না
ওদের দেখার জন্য ভিড় জমেনি, ওদের জন্য
মেডিক্যাল বুলেটিন বেরুবে না
আরও তিনচারজন শুধু চাটাইয়ের এক কোণে হাঁটু
আলোয়ানে মুড়ে বসা
নিঃশব্দ, সব কথা ফুরিয়ে গেছে—
বাড়ি ফেরার পথে আজ তের দিন ধরে ওদের দেখছি!

মৃত্যু শিয়রে নিয়ে বসেছো কেন? কেড়ে খেতে পারলে না?
একথা স্বতই আমার মনে আসে, নিজেই লজ্জা পাই—
ওদের নেতারা কেউ এখানে নেই, তারা বাড়িতে ঘুমোচ্ছে
ওদের মালিকরা দিল্লি-বোম্বাইতে ঘুমন্ত
রাষ্ট্রপতির প্রাসাদে খাটাখাটনি করছে দেড়শোজন ভৃত্য
দরজির কাছে কোমরের মাপ দিচ্ছে রোজ অসংখ্য মানুষ,

গোটা বড়বাজার জুড়ে চোঁয়া ঢেকুরের শব্দ
এখানে মৃত্যু শিয়রে নিয়ে বসে আছে তিনটি অভুক্ত মানুষ,
নিঃশব্দ
চোখে ঘুম নেই, ক্লান্ত, জিভে তেতো স্বাদ
থমথম করছে
হাওয়া, কেউ জানে না কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হতে চলেছে—
আমি রাজনীতি-ফিতি বুঝি না ! আমি সইতে পারছি না ঐ
তিনজন মানুষের নিঃশব্দ বসে থাকা
তোলপাড় করছে আমার বুক, আমি বলতে চাই
সাবধান !
মানুষ আর ব্যর্থ মৃত্যু মেনে নেবে না ।
সাবধান ! মানুষ আর ব্যর্থ মৃত্যু মেনে নেবে না !
বাড়িতে ফিরে ভাতের থালার সামনে আমার গা
গুলিয়ে ওঠে—সারা রাত আমার ঘুম আসে না !

পেয়েছো কি ?

অপূর্ব নির্মাণ থেকে উঠে আসে
ভোরের কোকিল
কোকিল, তুমি কি পারো মুছে দিতে
সব কলরব ?
হেলেঞ্চা লতায় কাঁপে
শিশিরের বিদায়ী শরীর
শিশির, না আমার শৈশব ?
ভুলে যাওয়া ভালো, কিন্তু
কাঁটার মুকুট পরা মৃত্যু তো
সে নয় !

বৈশাখী আকাশ দেখে গাঢ় হয়
টিয়াঠুঁটি আম
সবই তো উচ্ছিষ্ট করে রেখে গেলে
পেয়েছো কি
যা ছিল পাওয়ার ?
মধ্য জীবনের কাছে প্রশ্ন তোলে
স্থির মধ্যযাম ।

রক্তমাখা সিঁড়ি

চেয়েছি নতুন দিন,
স্নানসিক্ত পৃথিবীর নতুন মহিমা
মানুষের মতো বেঁচে থাকা যেন মনুষ্য জন্মেই ঘটে যায়
বঞ্চনা শব্দটি যেন
অচেনা ভাষার মতো মূঢ় করে
এ জীবন আনন্দের, চতুর্দিকে হাহাকার মুছে যে রকম স্নিগ্ধ সুখ !
কখনো আনন্দ হয় ফুল ছিঁড়ে,
অপরের অন্ন কেড়ে নয়
চেয়েছি নতুন দিন শ্রেণীহীন, স্পর্ধাহীন, বিশুদ্ধ সমাজ
যখন মুখোশে আর
লুকোবে না মানুষের মুখ
শস্য ও বাণিজ্যে সব লোভের করাল দাঁত ভাঙা
কুটিল ও ষড়যন্ত্রী শৃঙ্খলিত,
পৃথিবীর সব জননীর
বুকের শিশুরা রবে নিরাপদ ;
একাকীত্বে কিংবা জনতায়
স্বপ্নের শব্দের মুক্তি—
ভালোবাসা মিশে যাবে দিগন্ত দেয়ালে
চেয়েছি নতুন দিন, গ্লানিহীন যৌবরাজ্য,
সৃষ্টিতে স্বাধীন !

চাইনি এমন ঘোর কালবেলা, অসহিষ্ণু অবিশ্বাস ঘৃণা
হৃৎপিণ্ডে অন্ধকার
কণ্ঠরুদ্ধ দিনরাত্রে এত হিংসা বিষ
প্রদীপ জ্বালার চেয়ে অগ্নিকাণ্ডে মুখ দেখাদেখি
চাইনি শ্মশান-শান্তি,
চাইনি পিচ্ছিল গলি খুঁজি
সবাই পথিক তবু কে কোথায় যাবে তা ভুলে পথে মারামারি
চাইনি অস্ত্রের রোষ,
শত্রু ভুলে নেশাগ্রস্ত মারণ উল্লাস
বিবেকের ঘরে চুরি, স্বপ্নের নতুন দিন ধুলোয় বিলীন
চতুর্দিকে রক্ত, শুধু রক্ত,
আমারই বন্ধু ও ভাই ছিন্নভিন্ন
এতে কার জয় ?
রক্তমাখা নোংরা এই সিঁড়ি দিয়ে আমি কোনো স্বর্গেও যাবো না !

দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ

কাল ভোরবেলা আমি শয়তানকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে
আহ্বান করেছি
লাইব্রেরির মাঠে কাল অসি খেলা হবে ।
হৃদয়, উদ্বেলিত হয়ো না—
বাহু, সমুদ্যত থাকো, স্নায়ুরাশি, সতর্ক—
চোখ, তোমার চিনতে পারা চাই শয়তানের
চোখের গতি
কাল জীবন-মরণ অসি খেলা, কাল জিততে হবে ।

ভিড়ের মধ্যে শয়তান আমার কাঁধে হাত রাখতে চেয়েছিল
সে আমাকে অনুসরণ করেছে পাহাড় চূড়ায়
সালংকারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সে অট্টহাসি হেসেছে—
আমি তার মুখে কলমের কালি ছিটিয়ে দিয়েছি ।

শয়তানের একটা দাঁতের রং কালো
চোখের মণি দুটো হলুদ বর্ণ
তার দশ আঙুলে ছটা লোভের আংটি
সে আমাকে কেল্লার প্রান্তরের কথা বলেছিল
আমি তাকে আহ্বান করেছি লাইব্রেরির মাঠে
সেখানে আমি একা থাকবো না
শত শত সৎ মনীষার দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে
অসি খেলা হবে কাল সকালে
যদি প্রতিপক্ষ জেতে, সমস্ত গ্রন্থের পৃষ্ঠা ছাই হয়ে যাবে !

দু' পাশে

টেবিলের দুই প্রান্তে মুখোমুখি বসে থাকা, অন্তরীক্ষ চোখে
চোখাচোখি করে আছে
পলক পড়ার শব্দ, শুধু ক্ষণিকের অন্ধকার
চোখের ভাষার কাছে মানুষের কৃতঘ্ন সভ্যতা থেমে থাকে ।
আমি তো বুঝি না ঐ ভাষা, বুঝি না নিজেরই চোখ কোন্ কথা
বলে, তবু চেয়ে আছি
পরস্পর দুর্বোধ্যতা, ঢেকে রাখা বুক থেকে ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস—
এর চেয়ে কত সোজা আঙুল স্পর্শের যোগাযোগ,
কাঁধের ওপরে রাখা
অমার্জিত হাত
শরীর সরব হলে দরজা-জানলা সেই ভাষা বোঝে
মুহূর্তের মর্ম বোঝে আয়ু
তবু আমি ভাষা-ভ্রান্ত, বিমূর্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি ।

ধাত্রী

শিয়ালদার ফুটপাথে বসে আছেন আমার ধাইমা
দুটো হাত সামনে পেতে রাখা,
ঠোঁট নড়ে উঠছে মাঝে মাঝে
যে কেউ ভাববে দিনকানা এক হেঁজিপেজি বাহাত্তুরে রিফিউজি বুড়ি।
আঁতুড় ঘরে আমার মুমূর্ষু মায়ের কোল থেকে উনি
একদিন আমাকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন
এঁর ডাটো শরীরের স্তন্য পান করেছিলুম
প্রতিদিন শুষে নিয়েছি রক্ত
ধাইমা'র কুঁড়োর গন্ধ মাখা বুকে শুয়ে আমি
চিল-কান্না কেঁদেছি
রোদ্দুরে পা ছড়িয়ে বসে আমাকে তেল মাখাতে মাখাতে
কত আদিখ্যেতা করতেন
মা-মাসিদের কাছে পরে অনেকবার শুনেছি সেই গল্প—
আমার ভেদ-বমির সময় অমাবস্যার মধ্যরাত্রে স্নান করে
তুলে এনেছিলেন গন্ধবাদালির পাতা
সত্যপীরের দরগায় মানত করেছিলেন আমলকী।

প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে আমি সিকির বদলে
দশ নয়া খুঁজছিলাম
দিনকানা বুড়ি চাইছিল, দুটো পয়সা দে বাবা!
ধাইমা, তুমি প্রথম আমার চোখ ফাঁক করে দিয়েছিলে
গোলাপজল,
দেখিয়েছিলে পৃথিবী
ধাইমা, এ কোন্ পৃথিবী আমাকে দেখালে?
বুড়ি, সর্বনাশিনী, আমাকে কেন বাঁচিয়ে রেখেছিলি
এই অকল্পনীয় পৃথিবীতে
আমি আর কত কিছু হারাবো?

মানে আছে

প্রবল স্রোতের পাশে হেলে পড়া কদম বৃক্ষটি ?
এরও কোনো মানে আছে
নির্জন মাঠের মধ্যে পোড়োবাড়ি—হা হা করে ভাঙা পাল্লা
এরও কোনো মানে আছে।
ঠিক স্বপ্ন নয়, মাঝে মাঝে চৈতন্যের প্রদোষে-সন্ধ্যায়
শিরশিরে অনুভূতি
কি যেন ছিল বা আছে, অথবা যা দেখা যায় না
দুরন্ত পশুর মতো ছুটে আসে বিমূঢ়তা
জানলার পর্দাটা দুলছে কখনো আস্তে বা জোরে
এরও কোনো মানে নেই ?

চুম্বন সংলগ্ন কোনো রমণীর চোখে আমি দেখিনি কি
অন্যমনস্কতা ?
চেনা বানানের ভুল বার বার। অকস্মাৎ স্মৃতির অতল থেকে
উঠে আসে
শৈশবের প্রিয় গান, দু' একটা লাইন
বারান্দায় পাখিটি বসেই ফের উড়ে যায়
হেমকান্তি সায়াহ্নের দিকে
এরও কোনো মানে নেই ?

নীরার দুঃখকে ছোঁয়া

কতটুকু দূরত্ব ? সহস্র আলোকবর্ষ চকিতে পার হয়ে
আমি তোমার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসি
তোমার নগ্ন কোমরের কাছে উষ্ণ নিশ্বাস ফেলার আগে
অলঙ্কৃত পাড় দিয়ে ঢাকা অদৃশ্য পায়ের পাতা দুটি
বুকের কাছে এনে
চুম্বন ও অশ্রুজলে ভেজাতে চাই

আমার সাঁইত্রিশ বছরের বুক কাঁপে
আমার সাঁইত্রিশ বছরের বাইরের জীবন মিথ্যে হয়ে যায়
বহুকাল পর অশ্রু এই বিস্মৃত শব্দটি
অসম্ভব মায়াময় মনে হয়
ইচ্ছে করে তোমার দুঃখের সঙ্গে
আমার দুঃখ মিশিয়ে আদর করি
সামাজিক কাঁথা সেলাই করা ব্যবহার তছনছ করে স্ফুরিত হয় একটি মুহূর্ত
আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে তোমার পায়ের কাছে....

বাইরে বড় চ্যাঁচামেচি, আবহাওয়ায় যখন তখন নিম্নচাপ
ধ্বংস ও সৃষ্টির বীজ ও ফসলে ধারাবাহিক কৌতুক
অজস্র মানুষের মাথা নিজস্ব নিয়মে ঘামে
সেই তো শ্রেষ্ঠ সময় যখন এ সবকিছুই তুচ্ছ
যখন মানুষ ফিরে আসে তার ব্যক্তিগত স্বর্গের
অতৃপ্ত সিঁড়িতে
যখন শরীরের মধ্যে বন্দী ভ্রমরের মনে পড়ে যায়
এলাচ গন্ধের মতো বাল্যস্মৃতি
তোমার অলোকসামান্য মুখের দিকে আমার স্থির দৃষ্টি
তোমার তেজী অভিমানের কাছে প্রতিহত হয়
দ্যুলোক-সীমানা
প্রতীক্ষা করি ত্রিকাল দুলিয়ে দেওয়া গ্রীবাভঙ্গির
আমার বুক কাঁপে,
কথা বলি না
বুকে বুকে রেখে যদি স্পর্শ করা যায় ব্যথা সরিৎসাগর
আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে আসি অসম্ভব দূরত্ব পেরিয়ে
চোখ শুকনো, তবু পদচুম্বনের আগে
অশ্রুপাতের জন্য মন কেমন করে !

কবির মৃত্যু : লোরকা স্মরণে

দু'জন খসখসে সবুজ উর্দি পরা সিপাহী
কবিকে নিয়ে গেল টানতে টানতে—
কবি প্রশ্ন করলেন : আমার হাতে শিকল বেঁধেছো কেন ?
সিপাহী দু'জন উত্তর দিল না ;
সিপাহী দু'জনেরই জিভ কাটা ।
অস্পষ্ট গোধূলি আলোয় তাদের পায়ে ভারী বুটের শব্দ
তাদের মুখে কঠোর বিষণ্ণতা
তাদের চোখে বিজ্ঞাপনের আলোর লাল আভা ।

মেটে রঙের রাস্তা চলে গেছে পুকুরের পার দিয়ে
ফ্লোরেসেন্ট বাঁশঝাড় ঘুরে—
ফসল কাটা মাঠে এখন
সদ্যকৃত বধ্যভূমি ।
সেখানে আরও চারজন সিপাহী রাইফেল হাতে
তাদের ঘিরে হাজার হাজার নারী ও পুরুষ
কেউ এসেছে বহু দূরের অড়হর ক্ষেত থেকে পায়ে হেঁটে
কেউ এসেছে পাটকলের ছুটির বাঁশী আগে বাজিয়ে
কেউ এসেছে ঘড়ির দোকানে ঝাঁপ ফেলে
কেউ এসেছে ক্যামেরায় নতুন ফিল্‌ম ভরে
কেউ এসেছে অন্ধের লাঠি ছুঁয়ে ছুঁয়ে
জননী শিশুকে বাড়িতে রেখে আসেননি
যুবক এনেছে তার যুবতীকে
বৃদ্ধ ধরে আছে বৃদ্ধতরের কাঁধ
সবাই এসেছে একজন কবির
হত্যাদৃশ্য
প্রত্যক্ষ করতে ।

খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হলো কবিকে,
তিনি দেখতে লাগলেন
তাঁর ডান হাতের আঙুলগুলো—
কনিষ্ঠায় একটি তিল, অনামিকা অলঙ্কারহীন
মধ্যমায় ঈষৎ টনটনে ব্যথা, তর্জনী সংকেতময়

বৃদ্ধাঙ্গুলি বীভৎস, বিকৃত—
কবি সামান্য হাসলেন,
একজন পিসাহীকে বললেন, আঙুলে
রক্ত জমে যাচ্ছে হে,
হাতের শিকল খুলে দাও !
সহস্র জনতার চিৎকারে সিপাহীর কান
সেই মুহূর্তে বধির হয়ে গেল ।

জনতার মধ্য থেকে একজন বৈজ্ঞানিক বললেন একজন কসাইকে,
পৃথিবীর মানুষ যত বাড়ছে, ততই মুর্গী কমে যাচ্ছে ।
একজন আদার ব্যাপারী জাহাজ মার্কা বিড়ি ধরিয়ে বললেন,
কাঁচা লঙ্কাতেও আজকাল তেমন ঝাল নেই !
একজন সংশয়বাদী উচ্চারণ করলেন আপন মনে,
বাপের জন্মেও একসঙ্গে এত বেজন্মা দেখিনি, শালা !
পরাজিত এম এল এ বললেন একজন ব্যায়ামবীরকে,
কুঁচকিতে বড় আমবাত হচ্ছে হে আজকাল !
একজন ভিখিরি খুচরো পয়সা ভাঙিয়ে দেয়
বাদামওয়ালাকে
একজন পকেটমারের হাত অকস্মাৎ অবশ হয়ে যায়
একজন ঘাটোয়াল বন্যার চিন্তায় আকুল হয়ে পড়ে
একজন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তাঁর ছাত্রীদের জানালেন :
প্লেটো বলেছিলেন···
একজন ছাত্র একটি লম্বা লোককে বললো,
মাথাটা পকেটে পুরুন দাদা ।
এক নারী অপর নারীকে বললো,
এখানে একটা গ্যালারি বানিয়ে দিলে পারতো····
একজন চাষী একজন জনমজুরকে পরামর্শ দেয়,
বৌটার মুখে ফোলিডল ঢেলে দিতে পারো না ?
একজন মানুষ আর একজন মানুষকে বলে,
রক্তপাত ছাড়া পৃথিবী উর্বর হবে না ।
তবু কারা যেন সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, এ তো ভুল লোককে
এনেছে । ভুল মানুষ, ভুল মানুষ !

রক্ত গোধূলির পশ্চিমে জ্যোৎস্না, দক্ষিণে মেঘ,
বাঁশবনে ডেকে উঠলো বিপন্ন শেয়াল
নারীর অভিমানের মতন পাতলা ছায়া ভাসে
পুকুরের জলে
ঝুমঝুমির মতন একটা বকুল গাছে কয়েকশো পাখির ডাক
কবি তাঁর হাতের আঙুল থেকে চোখ তুলে তাকালেন
জনতার কেন্দ্রবিন্দুতে
রেখা ও অক্ষর থেকে রক্তমাংসের সমাহার
তাঁকে নিয়ে গেল অরণ্যের দিকে
ছেলেবেলার বাতাবি লেবু গাছের সঙ্গে মিশে গেল
হেমন্ত দিনের শেষ আলো
তিনি দেখলেন, সেতুর নিচে ঘনায়মান অন্ধকারে
একগুচ্ছ জোনাকি
দমকা হাওয়ায় এলোমেলো হলো চুল, তিনি বুঝতে পারলেন
সমুদ্র থেকে আসছে বৃষ্টিময় মেঘ
তিনি বৃষ্টির জন্য চোখ তুলে আবার
দেখতে পেলেন অরণ্য
অরণ্যের প্রতিটি বৃক্ষের স্বাধীনতা—
গাব গাছ বেয়ে মন্থর ভাবে নেমে এলো একটি তক্ষক
ঠিক ঘড়ির মতন সে সাতবার ডাকলো :

সঙ্গে সঙ্গে রিপুর মতন ছ'জন
বোবা কালা সিপাহী
উঁচিয়ে ধরলো রাইফেল—
যেন মাঝখানে রয়েছে একজন ছেলে-ধরা
এমন ভাবে জনতা ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো :
ইনকিলাব জিন্দাবাদ !
কবির স্বতঃপ্রবৃত্ত ঠোঁট নড়ে উঠলো
তিনি অস্ফুট হৃষ্টতায় বললেন :
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক !
মানুষের মুক্তি আসুক !
আমার শিকল খুলে দাও !
কবি অত মানুষের মুখের দিকে চেয়ে খুঁজলেন একটি মানুষ
নারীদের মুখের দিকে চেয়ে খুঁজলেন একটি নারী

তিনি দু'জনকেই পেয়ে গেলেন
কবি আবার তাদের উদ্দেশে মনে মনে বললেন,
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক ! মিলিত মানুষ ও
প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব বিপ্লব !

প্রথম গুলিটি তাঁর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল—
যেমন যায়,
কবি নিঃশব্দে হাসলেন,
দ্বিতীয় গুলিতেই তাঁর বুক ফুটো হয়ে গেল
কবি তবু অপরাজিতের মতন হাসলেন হা-হা শব্দে
তৃতীয় গুলি ভেদ করে গেল তাঁর কণ্ঠ
কবি শান্ত ভাবে বললেন,
আমি মরবো না !
মিথ্যে কথা, কবিরা সব সময় সত্যদ্রষ্টা হয় না ।
চতুর্থ গুলিতে বিদীর্ণ হয়ে গেল তাঁর কপাল
পঞ্চম গুলিতে মড় মড় করে উঠলো কাঠের খুঁটি
ষষ্ঠ গুলিতে কবির বুকের ওপর রাখা ডান হাত
ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেল
কবি হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগলেন মাটিতে
জনতা ছুটে এলো কবির রক্ত গায়ে মাথায় মাখতে—
কবি কোনো উল্লাস ধ্বনি বা হাহাকার কিছুই শুনতে পেলেন না
কবির রক্ত ঘিলু মজ্জা মাটিতে ছিটকে পড়া মাত্রই
আকাশ থেকে বৃষ্টি নামলো দারুণ তোড়ে
শেষ নিশ্বাস পড়ার আগে কবির ঠোঁট একবার
নড়ে উঠলো কি উঠলো না
কেউ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি ।

আসলে, কবির শেষ মুহূর্তটি মোটামুটি আনন্দেই কাটলো
মাটিতে পড়ে থাকা ছিন্ন হাতের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে চাইলেন,
বলেছিলুম কিনা, আমার হাত শিকলে বাঁধা থাকবে না !

দেরি

মাঝে মাঝে কাকে যেন হাত তুলে বলি
দাঁড়াও, আমি আসছি
টুকিটাকি কাজ সারতে অনেক বেলা হয়ে যায়।
রন্ধ্রের মধ্যে শোনা যায় কীটের আনাগোনার শব্দ
অসংখ্য দর্জিরা তৈরি করছে ছদ্মবেশ
নদীর নিরালা কিনারে জানু পেতে বসে আছেন
শৈশবে দেখা অন্ধ ফকির
স্মৃতির অস্পষ্টতায় সমস্ত স্তব অসমাপ্ত
বালিকার বুকের কাছে অনেক ভুল প্রত্যাহার করা হয়নি
কুমিররা এখনো কুম্ভীরাশ্রু ছড়িয়ে যাচ্ছে
নিশান উড়িয়ে চলে যায় মধ্য রাত্রির ট্রেন
অনেকক্ষণ বাজতে থাকে তীব্র হুইস্‌ল।

মাঝে মাঝে কাকে যেন হাত তুলে বলি,
দাঁড়াও, আমি আসছি
প্রথানুগত চৈতন্য থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে এসে আর তাকে
দেখতে পাই না।
অসংখ্য প্রতিশ্রুতির ওপর শ্যাওলা জমে
শুনতে পাই অনেক অশরীরীর অট্টহাস্য—
যাদের জন্য একদা সোনার রথ নেমে এসেছিল।
বিষণ্ণতাকে লণ্ডভণ্ড করে ছিঁড়ে উঠে আসতেও হাতে জড়িয়ে
যায় সুতো
সুপুরিবাগানের মিহি হাওয়াকে মনে হয় দীর্ঘশ্বাস
কোদালকে কোদাল, ইস্কাপনকে ইস্কাপন এবং
অন্যায়কে অন্যায় বলে চিনে নিতে
অনেক কুয়াশা
টুকিটাকি কাজ সারতে অনেক বেলা হয়ে যায়
আমার দেরি হয়ে যায়, আমার দেরি হয়ে যায়,
আমার দেরি হয়ে যায়!

সেই মুহূর্তটা

দরজা বন্ধ, কলিং বেলে হাত, শ্রবণ উৎকর্ণ
হৃদয় সেখানে নেই।
বৃষ্টি রমণীয়, নীল সঙ্ঘ ভাঙা বৃষ্টি, শরীর ভিজিয়ে এসে
শুষ্ক মুখ—
আঙুলে আঙুল ছোঁয়া, আরও কাছে, বুকে মিশলো বুক,
চাপ, আরও চাপ,
প্রথমে ঘাড়ের পাশে, পরে ঠোঁটে ঠোঁট—ঠিক সেই মুহূর্তে
একটা চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়।
নিছক চিৎকার, তার ভাষা নেই, এইমাত্র যেরকম হৃদয়হীন সিঁড়িভাঙা
(ওঠা সাবধানী, নামার সময় যে-কোনো মুহূর্তে গড়িয়ে পড়ার মতন—
গড়িয়ে পড়ার ঠিক আগে সেই যে মুহূর্তটা)
গাছ থেকে খসে পড়া ঘুরন্ত পালকের মতন এক একটা স্বপ্ন
কখনও যেন হঠাৎ হাঁটু দুমড়ে আসে, নদী আড়াল করে দাঁড়ায় বন্ধু
কাঁচ ভাঙা হাসি প্রত্যেকবার মনে হয় অচেনা
মৎস্য চিহ্নিত দেয়ালে, সঙ্কেত অগ্রাহ্য করি, কিশোরীর
সুরেলা কণ্ঠে 'বেলা যায়'
আর চমকে দেয় না
বিশাল আলমারির চাবি হারালে, মনে হয় এই বুঝি সেই,
কব্জির দিকে চোখ, পেশী শক্তিশালী
মনে হয়, এবার—
কিছুই হয় না
ইস্পাতও বশ্যতা স্বীকার করে, পথ পাদপ্রদীপ হতে চায়
খরার নামে যেরকম ছুটে আসে বিশ্বব্যাপী দয়া
চাপা পড়ে যায় সেই আসল সময়—
চোখ কৃতঘ্ন, অচেনারা মোহিনী, কানু সান্যাল সব্যসাচী,
শুধু সাবধানে সিঁড়িভাঙা
নামার সময় যে-কোনো মুহূর্তে গড়িয়ে পড়ার মতন—
গড়ানো নয়, সেই মুহূর্তটা
থমকে আছে কোথাও, ছুঁতে পারছি না।

দেখা হয়নি

নারীকে এখনও ভালো করে দেখা হয়নি
পৃথিবীতে অনেক কাজ বাকি আছে
অনেক যুদ্ধ, অনেক আগুন নিভিয়ে
আলো জ্বালানো
অনেক পথ পেরিয়ে নদীকে খুঁজে পাওয়া
কিন্তু তার আগে এই প্রচণ্ড বাধা
নারীকে এখনও ভালো করে দেখা হয়নি ।

এত চুম্বনেও তেষ্টা মেটে না
এত আলিঙ্গনেও অধরা
এই রহস্যময় প্রাণীটি
বার বার আমার চোখ ফিরিয়ে নেয়
পাহাড় ও সমুদ্রের ছবি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করে
তার মাঝখানে একজন রমণী, বরবর্ণিনী, স্বয়মাগতা।
আমি সূর্যাস্ত ও মধ্যযামকে বদলে দিই
মুখোমুখি দর্পণের মতন সংখ্যাহীন প্রকোষ্ঠ
তার শুরু ও শেষে লুকিয়ে আছ, কে তুমি ?
তোমাকে এখনও একটুও দেখা হয়নি !

সেই ছেলেটি ও আমি

সেই ছেলেটির চোখে দীপ্ত রোখ
ঠোঁটে ক্রুদ্ধ তেজের ঝলক
ও হাতে রাইফেল তুলে নেবার স্বপ্ন দেখছে
আমি ওর মধ্যে দেখছি আমার কৈশোরের স্বপ্ন ।

ছেলেটি তার হালকা ছিপছিপে শরীরটা নিয়ে
রক থেকে লাফিয়ে এলো রাস্তায়
আগুন ও টিয়ার গ্যাসের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে
ছুটে গেল অবহেলায়
ও যেন ঠিক আমার কৈশোর কাল হয়ে ছুটে গেল !

ছেলেটার জামা ছিন্নভিন্ন, কপালের পাশে রক্ত
ছেলেটা তবু হার মানেনি
ধ্বংসের আগুনের মধ্যে ও এখনো স্বপ্ন দেখছে
তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, জিন্দাবাদ !
রাস্তার ওপাশ থেকে আমি শুনতে পেলাম
যেন অবিকল আমারই গলার আওয়াজ ।

মানুষ

পার্কের রেলিং-এর পাশে ইঁটপাতা
অস্থায়ী উনুনে
গাঢ় হলুদ রঙের খিচুড়ি ফুটছে—
বাচ্চাটা খেলছে রাস্তায় ধুলোয়
মা আঁস্তাকুড় থেকে বেছে নিচ্ছে তরকারির খোসা
পুরুষটা শুয়ে শুয়ে দেখছে দুপুর-রোদের আকাশ
তার ঠোঁটে বার বার এসে বসছে মাছি
ভিখারী পরিবার—অন্যদিন ওদের দিকে চোখ পড়ে না
আজ ইঁটের উনুন ও খিচুড়ি দেখে পিকনিকের কথা
মনে পড়লো
ওরা কি সারাজীবনের জন্য পিকনিক করতে এসেছে ?

মেয়েটি উঠে গেল বেহালার ট্রামে
ছেলেটি তারপর একা একা হাঁটতে লাগলো
দোহারা, শ্যামলা রং, কুড়ি-একুশ, মুখখানি ভারি বিষণ্ণ
ও অহঙ্কারী—
ও কেন বিষণ্ণ ? ও কেন এই পরিব্যাপ্ত মেঘলা দুপুরে
দেখছে না এই ভুবনমোহিনী অচেনা আলো ?
তবু ছেলেটির ওষ্ঠভঙ্গির অহঙ্কার দেখেই মনে হলো
ও একজন ছদ্মবেশী রাজকুমার
সদ্য মহিমাচ্যুত, কিন্তু এই ছদ্মবেশ
তার নিজস্ব

মেয়েটিও কি রাজেন্দ্রাণী ? ট্রামে উঠে গেল, ভালো করে
মুখ দেখিনি
মেঘলা দুপুরে ময়দানে একা একা হাঁটছে
আমার ছদ্মবেশী রাজকুমার ।

বিকেল পাঁচটায় হাওড়া ব্রীজে কত সংখ্যক মানুষ
সবাই কেজো, ব্যস্ত, এ ওকে ঠেলছে, এ ওর
পা মাড়িয়ে দিচ্ছে
যেতে হবে, যেতে হবে, ঠিক সময়ে যেতে হবে !
কোথায় যাবে ওরা ?
যে-যার লোকাল ট্রেনের সময় মেপে রেখেছে
চার্লি চ্যাপলিনের ছবির মতন হাস্যকর হুড়োহুড়ি
হঠাৎ বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে ছুটে আসে
পাগলা-হাওয়া
ফুলের বাজারে হুলুস্থুলু
জাহাজের মন-খারাপ ভোঁ জ্বেলে দেয় নগরীর আলো
হাওড়া ব্রীজের মানুষগুলো আমার কাছে
স্পষ্ট হয়ে ওঠে—
ওরা সবাই আসলে ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি করছে
কোথায় কোন্ কৌটোয় লুকোনো আছে
লোকশ্রুত ভ্রমর !

পতন

স্মৃতি এসে বলে : পূর্ব দিকে যাও, তোমার নিয়তি
প্রতীক্ষায় আছে—
আমি তাকে চোখ তুলে দেখাই ও প্রাসাদের বিশাল পতন—
ভাঙে হৃদয় গম্বুজ, ইঁটকাঠ, ভয়ঙ্কর শব্দে পড়ে
কড়ি বরগা
পিতার টেম্পারা ছবি, জংধরা সিন্দুক
ওড়ে সিন্দুর মাখানো রাজমুদ্রা, শূন্য খাঁচা, অবিরল
মেঘের গর্জন

মায়ের দুঃখিত মুখ, নবীনা নারীর চোখ ভেসে যায়,
ভেসে যায় স্তনযুগে প্রথম উষ্ণতা,
ওকি অসম্ভব শব্দ, প্রবল হাওয়ায় ভাসে ছিন্ন হাত, বই
লুকানো বাজির মতো মধ্যরাতে জেগে ওঠে রক্তমাখা বাল্যের প্রেমিকা
ফেটে পড়ে সহস্র দৃশ্যের ভাণ্ড, আমি পাশ ফিরে
দেখি, ততক্ষণে
গুপ্তচর স্মৃতি পেয়ে গেছে অ্যাকিলিসের গোড়ালি ।

নশ্বর

কখনো কখনো মনে হয়, নীরা, তুমি আমার
জন্মদিনের চেয়েও দূরে—
তুমি পাতা-ঝরা অরণ্যে একা একা হেঁটে চলো
তোমার মসৃণ পায়ের নিচে পাতা ভাঙার শব্দ
দিগন্তের কাছে মিশে আছে মোষের পিঠের মতন
পাহাড়
জয়ডঙ্কা বাজিয়ে তার আড়ালে ডুবে গেল সূর্য
এসবই আমার জন্মদিনের চেয়েও দূরের মনে হয় ।

কখনো কখনো আকাশের দিকে তাকালে চোখে পড়ে
নক্ষত্রের মৃত্যু
মনের মধ্যে একটা শিহরন হয়
চোখ নেমে আসে ভূ-প্রকৃতির কাছে ;
সেই সব মুহূর্তে, নীরা, মনে হয়
নশ্বরতার বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে নেমে পড়ি
তোমার বাদামি মুষ্টিতে গুঁজে দিই স্বর্গের পতাকা
পৃথিবীময় ঘোষণা করে দিই, তোমার চিবুকে
ঐ অলৌকিক আলো
চিরকাল থমকে থাকবে !

তখন বহুদূর পাতা-ঝরা অরণ্যে দেখতে পাই
তোমার রহস্যময় হাসি—
তুমি জানো, সন্ধেবেলার আকাশে খেলা করে সাদা পায়রা
তারাও অন্ধকারে মুছে যায়, যেমন চোখের জ্যোতি—এবং পৃথিবীতে
এত দুঃখ
মানুষের দুঃখই শুধু তার জন্মকালও ছাড়িয়ে যায়।

রাগী লোক

রাগী লোকেরা কবিতা লিখতে পারে না
তারা বড্ড চ্যাঁচায়
গহন সংসারের ম্লান ছায়ায় রাগী লোকরা অত্যন্ত নিঃসঙ্গ
তারা নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে ভালোবাসে।
পাহাড়ের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়া জলপ্রপাতের পাশে
আমি একজন রাগী লোককে দেখেছিলাম
তার বাঁকা ভুরু ও উদ্ধত ভঙ্গিমার মধ্যেও কি অসহায়
একজন মানুষ—
নদীর গতিপথ কেন খালের মতন সরল নয়
এই নিয়ে লোকটি খুব রাগারাগি করছিল!
হাতে এক গোছা চাবি
তবু তালা খোলার বদলে সে পৃথিবীর সব
দরজা ভেঙে ফেলতে চায়—
ঐ লোকটি কোনোদিন কবিতা লিখতে পারবে না
এই ভেবে আমার কষ্ট হচ্ছিল খুব!
পাহাড় ও জলপ্রপাতের পাশে সেই
বিশাল সুমহান প্রকৃতির মধ্যে
বাজে পোড়া শুকনো গাছের মতন দাঁড়িয়ে রইলো
একজন রাগী মানুষ।

বিদেশ

ঠোঁট দেখলেই বুঝতে পারি, তুমি এদেশে বেড়াতে এসেছো
ঐ গ্রীবা, ঐ ভুরুর শোভা এদেশী নয়—
কপালে ঐ চূর্ণ অলক, নিমেষ-হারা দৃষ্টি পলক
ঐ মুখ, ঐ বুকের রেখা এদেশী নয় !

বৃষ্টি থামা বিকেলবেলায় পথ ভরেছে শুকনো কাদায়
আমরা সবাই কাতর, বুকে পাথর
তোমার পা মাটি ছুঁলো না
তোমার হাসি পাখি-তুলনা
তুমি বললে, আবার বৃষ্টি নামুক !

আমরা সবাই রূপ চেয়েছি
ধর্ম অর্থ কাম চেয়েছি
তোমার হাতে শুধু দু' মুঠো বালি !
রুক্ষ দিনের মতন আমরা রুক্ষতাময় তৃপ্তিহারা
আগুন থেকে জ্বলে আগুন, চক্ষু থেকে অগ্নিধারা
তুমি হাওয়ায় শূন্য ফসল দেখতে পেয়ে
বাজালে করতালি ।

এ পৃথিবী বিদেশ তোমার
কত দিনের জন্য এলে ?
বেড়াতে আসা, তাই তো মুখ অমন সুখ-ছোঁয়া !
যদি তোমায় বন্দী করি,
মুঠোর মধ্যে ভ্রমর ধরি
দেবতা-রোষে হবো ভস্ম ধোঁয়া ?

সৃষ্টিছাড়া

কলমের এক আঁচড়ে দুঃখী ঐ লোকটিকে সুখী করে
দিতে পারি আমি ?
সে তার দুঃখের মধ্যে সমুদ্যত, মাতৃহন্তারক সম ক্রূর হাস্যে
নিঙড়ে নেয় চোখ
আমি তার কপাল রেখেছি অমলিন—সে তবুও ভুরুর গভীরে কাটা দাগ
দেখায় আঙুল তুলে, অসহিষ্ণু পায়ে
আমার কল্পিত পথ ছেড়ে যায়—
আমি তাকে বারংবার শান্ত হতে বলি
নিবিড় বন্ধুর মতো আমি তাকে মাটির গভীর শান্তি, রমণীর মেঘলা হাত
কিংবা বিংশ শতাব্দীর নীল বিচ্ছুরিত আলোর সমীপে
নিয়ে যেতে চাই
সে তবু অস্থির গর্জন করে, লণ্ডভণ্ড করে দেয় পর্দা
নারীর চিবুকে রাখে দাঁত, স্তনে নোখ, উরুতে ছড়ায়
তপ্ত শ্বাস
তার অতৃপ্তির মধ্যে খেলা করে ধ্বংস সুখ, আয়নার বদলে
অগ্নিকাণ্ডে দেখে মুখ
আমার বুকের মধ্যে সুষুপ্ত বাসনাগুলি ছিঁড়ে খুঁড়ে বদলে দিতে চায়
কলম সরিয়ে রেখে আমি তার মুখোমুখি বসি
কঠিন ভর্ৎসনা করে মৃত্যুদণ্ড দিতে চাই
সে তখনও ইয়ার্কির মুখভঙ্গি করে, পাঁজরা-কাঁপানো হাসি
দিয়ে, তুড়ি মেরে
আমাকে অগ্রাহ্য করে কালপুরুষের দিকে দেখায় তর্জনী !

ছায়া

হিরণ্ময়, তুমি নীরার মুখোমুখি দাঁড়িয়ো না,
আমি পছন্দ করি না
পাশে দাঁড়িয়ো না, আমি পছন্দ করি না
তুমি নীরার ছায়াকে আদর করো ।

হিরণ্ময়, তোমার দিব্য বিভা নেই, জামায় একটা
বোতাম নেই, ছুরিতে হাতল নেই,
শরীরে এত ঘাম, রক্তে এত হর্ষ,
চোখে অস্থিরতা
এ কোন্ ঘাতকের বেশে তুমি দাঁড়িয়েছো ?
ঘাতক হওয়া তোমাকে মানায় না
তুমি বরং প্রেমিক হও
সামনে দাঁড়িয়ো না, পাশে এসো না
তুমি নীরার ছায়ায় মুখ চুম্বন করো ।

ভুল বোঝাবুঝি

এই তটভূমিহীন প্রবহমান সংশয়
এই যে অস্থির বিষণ্ণতা আমার
এর কোনো শেষ নেই
বুকের মধ্যে প্রায়ই হাজার হাজার সুঁচ ফোটে
মনে হয় পথ ভুলে চলে এসেছি পিঁপড়েদের দেশে
চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, আমি সেই মানুষ নই
আমার হাতে দাগ নেই !
দু'একটি মুহূর্ত বাতাসে তুলো বীজের মতন
দুলতে দুলতে চলে যায় শৈশবের দিকে
বহুকাল চেয়ে রাখা একটি দীর্ঘশ্বাস
বেরুবার পথ পায় না
কত ঝলমলে উজ্জ্বল সকাল আমার দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়
তুমিই এসব কিছুর জন্য দায়ী,
নীরা, তুমি আমাকে ভুল বুঝলে কেন ?

এ তো অভিমান নয়, এর নাম পিপাসা
আমি আনন্দের গান গেয়ে উঠতে চেয়েছিলাম
যদিও আমার গলা ভাঙা

একটি শিশু টলমলে পায়ে হাততালি দিয়ে উঠলো
আমি তাকে স্থির মুহূর্ত দিতে চেয়েছিলাম
উজ্জ্বল ফুলকি ওঠা ঝর্ণায় চেয়েছিলাম অবগাহন
পৃথিবীকে আমি প্রায়শ চেয়েছি সীমানাহীন
নীরা, তুমি আমাকে ভুল বুঝলে কেন ?
কেন ঐ নবনীত হাতের পাঞ্জা সরিয়ে নিলে—
আমি নির্জন ঘরে বন্দী হয়ে রইলাম !

প্রেমবিহীন

ভয়ঙ্কর স্থির সত্যে ডুবে যাব, সুরম্য বিজয়া,
ধৃষ্ট বাঞ্ছা মুছে গেলে পার্থিব ললাটে, ওষ্ঠে চুলে
খেয়ালি আগুন থেকে কে বাঁচাবে ? বৃক্ষসম দয়া
সবুজ আঁচলে ঢেকে, জয়া, তুমি এসেছিলে মায়াবী আঙুলে—
বিশ্ব চরাচর ছুঁয়ে দিতে, যেন বিশ্বাসের গোপন সৌন্দর্যে,
প্রতিভায়
বিখ্যাত শান্তিকে পাবে, যেন আমি পৃথিবীর
সবটুকু খনিজ গন্ধক
চুরি করে হেসে উঠবো হা-হা শব্দে, অস্ত্রহীন রাত্রির বিভায়
আমাকে সাজাতে বুঝি চেয়েছিলে, দয়াময়ী,
সভ্যতার শেষ বিদূষক ?

পৃথিবীকে ভালোবাসবো, এতখানি ভালোবাসা এই বুকে নেই
গভীরে প্রতিষ্ঠাবান আয়ুহীন কীর্তির পাতাল ;
মুহূর্তে জীবন শিল্প চূর্ণ হয়, গ্লানিহীন, পরমুহূর্তেই
ঝলসে ওঠে স্মৃতিমূর্তি, গ্লানিহীন খেয়ালি আগুনে চিরকাল ।
ভয়ঙ্কর স্থির সত্যে ডুবে যাব খরচক্ষে, অটুট শরীরে
অভিলাষ গুপ্ত করে কৃষ্ণকায় হীরকের মতো,
এক জীবনের শোক অনেক ভাটার স্রোতে আসে ফিরে ফিরে
জয়া, তোর প্রেম পেলে উরুদ্বয় শক্তিমান হতো !

উনিশশো একাত্তর

মা, তোমার কিশোরী কন্যাটি আজ নিরুদ্দেশ
মা, আমারও পিঠোপিঠি ছোট ভাইটি নেই
নভেম্বরে দারুণ দুর্দিনে তাকে শেষ দেখি
ঘোর অন্ধকারে একা ছুটে গেল রাইফেল উদ্যত।

এখন জয়ের দিন, এখন বন্যার মতো জয়ের উল্লাস
জননীর চোখ শুকনো, হারানো কন্যার জন্য বৃষ্টি নামে
হাতখানি সামনে রাখা, যেন হাত দর্পণ হয়েছে
আমারও সময় নেই, মাঠে কনিষ্ঠের লাশ খুঁজে ফিরি।

যে যায় সে চলে যায়, যারা আছে তারাই জেনেছে
একা একা হাহাকার ; আজিজুর, আজিজুর, শোন—
আমার হলুদ শার্ট তোকে দেবো কথা দেওয়া ছিল
বেহেস্তে যাবার আগে নিলি না আমার দেহ ঘ্রাণ ?

লিকলিকে লম্বা ছেলে যেন একটা চাবুক, চোয়ালে
কৈশোরের কাটা দাগ, মা'র চোখে আজও পোলাপান
চিরকাল জেদী ! বাজি ফেলে নদীর গহ্বর থেকে মাটি তুলে আনতো
মশাল জ্বালিয়ে আমি ভাগাড়ের হাড়মুণ্ডে চিনবো কি তাকে ?

মা, তোমার লাবণ্যকে শেষ দেখি জুলাইয়ের তেসরা
শয়তানের তাড়া খেয়ে ঝাঁপ দিল ভরাবর্ষা নদীর পানিতে
জাল ফেলে তবু ওকে টেনে তুললো, ছটফটাচ্ছে যেন
এক জলকন্যা
স্টিমারঘাটায় আমি তখন খুঁটির সঙ্গে পিছমোড়া বাঁধা।

ক'টা জন্তু নিয়ে গেল টেনে হিঁচড়ে, হঠাৎ লাবণ্য মুখ ফিরিয়ে
তাকালো সবার চোখে, দৃষ্টি নয়, দারুণ অশনি
ঐটুকু মেয়ে, তবু এক মুহূর্তেই তার রূপান্তর ত্রিকাল-মায়ায়
কুমারীর পবিত্রতা নদীকেও অভিশাপ দিয়ে গেল।

মা, তোমার লাবণ্যকে খুঁজেছি প্রান্তরময়, বাঙ্কারে ফক্সহোলে

ছেঁড়া ব্রা রক্তাক্ত শাড়ি—লুণ্ঠিত সীতার মতো চিহ্ন পড়ে আছে
দূরে কাছে কয়েক লক্ষ আজিজুর অন্ধকার ফুঁড়ে আছে
ধপধপে হাড়ে
কোথাও একটি হাত মাটি খিমচে ধরতে চেয়েছিল।

যে যায় সে চলে যায়, যারা আছে তারাই জেনেছে
বাঁ হাতের উল্টোপিঠে কান্না মুছে হাসি আনতে হয়
কবরে লুকিয়ে ঢোকে ফুল চোর, মধ্য রাত্রে ভেঙে যায় ঘুম
শিশুরা খেলার মধ্যে হাততালি দিয়ে ওঠে, পাখিরাও
এবার ফিরেছে।

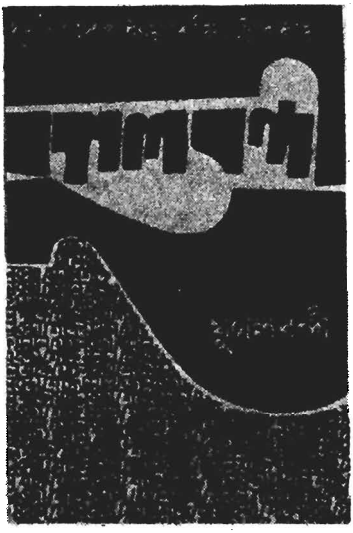

সত্যবদ্ধ অভিমান

সূচিপত্র

সত্যবদ্ধ অভিমান ২০৭, মনে মনে ২০৮, দেখা ২০৯, যে-যাই বলুক ২০৯, খণ্ডকাব্য ২১০, নিসর্গের পাশাপাশি ২১১, অন্ধকারে নদী ২১২, দুপুর থেকে রাত্রি ২১৩, অলীক বাদুড় ২১৩, দাঁড়াও ! কেন ? ২১৪, জেদী মানুষ ২১৫, গাছের নিচে ২১৬, স্রোত থেমে আছে ২১৭, ফেরা ২১৮, অভিমানিনী ২১৮, পৃথিবীর নিচু কোণে ২১৯, চে গুয়েভারার প্রতি ২২০, মাল্লা ২২২

সত্যবদ্ধ অভিমান

এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ হাতে কোনো পাপ করতে পারি ?
শেষ বিকেলের সেই ঝুল বারান্দায়
তার মুখে পড়েছিল দুর্দান্ত সাহসী এক আলো
যেন এক টেলিগ্রাম, মুহূর্তে উন্মুক্ত করে
নীরার সুষমা
চোখে ও ভুরুতে মেশা হাসি, নাকি অভ্রবিন্দু ?
তখন সে যুবতীকে খুকি বলে ডাকতে ইচ্ছে হয়—
আমি ডান হাত তুলি, পুরুষ পাঞ্জার দিকে
মনে মনে বলি,
যোগ্য হও, যোগ্য হয়ে ওঠো—
ছুঁয়ে দিই নীরার চিবুক
এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ হাতে আর কোনোদিন
পাপ করতে পারি ?

এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি—
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায় ?
সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে পড়ে ভীষণ জরুরী
কথাটাই বলা হয়নি
লঘু মরালীর মতো নারীটিকে নিয়ে যাবে বিদেশী বাতাস
আকস্মিক ভূমিকম্পে ভেঙে যাবে সবগুলো সিঁড়ি
থমকে দাঁড়িয়ে আমি নীরার চোখের দিকে····
ভালোবাসা এক তীব্র অঙ্গীকার, যেন মায়াপাশ
সত্যবদ্ধ অভিমান—চোখ জ্বালা করে ওঠে,
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায় ?

মনে মনে

যে আমায় চোখ রাঙিয়ে এইমাত্র
চলে গেল গটগটিয়ে
সে আমায় দিয়ে গেল একটুকরো সুখ।
শরীরে নতুন করে রক্ত চলাচল,
টের পাই
ইন্দ্রিয় সুতীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে
মৃদু হেসে মনে মনে আমি তার নাম কেটে দিই!
সে আর কোথাও নেই
হিম অন্ধকার এক গভীর বরফ ঘরে
নির্বাসিত
আহা, সে জানে না!
সে তার জুতোর শব্দে মুগ্ধ
প্যান্টের পকেটে হাত
স্মৃতি-হারা,
বিভ্রান্ত মানুষ।
দাবা খেলুড়ের মতো আমি তাকে
এক ঘর থেকে তুলে
অন্য ঘরে বসিয়ে চুপ করে
চেয়ে থাকি
উপভোগ করি তার ছটফটানি
জালের ফুটোর মধ্যে নাক দিয়ে
যেমন বিষণ্ণ থাকে জেব্রা
শুকনো নদীর পাশে যেরকম দুঃখী ঘাটোয়াল—
আমার হঠাৎ মায়া হয়
আমি তার রমণীকে
নরম সান্ত্বনা বাক্য বলি,
দু'হাত ছড়িয়ে ফের
তছনছ করে দিই খেলা!

দেখা

—ভালো আছো ?
—দেখো মেঘ, বৃষ্টি আসবে !
—ভালো আছো ?
—দেখো ঈশান কোণের কালো, শুনতে পাচ্ছো
ঝড় ?
—ভালো আছো ?
—এই মাত্র চমকে উঠলো ধপধপে বিদ্যুৎ।
—ভালো আছো ?
—তুমি প্রকৃতিকে দেখো
—তুমি প্রকৃতি আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছো
—আমি তো অণুর অণু, সামান্যের চেয়েও
সামান্য
—তুমি জ্বালাও অগ্নি, তোলো ঝড়, রক্তে এত
উন্মাদনা
—দেখো সত্যিকার বৃষ্টি, দেখো সত্যিকার ঝড়
—তোমাকে দেখাই আজও শেষ হয়নি,
তুমি ভালো আছো ?

যে-যাই বলুক

যে-যাই বলুক, আমার ভীষণ
বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে
সন্ধেবেলায় নীলচে আলোয় পথ ঘুরে যায় মোমিনপুরে
আমি তখন কোন্ প্রবাসে, বেঁচে থাকার থেকেও দূরে
ঘুরে মরবো ! নরম হাত
ঠোঁট ছোঁবে না, চোখ ছোঁবে না ?
যে-যাই বলুক, আমার ভীষণ
বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

মধ্য নিশীথ আমায় ডেকে দেখিয়েছিল হাস্নুহেনা
সকালবেলার রোদে আমার
শিশুকালের স্নেহ মমতা
হাওয়ায় ওড়ে। শূন্য বনে
বলেছিলাম গোপন কথা
কেউ শোনেনি, তবু আমার স্বপ্ন ঘোরে আলোকে মেঘে
যে-যাই বলুক, আমার ভীষণ
বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

কে জ্বালে আগুন, কে ছুটে যায় ক্রুদ্ধ বেগে !
কে রসাতল জাগাতে চায়,
কার নিশ্বাস ছুরি ঝলসায় ?
তুমিও ভালোবেসেছিলে না ? তবুও কেন মরণ খেলায়
এত আনন্দ ! সত্যি বলো তো, এখানে আর বাঁচতে চাও না ?
যে-যাই বলুক, আমার ভীষণ বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

খণ্ডকাব্য

—কে যায় ?
—এই মাত্র চলে গেল বিহ্বল রজনী
—অদূরে কিসের শব্দ ?
—রৌদ্র থেকে ফিরে আসে ছায়া
—জলস্রোত ফিরে গেছে যেখানে যাবার
কথা ছিল ?
—চাঁদ ভুলে গেছে তাকে
—বাতাসে কিসের গন্ধ ?
—আমি এক মরালীকে চুম্বন করেছি
—কেউ কি এসেছে ঋণ শোধ নিতে ?
—একজন, যে তোমার জন্য কেঁদেছিল
যে তোমার বাহুতে রেখেছে
অনুতপ্ত মুখ

—কে যায় ?
—এই মাত্র ঘুরে গেল হাওয়া
—অদূরে কিসের শব্দ ?
—একটি ফুলের ঝরে যাওয়া
একটি নতুন ফুল ফুটে ওঠা
—চাঁদ কি এসেছে ফিরে
বিস্মৃতির পরপার থেকে ?
—জলস্রোত নিয়ে গেল তাকে
—বাতাসে কিসের গন্ধ ?
—তীরবিদ্ধ মরালীর গাঢ় রক্ত
—কেউ কি হয়েছে ঋণ মুক্ত ?
—তুমি তো জন্মান্ধ নও, মূক ও বধির নও
—ভালোবাসা অসহিষ্ণু, বারবার ফিরে ফিরে আসি
অতৃপ্তির পাত্র হাতে
তোমার চোখের কাছে, নীরা !

নিসর্গের পাশাপাশি

সিংহাসন থেকে ধীর পদক্ষেপে নেমে আসে
ছারপোকা
লেলিহান আগুন প্রদক্ষিণ করে সে
রক্ত সমুদ্রের সামনে
বিষণ্ণভাবে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ
হালকা হাওয়ার মতন মৃত্যুকে অনুভব
করার আমেজে চোখ বুজে আসে ।
তখন বারুদ রঙের মেঘের আড়ালে ডুকে গেছে সূর্য
একটা কাক লুঠেরার মতন তীব্র চোখে
চতুর্দিক দেখে নিয়ে উড়ে যায়
সেই সূর্যের দিকে

পৌঁছাবার আগেই অন্ধকার, নেমে আসে
ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হয়
নারীর অহমিকার ওপর আস্তে আস্তে কুয়াশা জমে
কুয়াশার মধ্যে নিঃশব্দে খেলা করে যৌবন।

অন্ধকারে নদী

নদী, তুমি অন্ধকার। এ যে রাত্রি
এ যে স্রোত বিপুল বহতা
তরঙ্গের চকিত ঝাপট, ঘূর্ণি, মাংসল স্বাস্থ্যের মতো জল
সেই রাত্রিকায় নদী—
শীত, ঘন কৃষ্ণপক্ষ ; বাঁ হাত চেনে না ডান হাত
চোখ চেয়ে আছে, তবুও দেখে না
এত অন্ধকার যেন বাতাস চেনে না জল,
ভ্রমর হারায় ফুল,
মানুষ তো পথ হারাবেই,
শুধু শব্দ, স্রোত—
শব্দ থেকে নদীর নিশানা—আজও মনে পড়ে
সেই ছেলেবেলা
গভীরে নিশীথে নদী দেখা—
দেখা নয়, অমন আঁধারে কিছু দেখা হয়নি,
নদীর অস্তিত্ব
গ্রহণ করেছি বুকে—র‍্যাপারে শরীর ঢাকা পৌষের হাওয়ায়
বাঁধের ওপরে একা দাঁড়িয়েছিলাম।
মনে পড়ে সেই নদী।
নদী, তুমি এখনও তেমনি আছো
দুর্দান্ত, সরব ?
বালকের বাল্যকাল রহস্যে ভরাও
তুমি খেলাচ্ছলে প্রাণ হন্তারক
আর কোনো শীত মধ্যযামে, র‍্যাপার জড়িয়ে
আমি নদী দেখতে যাবো ?

দুপুর থেকে রাত্রি

তিনজন তেজী ছেলে দুপুরে ছুটছিল সাইকেলে
বুক খোলা শার্ট, তারা রোদ্দুরে অদৃশ্য হয়ে যেতেই
শ্লথ মানুষের ভিড় বেনোজল হয়ে ঘিরে আসে
যে-যার পথের থেকে খুঁটে নেয় কাচ ও পালক
নারী হয় ক্বচিৎ রমণী, ধুলোভরা হাওয়া ঘুরে যায়
আমিও প্রস্থান করি অন্তিম পর্বের দিকে
বাসের পা-দানি থেকে শুরু করি
কনুইয়ের ব্যবহার।

দিনের নিয়মমতো দিন শেষ হয়
বাড়ির নিয়মমতো দরজা খোলে, দরজা বন্ধ,
ফের দরজা খোলা
রাত্রে কিছু খুনসুটি সেরে আমি বারান্দায়
সিগারেট ধরিয়ে কেশে কেশে
আচমকা টের পাই—অন্ধকার উদ্ভাসিত করে আছে
এক দৃশ্য
তিনজন তেজী ছেলে ছুটে যাচ্ছে দুরন্ত সাইকেলে
হু-হু বাতাসের মধ্যে তারা নেয় শস্য ঘ্রাণ
সীমাহীনতার মধ্যে ওরা চৈতন্যের তিন পাশা
এই মাত্র দান পড়লো
আমার সামনে এসে হেসে উঠলো
দুনিয়া-কাঁপানো তীব্র হাসি।

অলীক বাদুড়

অলীক বাদুড়, তুই
কোন্ স্পর্ধা ভরে উড়ে এলি ?
গাছের শিখরে ছিল
হিরণ্য চাঁদের ম্লান বৃষ্টি ভেজা মুখ

বাতাস দিয়েছে সুখ
হেমন্ত-কাতর পল্লীটিকে
সদ্য ঘুম ভেঙে আমি
ভোগ করি দুর্নিবার স্মৃতির কুহেলি—
অলীক বাদুড়, তুই
কোন্ স্পর্ধা ভরে উড়ে এলি ?

কে যেন বিশ্বাস ভেঙে
দিয়েছে দুঃখের হিম ছায়া
কে যেন কঠিন চোখে
রাজপথে জন্মান্ধকে মেরেছে চাবুক
কে যেন অস্থির নোখে
ছিঁড়েছিল বালিকার বুক
এই সব গ্লানি-স্মৃতি
যে মুহূর্তে আমি ছিঁড়ে ফেলি
অলীক বাদুড়, তুই
কোন্ স্পর্ধা ভরে উড়ে এলি ?

দাঁড়াও ! কেন ?

অন্ধকারে কে ডেকে উঠলো, দাঁড়াও !
অন্ধকার নদীর পাশে তখন নদীর মতন অন্ধকার প্রান্তর—
প্রান্তরে আমি একা, কে ডেকে উঠলো, দাঁড়াও !
বৃক্ষ নেই, হাওয়া নেই, তবু সেই অলৌকিক স্বর শিহরন তোলে
আমি শরীরবাদী বলে ভর্ৎসনা পেয়েছি, আমি অশরীরীকে
ভয় করি না, তবু সেই নদীর মতন অন্ধকার প্রান্তরে
আমি চিৎকার করে উঠি :
না,
আমার দীর্ঘস্বর দাবি করে, কেন ? কেন অন্ধকার ? কেন দাঁড়াও ?

আমি সেই সর্বাঙ্গীণ ছায়াময় ব্যক্তিগত ছায়াহীন বর্তমানে দাঁড়িয়ে
উন্মুক্ত দু'বাহু তুলে শেষবার মাটিতে আছড়ে পড়ি
আমি অশরীরীকে ভয় পাই না, কিন্তু আমার অভিমান নেই ?
না, কেন ? কেন অন্ধকার ? কেন দাঁড়াও ? আমার অভিমান
হয় না ?
সাদা বাড়ি, দূরের চিল, ট্রামলাইনের রোদ
তোমরা একদিন আমাকে 'বিদায়' বলেছিলে, মনে নেই ?

জেদী মানুষ

ডান হাতখানি বাড়িয়ে দাও তো দেখি
ছুঁয়ে দেখি কোনো ম্যাজিক রয়েছে কিনা
কী করে এমন মায়াপাশ তুলে আনো
হৃদয় পৃথিবী করতলে আমলকী ?

আঙুলে তোমার মৃদু রক্তিম আভা
বাহুর ডৌলে চম্পক অনুভব
ধুলো মলিনতা তোমাকে ছোঁয় না কেন ?
খুলে ফেলে দাও হীরক অঙ্গুরীয় ?

ওষ্ঠ-অধরে ক্ষীণ চাঁদ ওই হাসি
দেখে এমনকি দেবতারা লোভী হয়
দ্রুত নিশ্বাসে বুক দুটি ওঠে নামে
অন্যবুকের ভেতরে জাগায় ঝড় ।

দাঁড়াও আমার চোখের সামনে এসে
আকাশ, পাতাল, সমকাল ঢেকে দাও
কোমরের খাঁজে, উরুর রেখায় জ্বালো
চির বসন্ত, ঘুম ভাঙা উৎসব ।

এ অবধি লিখে কবি নিজে হাসলেন
প্রাচীন ধাঁচের কবিতার ছেলেখেলা—
তবু তাঁর জেদ অগ্নি রক্তপাতে
ভালোবাসাবাসি হৃদয়ে জাগিয়ে রাখা।

গাছের নিচে

যখন বৃষ্টি পড়ে তখন গাছের নিচে দাঁড়াই একলা
দূরে মাঠের ওপারে মাঠ শূন্য ঝাপসা
বৃষ্টি থেকে বৃষ্টি আসে, ঢেউ-এর পর ঢেউ-এর বৃষ্টি
গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকার নিঃস্বতা কি বিষম নিঃস্ব।

জানি আমার প্রান্তরের বৃষ্টিময় অতি চেতনা
এপাশ থেকে ঝাপটা এলে ওপাশে যাই,
কেন্দ্রবিন্দু স্থির থাকে না
জানি আমার নিরাশ্রয় ললাট লিপি, জানি আমার
বৃষ্টি-ভেজা রাতের দুঃখ,
বৃক্ষ তার প্রতিরোধের প্রতীক্ষায় এখন চুপ।

এবার তার শাখা প্রশাখায়, পাতার ফাঁকে প্রতি আঙুলে
খেলবে বৃষ্টিপাতের খেলা,
কেন্দ্রবিন্দু কেড়ে নিয়ে আমায় পুতুল-নাচ নাচাবে
অতি যত্নে লুকিয়ে রাখা রুমাল থেকেও ঘুচিয়ে দেবে
হৃদয় গন্ধ—
জানি আমার নিরাশ্রয় ললাট লিপি
গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকার নিঃস্বতা কি বিষম নিঃস্ব।

প্রথম থেকেই উচিত ছিল আমার সব বৃক্ষ ছেড়ে
মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা!

স্রোত থেমে আছে

এই সূর্যাস্তের মতো স্মৃতির বিকাশ ছিল,
স্রোত থেমে আছে
ওষ্ঠে লাগে তিক্ত স্বাদ, সর্বক্ষণ ললাটে সোপান
হাত দিয়ে স্পর্শ করি—এই সূর্যাস্তের মতো স্মৃতির বিকাশ
ছিল, স্রোত থেমে আছে।
তাকাই দূরের দিকে—
রেনট্রি গাছের ছায়া যেন অবিরল
পূর্বপুরুষের দীর্ঘশ্বাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে
ছায়াতেই ফিরে আসে
দূরের ভিড়ের দিকে মুহুর্মুহু পলক বদলায়।

চার্চের বিশাল ঘণ্টা বেজে উঠলো কয়েকবার। ঠিক ক'বার ? যেন
দূরের বাদামি মেঘ তাই শুনে ত্রস্তে চলে গেল
গড়ের পশ্চিম পারে ডিউটি-ত্বরায়।
যাক্!
স্টিমার উড়িয়ে দেয় উদাসী আওয়াজ—লাল-হলুদের এই সমারোহ
বাতাসে ছড়িয়ে রাখে মায়া, এই সূর্যাস্তের মতো
স্মৃতির বিকাশ ছিল, স্রোত থেমে আছে।

কখনো মেঘের কায়া ভ্রান্তি আনে, মনে হয় ময়দান দক্ষিণে
বেহালার দিকে এক পর্বত জেগেছে
ঐ সে দেখায় তার কপাট বক্ষের গাঢ় শোভা
স্মৃতি এরকম নয়—এ তো যেন অন্ধ ভিখারীর দিকে
পয়সা ছোঁড়ে উদ্ধত নাগর
রঙের ফসল আজ স্মৃতি নয় মোহ—
স্রোত থেমে আছে।

ফেরা

এমন ভাবে হারিয়ে যাওয়া সহজ নাকি
ভিড়ের মধ্যে ভিখারী হয়ে মিশে যাওয়া ?
এমন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে স্বর্গ থেকে ধুলোর মর্ত্যে
মানুষ সেজে একজীবন মানুষ নামে বেঁচে থাকা ?
সমুদ্রেরও হৃদয় আছে, এই জেনে কি নারীর কাছে
অতলে ডুবে খুঁজতে খুঁজতে টনটনায় চক্ষু স্নায়ু !
কপালে দুই ভুরুর সন্ধি, তার ভিতরে ইচ্ছা-বন্দী
আমার আয়ু, আমার ফুল-ছেঁড়ার নেশা,
নদীর জল পাহাড়ে যায়, তুষার-চূড়া আকাশে মেশা
আমার খুব ইচ্ছে হয় ভালোবাসার মুঠোয় ফেরা ।

অভিমানিনী

ছিল নিঝুম পুষ্করিণী
জলে নামলো কে ?
এলো যে আজ অভিমানিনী ওলো জোকার দে !
বুক জলে যায় আড়পানে চায়—
যা না ঠাকুরঝি
অভিমানিনী একা নাইবে দেখবে শুধু সুয্যি ।
চাঁপার বন্ন ঠোঁট দু'খানি
ভোমরাপানা অক্ষি
অভিমানিনী ঘাটে রইলে দেখবে না কাকপক্ষী
পুটুস করে সুয্যিও যে
মুখ লুকিয়ে সাদা—
চোখের মাথা খেয়ে রইলো মৌরলা আর চাঁদা ।

পৃথিবীর নিচু কোণে

পৃথিবীর নিচু কোণে, এই কলকাতার খুব অন্ধকার প্রান্তে
এক প্রাচীন গুহায়
শুয়ে আছি—
দিন ভাল্লুকের সঙ্গে দেখা হয়।
বিকেল উড়ে যায় স্ট্রাটোস্ফিয়ারের খুব কাছাকাছি স্বর্গে
শিশুর ওষ্ঠের মতো তরল অরুণ শুধু
চুঁইয়ে পড়ে
গীর্জার ঘড়িতে
দমকল ছুটে গেলে আরতির ঘণ্টা বলে ভ্রম হয় না
অরণ্যের শুক্লপক্ষ নগরের পূর্বজন্ম স্মৃতি হয়ে ভাসে।
বাঁ হাতে বিষম ব্যথা, চোখে লাল ছিট
আমি
আহত বিমর্ষ গুহাবাসী
নারীর ঈর্ষার মতো ধারালো পাথরে ঠেস
দিয়ে রাখা
ইহকালময়
দুই অবসন্ন কাঁধ
রক্ত গন্ধ, উপচ্ছায়াময় রক্ত গন্ধ, যৌবনের হরিৎ বিষাদ।
পশমের মতো কালচে-নীল রোঁয়া
তরাই ভাল্লুক তার দুই থাবা তুলে
হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে—
ঝলসে ওঠে মার্বেলের মতো দাঁত
চাপা গর্জনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী জেদ—
রাগ নয়, আমার বিষম অভিমান হয়—
নিরস্ত্র অশক্ত আমি,
এই কি দ্বন্দ্বের যোগ্য কাল ?
গুহা ছাড়বো না, আমি যুদ্ধ করবো না, আমি
তীব্র ধিক্কারের চোখে
ভাল্লুকের দিকে চেয়ে থাকি—
কাপুরুষ !

পাঁশুটে হাওয়ার মধ্যে রক্তগন্ধ,
উপচ্ছায়াময় রক্তগন্ধ, যেন
বজ্রকীট ভেদ করে ছদ্মবেশী উরু।
ম্লান চৈত্রসন্ধ্যা থেকে ভেসে ওঠে ভ্রষ্টা রমণীর
গুপ্ত হাহাকার
টালিগঞ্জ থেকে দূর বেলগাছিয়াময় এক অরণ্যের
পূর্বজন্মস্মৃতি
হরিৎবর্ণের মধ্যে ছোপছোপ ধূসরতা দেখে হিম হয়।

চে গুয়েভারার প্রতি

চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়
আমার ঠোঁট শুকনো হয়ে আসে, বুকের ভেতরটা ফাঁকা
আত্মায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পতনের শব্দ
শৈশব থেকে বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়—
বোলিভিয়ার জঙ্গলে নীল প্যান্টালুন পরা
তোমার ছিন্নভিন্ন শরীর
তোমার খোলা বুকের মধ্যখান দিয়ে
নেমে গেছে
শুকনো রক্তের রেখা
চোখ দুটি চেয়ে আছে
সেই দৃষ্টি এক গোলার্ধ থেকে ছুটে আসে অন্য গোলার্ধে
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়!

শৈশব থেকে মধ্য যৌবন পর্যন্ত দীর্ঘ দৃষ্টিপাত—
আমারও কথা ছিল হাতিয়ার নিয়ে তোমার পাশে দাঁড়াবার
আমারও কথা ছিল জঙ্গলের কাদায় পাথরের গুহায়
লুকিয়ে থেকে

সংগ্রামের চরম মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুত হওয়ার
আমারও কথা ছিল রাইফেলের কুঁদো বুকে চেয়ে প্রবল হুঙ্কারে
ছুটে যাওয়ার
আমারও কথা ছিল ছিন্নভিন্ন লাশ ও গরম রক্তের ফোয়ারার মধ্যে
বিজয়-সঙ্গীত শোনাবার—
কিন্তু আমার অনবরত দেরি হয়ে যাচ্ছে !

এতকাল আমি একা, আমি অপমান সয়ে মুখ নিচু করেছি
কিন্তু আমি হেরে যাইনি, আমি মেনে নিইনি
আমি ট্রেনের জানলার পাশে, নদীর নির্জন রাস্তায়, ফাঁকা
মাঠের আলপথে, শ্মশানতলায়
আকাশের কাছে, বৃষ্টির কাছে, বৃক্ষের কাছে, হঠাৎ-ওঠা
ঘূর্ণি ধুলোর ঝড়ের কাছে
আমার শপথ শুনিয়েছি, আমি প্রস্তুত হচ্ছি, আমি
সব কিছুর নিজস্ব প্রতিশোধ নেবো
আমি আবার ফিরে আসবো
আমার হাতিয়ারহীন হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়েছে, শক্ত হয়েছে চোয়াল,
মনে মনে বারবার বলেছি, ফিরে আসবো !
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয়—
আমি এখনও প্রস্তুত হতে পারিনি, আমার অনবরত
দেরি হয়ে যাচ্ছে
আমি এখনও সুড়ঙ্গের মধ্যে আধো-আলো ছায়ার দিকে রয়ে গেছি,
আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয় !

মাল্লা

নৌকায় মাঝি চারজনা, হাল দাঁড় মোটে তিনখানি
ছয় চোখ করে জল ঘোলা, দুই চোখ মুদে রয় ধ্যানী ।
সাদা পাল চায় পশ্চিমে যায় নায়ের গলুই দক্ষিণে
একজনা হাসে তিনজনা ভাবে, বায়ু চলে যায় পথ চিনে ।

বিজ্‌লি হানলো আকাশ দু'খান জল উঠে পড়ে গম্বুজে
কবি কয়, ওরে মূর্খ মাল্লা, ঘুমায়ে পড়গা চোখ বুঁজে ।

জাগরণ হেমবর্ণ

সূচিপত্র

ঐ তো আমার ২২৫, কবিতার মধ্যে ২২৫, পাওয়া ২২৭, নির্জনতায় ২২৭, প্রবাসের অভিজ্ঞতা ২২৮, ঘরে-বাইরে ২৩০, চেয়ার ২৩০, গুহাবাসী ২৩১, যা চেয়েছি, যা পাবো না ২৩২, সমালোচকের প্রতি ২৩৬, দিনে ও রাত্রে ২৩৭, স্থির সত্য ২৩৮, অপেক্ষা ২৩৮, দুঃখের গল্প ২৩৯, ফিরে যাবো ২৪০, অন্যলোক ২৪১, আমিও ছিলাম ২৪১, জীবন-স্মৃতি ২৪২, সেই সব স্বপ্ন ২৪৫, কবির দুঃখ ২৪৬, পদ্মায় পুনর্বার ২৪৭, শূন্য ট্রেন ২৪৭, তুমি যেই এসে দাঁড়ালে ২৪৮, মৃতের উপদ্রব ২৪৯, পাহাড় চূড়ায় ২৪৯, চেনার মুহূর্ত ২৫০, সখী আমার ২৫১, মিথ্যে নয় ২৫২, হেমন্তে বর্ষায় আমি ২৫৩, বঞ্চনা ২৫৪, চোখ ঢেকে ২৫৪, কত দূরে ? ২৫৫, স্বপ্ন নয় ২৫৫, স্বপ্নের অন্তর্গত ২৫৬, তুমি যেখানেই যাও ২৫৬, ওরা ২৫৮, জাগরণ হেমবর্ণ ২৫৯, লোকটা ২৬০, সাক্ষী ২৬১, অভিশাপ ২৬১, বয়েস ২৬২, এখন ২৬৩

ঐ তো আমার

নদীর ওপারে ঝুঁকে আছে বাঁশবন
ঐ তো আমার স্বর্গ
ঐ তো আমার বিস্মরণের ভিতরে একটি জোনাকি
ধপধপে সাদা বক উড়ে যায় মায়াবী সন্ধ্যা পেরিয়ে

নদীর ওপারে ঝাড়লণ্ঠন জ্বালিয়ে রেখেছে আকাশ
প্রতিধ্বনির মতো ফিরে এলো বন্ধু
শুকনো পাতায় শব্দ ছড়িয়ে নিশ্বাস উড়ে যায়
কে যেন হাসলো, ঠিক যেন চেনা নয়
কে যেন জলের কিনারে বসলো নুয়ে
সব যেন ঠিক স্বপ্ন, যদিও মাটিতে রয়েছি দাঁড়িয়ে
ঐ তো আমার স্বর্গ
ভগ্ন সেতুর প্রান্তে ঐ তো উদাস নশ্বরতা।

কবিতার মধ্যে

বহু চিঠি, ভ্রমণকারীর
মতো
প্রতিটি বন্দর থেকে; মনে আছে,
মনে পড়ে ?
ছবির পোস্টকার্ড।
ঈষৎ দূরত্বে এসে যেন কোনো সাঁকোর ওপরে
একলা দাঁড়িয়ে থাকা—ভ্রূ-সন্ধিতে ঘাম
নীচে জলস্রোত বহু দূরে যায়
সেই দূর মুহূর্তে বিধুর হয়ে ওঠে
একাকিত্বে হাওয়ায় হাওয়ায় শিহরন
বেঁচে আছি, এই বার্তা জানাবার কী বিপুল সাধ

ছন্দ ও শব্দের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে
গাছ থেকে খসে পড়া ঘুরন্ত পাতার মতো চিঠি যায় উড়ে।
ভূতত্ত্ব সমীক্ষা সেরে ক্যাম্পের মলিন আলোয়
বসে আছি কবি
কবিতার মধ্যে তার দিনলিপি
কিংবা সে সংবাদপত্রের ধন্ধে
ঘন ঘন দেখে যায় ঘড়ি
মাথার ভেতরে তাঁত :
সব কিছু সম্বোধনে তুমি—
সুরক্ষিত মহাফেজখানা থেকে যাবতীয় তথ্যরাশি
সেও তো তোমার জন্য, রোমকূপে অস্থিরতা, জয়।

আকস্মিক সুন্দর যা, তা আমার একার কখনো না
অক্ষর সাজিয়ে তার বিলি বন্দোবস্ত করা চাই
উইপোকা আয়ু খেয়ে যায়।

যেমন বৃষ্টির আগে কালো মেঘে চিল ওড়ে
হঠাৎ চাঁদের পাশে ফুটে ওঠে আভা
ভুল ভাঙবার মতো আচম্বিতে মনে পড়ে যায়
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শেষ কথাটাই বলা হয়নি
কিংবা কোনো হিম ভোরে প্রকৃতির
দুর্নিবার খেলা দৃশ্য হলে
নদীর কিনারে তুমি হেঁটে যাও
তখন সে ঊষা ও নদীকে মনে হয়
তোমার চোখের মতো উপহার, তরুণ সূর্যের সাক্ষ্য
বহুরূপী সুখ ও বিষাদ
এই সব ছোট চিঠি,...জানি কেউ
উত্তর দেবে না।

পাওয়া

অন্ধকারে তোমার হাত
ছুঁয়ে
যা পেয়েছি, সেইটুকুই তো পাওয়া
যেন হঠাৎ নদীর প্রান্তে
এসে
এক আঁজলা জল মাথায় ছুঁইয়ে যাওয়া।

নির্জনতায়

অপ্সরাদের মতন সাদা ফুল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফুটে আছে
ওদেরই জন্য আজ মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্না কিছু বেশী
হঠাৎ ইচ্ছে করে তছনছ ক'রে দিই রাত্রির বাগান
ঝড় আসবার আগে ঝড় তুলি
'শরীর, শরীর, তোমার মন নাই কুসুম ?'

সত্যিই এই প্রশ্ন করেছিলুম, এক রাত্তিরে
সার্কিট হাউসের পরিচ্ছন্ন উদ্যানে
প্রশ্ন নয়, প্রলাপের মতন, মানুষ যখন একা থাকে
দাড়ি কামাবার সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে
সে যেমন মুখভঙ্গি করে
আমি নিচু হয়ে ফুলের গন্ধ শুঁকি
অস্বীকার করার সাধ্য নেই যে তা আমাকে
প্রীতি দেয়
তবু আমি বৃন্ত ছিঁড়ে পাপড়িগুলোতে নোখ বসাই
আমি একা। আমাকে কেউ দেখছে না
যেন আমার নারীকে ভালোবাসার নাম করে
শুধু তার শরীরে লোভ করেছি

তার পায়ের কাছে বসে পুজো করতে করতে
হঠাৎ তার উরুতে মুখ গুঁজি
আমার জিভ তাকে লেহন করে, যা একদা
উচ্চারণ করেছে কবিতা
কোনোটাই অসত্য নয়—

এমন সময় ঝড় এসে ফুলবাগান ও আমার
চোখে ধুলো দিয়ে যায়।

প্রবাসের অভিজ্ঞতা

বহুদিন ছিলাম প্রবাসে আমি
দেখেছি মানুষ
নীরব তাঁতের কাছে কর্মী ও শিল্পীর মতো নত
দেখেছি বাতাসে ছেঁড়া কলাপাতা
যাই যাই শব্দ করে ওড়ে
হাঁটু ভাঙা সিংহ এক পড়ে আছে
হ্রদের কিনারে।

বহুদিন ছিলাম প্রবাসে আমি
দেখেছি মিনার
কীর্তিহীন
যাদের ফেরার কথা ছিল, তারা অনেকে ফেরেনি
মুক্তির ঈষৎ দূরে পৌঁছে কেউ
তৃষ্ণার্ত হয়েছে
শকুনি পালকে কেউ লিখে গেছে নশ্বর জীবনী।
হিসেব মেলাও
সকলই ভূমির জন্য
কাঁচা খাদ্য ছেড়ে দিয়ে একদিন শস্যের সংগ্রহে

বহুদূর চলে আসা—
সেই সব ভূমিদাস এখন আমার
সহযাত্রী—
কেউ বা দেখায় পথ, অনেকেই
আপন চৌহদ্দি
পেরুতে জানে না
হিম গ্রাম পার হয়ে
অর্ধ-সুপ্ত মফঃস্বল
সুতোকলে ষড়যন্ত্র
কারেন্সি নোটের তীক্ষ্ণ অস্ত্র,
যেন
প্রজাতি বিনাশ ছাড়া শান্তি নেই
সর্বত্র দেখেছি
সকলেই শান্তি চায়—
সকল সংসার জুড়ে অস্ত্রের প্রতিভা।

বহুদিন ছিলাম প্রবাসে, আমি দেখেছি মানুষ
নদীর ভাঙন নিয়ে গান গায়—
নারী ও নিয়তি
পাশাপাশি ঘরে বাস—
অনিত্যের দারুণ নগ্নতা
চোখের বিকার আনে—
শিল্পের দুঃখের মতো তবু তার দিকে
ছুটে যায় বাহু
নিমফুলে ভ্রমর বসে না ?

দেখেছি মৃত্যুর কাছে মাতৃত্বের লোভ
বনপথে পাতার ওপরে শুকনো
ফোঁটা ফোঁটা রক্ত
কবেকার—
কুমারী স্তনের পাশে বাসনার তপ্ত হল্কা
কখনো তন্ময় ভোরে
মানুষ ও গরু দুই বন্ধু
পাশাপাশি কথা বলে।

বহুদিন ছিলাম প্রবাসে, আমি ক্লান্ত,
ইচ্ছে হয় বসি
হিজল বনের পাশে,
কিংবা মাথা দিয়ে শুই
ধরিত্রীর কোলে
হাওয়ার আদর খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার মতো
সুখ নেই
এবং স্বপ্নের মধ্যে ফিরে আসে ক্লান্ত পথিকের প্রতিচ্ছবি।

ঘরে-বাইরে

সেদিন ছিল একটি বিন্দু, যা মানুষকে ঘরে ফেরায়
ঘরে ফেরার পথে ছিল শুকনো কাঁটা, কয়েক ফোঁটা রক্ত
পথের থেকে পথ ঘুরে যায়, হাওয়ায় ওড়ে পালক
যে পাখিটি মরেই গেছে, তারই পালক—এও যেন জীবন্ত
পূর্ব কিংবা দক্ষিণে যে জীবন তাকে হাতছানি দেয়
সেদিন ছিল একটি বিন্দু, যা মানুষকে ঘরে ফেরায়।

ঘরের মধ্যে দেয়াল-চিত্র, যা মানুষকে বাইরে ডাকে
পাহাড় ফুঁড়ে নদী এমন ভুল তুলিতে কে রচেছে ?
রঙের এত ভুল ব্যবহার তবু এমন হৃদয়গ্রাহী
আসলে ভুল হৃদয় আছে এই শরীরে, ঘরের মধ্যে ছবি রাখা
সেদিন ছিল একটি বিন্দু যা মানুষকে বাইরে ডাকে।

চেয়ার

তারপর সেখানে পড়ে রইলো কয়েকটা খালি চেয়ার
বাগানে, আকাশের নিচে
ঠিক সাজানো নয়, কাছাকাছি ও দূরে এবং
মুখোমুখি

শূন্য চেয়ারগুলোর ওপর ঝরে পড়ছে হিম।
একটু আগে ওর একটি চেয়ারে আমিও ছিলাম
এখন ঘরের ভেতরে জানলায় মুখ রেখে কেন যে আমি
উৎসুকভাবে তাকিয়ে আছি
চেয়ারগুলির দিকে
নিজেই জানি না।

শুধু চেয়ে থাকা নয়
আমার দৃষ্টি ঝলকে ঝলকে ছুটে যাচ্ছে—
রঙ্গমঞ্চে আলোর মতন
যেন এক্ষুনি দৃশ্য বদলাবে, অথচ
আমি বাইরে যাবো না, কেউ ফিরে আসবে না
পৃথিবীর কয়েকটি স্থির সত্যের মতন
এও একটি
যা প্রতীক্ষা ও সুদৃশ্য চিন্তার মাঝখানে
সীমানা তুলে রাখে
প্রকাণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে জ্যোৎস্না খেলে বেড়ায়
প্রত্যেকটি শয়ন কক্ষ বন্ধ, ভেতরে উপনিষদের শ্লোকের
মতন নিরাভরণ অন্ধকার
ঘুমের মধ্যে একজন পাশ ফেরে, একজন বুক থেকে হাত নামায়
কোমরবন্ধে তলোয়ার এঁটে ওপর থেকে কালপুরুষ
এই গ্রহটিকে দেখছেন
আমি ঘরের ভেতর থেকে দেখছি বাগানের শূন্য চেয়ার
এখন স্থির চিত্র।

গুহাবাসী

—চলে যাবে ? সময় হয়েছে বুঝি ?
—সময় হয়নি, তাই চলে যাওয়া ভালো
—এসো না এখনো এই গুহার ভিতরে খুঁজি
পড়ে আছে কিনা কোনো স্মৃতিশূন্য আলো
—অথবা দু'জনে চলো বাইরে যাই ?

—আমার এ নির্বাসন দণ্ড আজ শেষ হবে ?
—ওসব হেঁয়ালি আমি বুঝি না, তোমাকে সবার মধ্যে চাই
—বহুদিন জনারণ্যে কাটিয়েছি, উৎসবে-পরবে
পিঁপড়ের মতো আমি খুঁটে খুঁটে জমিয়েছি সুখ উপভোগ
একদিন স্বচ্ছ এক হ্রদে অকস্মাৎ দেখি কার দীর্ঘ ছায়া, খুব কাছে
এদিকে ওদিকে চাই, কেউ নেই, তবে কি আমারই মনোরোগ ?
বস্তুত সৃষ্টির মধ্যে কাল-ঋণী ছায়া পড়ে আছে।
অন্ধকারে ছায়া নেই, তাই গুহার আঁধারে
—আমাকে ডেকেছো কেন এই অবেলায় ?
—ভেবেছি—হয়তো ভুল, নারীর সুষমা বুঝি পারে,
ভেঙে দিতে সমস্ত বিস্মৃতি, যদি স্পর্শের খেলায়
মুহূর্ত বিমূর্ত হয়, যদি চোখ
—তবে তাই হোক, তবে তাই হোক
ভুল ভাঙা শুরু হতে দেরি করা ঠিক নয়
বিশেষত অন্ধকারে
—অন্ধকারে রক্ত হয়ে ফুটে ওঠে অনেক করবী
শৈশবের সব দুঃখ যে-রকম ফিরে পেতে চাই বারে বারে
তুমিও দুঃখেরই মতো, বড়ো প্রিয়, এই ওষ্ঠ বুক—
—ওসব জানি না, দুঃখ কিংবা ছায়াটায়া এখন থাকুক
ভুল ভাঙবার মতো এমন মধুর খেলা আর নেই
গুহার ভিতরে তাই শুরু হোক !

যা চেয়েছি, যা পাবো না

—কী চাও আমার কাছে ?
—কিছু তো চাইনি আমি !
—চাওনি তা ঠিক। তবু কেন
এমন ঝড়ের মতো ডাক দাও ?

—জানি না। ওদিকে দ্যাখো
রোদ্দুরে রুপোর মতো জল
তোমার চোখের মতো
দূরবর্তী নৌকো
চতুর্দিকে তোমাকেই দেখা
—সত্যি করে বলো, কবি, কী চাও আমার কাছে।
—মনে হয় তুমি দেবী…
—আমি দেবী নই।
—তুমি তো জানো না তুমি কে!
—কে আমি?
—তুমি সরস্বতী, শব্দটির মূল অর্থে
যদিও মানবী, তাই কাছাকাছি পাওয়া
মাঝে মাঝে নারী নামে ডাকি
—হাসি পায় শুনে। যখন যা মনে আসে
তাই বলো, ঠিক নয়?
—অনেকটা ঠিক। যখন যা মনে আসে—
কেন মনে আসে?
—কী চাও, বলো তো সত্যি? কথা ঘুরিয়ো না
—আশীর্বাদ!
—আশীর্বাদ? আমার, না সত্যি যিনি দেবী
—তুমিই তো সেই! টেবিলের ঐ পাশে
ফিকে লাল শাড়ি
আঙুলে ছোঁয়ানো থুতনি,
উঠে এসো
আশীর্বাদ দাও, মাথার ওপরে রাখো হাত
আশীর্বাদে আশীর্বাদে আমাকে পাগল করে তোলো
খিমচে ধরো চুল, আমার কপাল
নোখ দিয়ে চিরে দাও
—যথেষ্ট পাগল আছো! আরও হতে চাও বুঝি?
—তোমাকে দেখলেই শুধু এরকম, নয়তো কেমন
শান্তশিষ্ট
—না-দেখাই ভালো তবে। তাই নয়?
—ভালো মন্দ জেনে শুনে যদি এ-জীবন
কাটাতুম

তবে সে-জীবন ছিল শালিকের, দোয়েলের
বনবিড়ালের কিংবা মহাত্মা গান্ধীর
ইরি ধানে, ধানের পোকায় যে-জীবন
—যে-জীবন মানুষের ?
—আমি কি মানুষ নাকি ? ছিলাম মানুষ বটে
তোমাকে দেখার আগে
—তুমি সোজাসুজি তাকাও চোখের দিকে
অনেকক্ষণ চেয়ে থাকো
পলক পড়ে না
কী দেখো অমন করে ?
—তোমার ভিতরে তুমি, শাড়ি-সজ্জা খুলে ফেললে
তুমি
তার আড়ালেও যে-তুমি
—সে কি সত্যি আমি ? না তোমার নিজের কল্পনা
—শোন্ খুকী—
—এই মাত্র দেবী বললে—
—একই কথা ! কল্পনা আধার যিনি, তিনি দেবী—
তুই সেই নীরা
তোর কাছে আশীর্বাদ চাই
—সে আর এমন কি শক্ত ? এক্ষুনি তা দিতে পারি
—তোমার অনেক আছে, কণা মাত্র দাও
—কী আছে আমার ? জানি না তো
—তুমি আছো, তুমি আছো, এর চেয়ে বড় সত্য নেই !
—সিঁড়ির ওপরে সেই দেখা
তখন তো বলোনি কিছু ?
আমার নিঃসঙ্গ দিন, আমার অবেলা
আমারই নিজস্ব—শৈশবের হাওয়া শুধু জানে

—দেবে কি দুঃখের অংশভাগ ? আমি
ধনী হবো
—আমার তো দুঃখ নেই—দুঃখের চেয়েও
কোনো সুমহান আবিষ্টতা
আমাকে রয়েছে ঘিরে
তার কোনো ভাগ হয় না

আমার কী আছে আর, কী দেবো তোমাকে ?
—তুমি আছো, তুমি আছো, এর চেয়ে বড় সত্য নেই !
তুমি দেবী, ইচ্ছে হয় হাঁটু গেড়ে বসি
মাথায় তোমার করতল, আশীর্বাদ…
তবু সেখানেও শেষ নেই
কবি নয়, মুহূর্তে পুরুষ হয়ে উঠি
অস্থির দু'হাত
দশ আঙুলে আঁকড়ে ধরতে চায়
সিংহিনীর মতো ঐ যে তোমার কোমর
অবোধ শিশুর মতো মুখ ঘষে তোমার শরীরে
যেন কোনো গুপ্ত সংবাদের জন্য ছটফটানি
—পুরুষ দূরত্বে যাও, কবি কাছে এসো
তোমায় কী দিতে পারি ?
—কিছু নয় !
—অভিমান ?
—নাম দাও অভিমান !
—এটা কিন্তু বেশ ! যদি
অসুখের নাম দিই নির্বাসন
না-দেখার নাম দিই অনস্তিত্ব
দূরত্বের নাম দিই অভিমান ?
—কতটুকু দূরত্ব ? কী, মনে পড়ে ?
—কী করে ভাবলে যে ভুলবো ?
—তুমি এই যে বসে আছো, আঙুলে ছোঁয়ানো থুতনি
কপালে পড়েছে চূর্ণ চুল
পাড়ের নক্সায় ঢাকা পা
ওষ্ঠাগ্রে আসন্ন হাসি—
এই দৃশ্যে অমরত্ব
তুমি তো জানো না, নীরা,
আমার মৃত্যুর পরও এই ছবি থেকে যাবে ।
—সময় কি থেমে থাকবে ? কী চাও আমার কাছে ?
—মৃত্যু ?
—ছিঃ, বলতে নেই
—তবে স্নেহ ? আমি বড় স্নেহের কাঙাল
—পাওনি কি ?

—বুঝতে পারি না ঠিক। বয়স্ক পুরুষ যদি স্নেহ চায়
শরীরও সে চায়
তার গালে গাল চেপে দিতে পারো মধুর উত্তাপ ?
—ফের পাগলামি ?
—দেখা দাও।
—আমিও তোমায় দেখতে চাই।
—না।
—কেন ?
—বোলো না। কক্ষনো বোলো না আর ঐ কথা
আমি ভয় পাবো।
এ শুধুই এক দিকের
আমি কে ? সামান্য, অতি নগণ্য, কেউ না
তবু এত স্পর্ধা করে তোমার রূপের কাছে—
—তুমি কবি ?
—তা কি মনে থাকে ? বারবার ভুলে যাই
অবুঝ পুরুষ হয়ে কৃপাপ্রার্থী
—কী চাও আমার কাছে ?
—কিছু নয়। আমার দু'চোখে যদি ধুলো পড়ে
আঁচলের ভাপ দিয়ে মুছে দেবে ?

সমালোচকের প্রতি

বারান্দায় রেলিং ধরে একটুখানি ঝুঁকে দাঁড়ালে
ইচ্ছে হয়, আরও একটু ঝুঁকি
আরও একটু, আরও একটু, এবার শরীর হালকা
এখন বাতাসচারী
এখন আমি হাওয়ার মধ্যে ভাসতে পারি—

মাটির ওপর আছড়ে পড়বো ?
আমি তো নই মাটির মানুষ।
যে উদ্বাস্তু, তার আবার কী মাটির টান হে ?
চশমা-আঁটা সমালোচক এই তো সেদিন বলে দিলেন
পায়ের তলায় মাটি নেই তো, তাই তো ওরা
ছন্নছাড়া অবিশ্বাসী !

দিনে ও রাত্রে

রাজার বাড়িতে কার খুব অসুখ
রাজবাড়ির রং কাঁচা হলুদ
রাজবাড়ির বাগানে রাধাচূড়া ফুল পড়ে আছে।

দরোয়ান, গেট খোলো।
যজুড়িগাড়ি বেরিয়ে যায়, ঘোড়ার গায়ে
পিছলে পড়ে রোদ।
রাজার মেয়ে দেরাদুনে কনভেন্টে সন্ন্যাসিনী
রাজার নিজস্ব ম্যাস্টিফ নেড়ি কুত্তার সঙ্গে
বন্ধুত্ব করে
রাজবাড়ির সিঁড়িতে ঝমঝম শব্দে গেলাস ভাঙে
দরোয়ান, গেট খোলো !
গলায় ঘণ্টা দুলিয়ে একপাল মেষ ঢুকলো
দুধ দিতে।

গভীর রাত্রির অন্ধকারে ডুবে আছে রাজবাড়ি
বিদ্যুতের মতন তীক্ষ্ণ গলায় কেউ হেসে উঠলো
কেউ মিনতি করে বললো, আমায় মুক্তি দাও
ও বাড়িতে কেউ আত্মহত্যা করে না
আমি জানি,
আমি পাশের বাড়িতেই থাকি।

স্থির সত্য

বহুদিন আকাশ ভাসানো জ্যোৎস্নায়
হেঁটে যাইনি
নদীর কিনারায়
একটি ঘাসফুল ছিঁড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিইনি স্রোতে
বহুদিন, বহুদিন—
তবু আমি জানি
এখনো কোনোদিন জ্যোৎস্নায় ভেসে যায় আকাশ
আমার জন্য প্রতীক্ষা করে
নদীর কিনারার মাটি প্রতীক্ষা করে আছে
আমার পদস্পর্শের
ঘাসফুলটি হাওয়ায় দুলছে প্রতীক্ষায়
আমি তাকে ছিঁড়ে নেবো
জলস্রোত ছলচ্ছল শব্দে আমায় ডাক পাঠাবে
এই সব স্থির সত্য নিয়ে বেঁচে আছি।

অপেক্ষা

সকালবেলা এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম একজন বৃদ্ধ আন্তর্জাতিক ফরাসীর সঙ্গে দেখা করার জন্য, যিনি নিজের শৈশবকে ঘৃণা করেন।

তিনি তখনো আসেননি, আমি একা বসে রইলাম ভি আই পি লাউঞ্জে। ঠাণ্ডা ঘর, দুটি টাটকা ডালিয়া, বর্তমান রাষ্ট্রপতির বিসদৃশ রকমের বড় ছবি। সিগারেট ধরিয়ে আমি বই খুলি। যে-কোনো বিমানের শব্দে আমার উৎকর্ণ হয়ে ওঠার দরকার নেই। বিশেষ অতিথির ঘর চিনতে ভুল হয় না। সিকিউরিটির লোক একবার এসে আমাকে দেখে যায়। আমি অ্যাশট্রের বদলে ছাই ফেলি সোফাতে গদিতে—কারণ, এতে কিছু যায় আসে না।

সময়ের মুহূর্ত, পল, অনুপল স্তব্ধ হয়ে থাকে—এক বদ্ধ
বিরাট নির্জন ঘর, আমি একা, আমার পা ছড়ানো—আকাশ
থেকে মহাকাশে ঘুরতে ঘুরতে চলে যায় স্মৃতি, তার মধ্যে একটা
সূর্যমুখী ক্রমশ প্রকাণ্ড থেকে আরও বিশাল, লক্ষ লক্ষ
সমান্তরাল আলো, যুদ্ধ-প্রতিরোধের মিছিলের মতন,
যেন অজস্র মায়াময় চোখ দংশন করে নির্জনতা, ঘুমের
মধ্যে পাশ ফেরার মতন—
একটা টেলিফোন বেজে ওঠে। আমার জন্য নয়, আমার
জন্য নয়—।

দুঃখের গল্প

একজন মানুষ শুকনো নদীর সামান্য
উচ্ছিষ্ট জলে
পা ধুচ্ছে
লোকটি এই মাত্র পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে এলো।

এই একটা দুঃখের দৃশ্য
এই একজন বিষণ্ণ মানুষ—
লাল ধুলোর ঝড় খেলা করে আকাশে
ব্রিজের ওপর ঝমঝমিয়ে চলে যায় ট্রেন
প্রকাণ্ড অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে গ্রাম-বাংলা।

আমি দেখেছি, বস্তুত স্বপ্নেই দেখেছি, সেই লোকটি
এই অবশিষ্ট নদীর
ভূতপূর্ব খেয়া পারাপারের মাঝি
সে আজ হেঁটে এই নদী পার হয়ে এসে
অপমানিত
নুয়ে আছে তার শরীর—
ঘোলাটে জলে তার মুখের কোনো ছায়া পড়ে না।

এই একটা দুঃখের দৃশ্য
এই একজন বিষণ্ণ মানুষ।
সে উঠে আসে আস্তে আস্তে
বিড়ি ধরাবার জন্য অন্য একজনের কাছে
আগুন চায়
অন্য লোকটি অবাঙমানসগোচর,
দেশলাই বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে,
কী হে কেমন ?
সে সামান্য হেসে বলে, ভালোই আছি—
তারপর কালপুরুষের দিকে ধোঁয়া ওড়ায়

এই একটা দুঃখের দৃশ্য
এই একজন বিষণ্ণ মানুষ
এখানে রয়েছে নদী-বিচ্ছেদের কাহিনী—
এর সঙ্গে আমার বা তোমার দুঃখের
কোনো তুলনাই হয় না।

ফিরে যাবো

বহুদিন স্বর্গ থেকে দূরে আছি, মনে পড়ে
পুরোনো স্বদেশ
ছিলাম বাসনা-লঘু, গ্লানিহীন রৌদ্রের উৎসবে
অমলিন ছেলেবেলা ; ঘাসের শিশিরে
ছুটোছুটি
হারানো বোতাম খুঁজে কেটে গেছে বেলা।

বহুদিন স্বর্গ থেকে দূরে আমি, মনে পড়ে
পুরোনো স্বদেশ
বৃদ্ধ নাবিকের গানে যে-রকম উদাসীন মনে হয়
প্রান্তরের ছায়া
হঠাৎ হাওয়ায় যেন শুকনো পাতা শব্দ করে,
ফিরে যাবো, ফিরে যেতে হবে
কপালের ঘাম মুছে মানুষের কাঁধে রাখি হাত !

অন্যলোক

যে লেখে, সে আমি নয়
কেন যে আমায় দোষী কর !
আমি কি নেকড়ের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে ছিঁড়েছি শৃঙ্খল ?
নদীর কিনারে তার ছেলেবেলা কেটেছিল
সে দেখেছে সংসারের গোপন ফাটল
মাংসল জলের মধ্যে তার আয়না খুঁজেছে, ভেঙেছে ।
আমি তো ইস্কুলে গেছি, বই পড়ে প্রকাশ্য রাস্তায়
একটা চাবুক পেয়ে হয়ে গেছি শূন্যতায়
ঘোড়সওয়ার ।

যে লেখে সে আমি নয়
যে লেখে সে আমি নয়
সে এখন নীরার সংশ্রবে আছে পাহাড়-শিখরে
চৌকশ বাক্যের সঙ্গে হাওয়াকেও
হারিয়ে দেয় দুরন্তপনায়
কাঙাল হতেও তার লজ্জা নেই
এবং ধ্বংসের জন্য তার এত উন্মত্ততা
দূতাবাস কর্মীকেও খুন করতে ভয় পায় না ।
সে কখনো আমার মতন বসে থাকে
টেবিলে মুখ গুঁজে ?

আমিও ছিলাম

পাঁচজনে বলে পাঁচ কথা, আমি নিজেকে এখনো চিনি না ।
চেয়েছিলাম তো সকালবেলার শুদ্ধ মানুষ হতে
দশ দিকে চেয়ে আলোর আকাশে আয়নায় মুখ দেখা
আমিও ছিলাম, আমিও ছিলাম, এই সুখে নিঃশ্বাস ।

জানি না কোথায় ভুল হয়ে যায়, ছায়া পড়ে ঘোর বনে
ঝড়ে বৃষ্টিতে পায়ে পায়ে হেঁটে যাকে মনে করি বন্ধু
সে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, চোখে অচেনা মতন ভ্রূকুটি
নেশায় রক্ত উন্মাদ হয়, তছনছ করি নারীকে
অস্তিত্বের সীমানা ছাড়িয়ে জেগে ওঠে সংহার
আঁধার সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে চোখ জ্বালা করে ওঠে।

চেয়েছিলাম তো সকালবেলার শুদ্ধ মানুষ হতে
বারবার সব ভুল হয়ে যায় এত বিপরীত স্রোত
বুকের মধ্যে প্রবল নিদাঘ, পশ্চিমে হেলে মাথা
আমিও ছিলাম, আমিও ছিলাম, কান্নার মতো শোনায়।

জীবন-স্মৃতি

—তোমার ছিল স্বপ্ন দেখার অসুখ, তুমি
আপন মনে কথা বলতে

—তোমার ছিল বিষম দুঃখ,
তুমি কখনো
নদীর পারে একলা যাওনি

—তোমার ছিল ছুরির মতন
ধারালো রাগ
হঠাৎ যেদিন হাতে তোমার কাঁটা ফুটলো
গোপাল গাছটা লণ্ডভণ্ড করেছিলে,
মনে পড়ে না ?

—শুধু কি তাই, প্রজাপতির
ডানা ছিঁড়েছি
কত খেলনা কেড়ে নিয়েছি
অন্তত তিন ডজন কাচের
বাসন ভাঙা সব মিলিয়ে

—নিষ্ঠুরতায় এখনো তুমি কম যাও না
'বিদায়' শব্দ কঠিন ভাবে
বলতে পারো
রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেই
মিলিয়ে যায় অনেক স্মৃতি

—তোমার ছিল দয়ার শরীর
সারা জীবন
ভালো না বেসে দয়া দেখালে
লাজুকতার আড়ালে এক অহঙ্কারী !

—ভালোবাসা তো পারস্পরিক
আমায় কেউ ভালোবাসেনি
ঘোর দুপুরে অভুক্ত এক
ক্লান্ত কিশোর
কেউ কি তাকে কাছে ডেকেছে ?

—তুমি অনেক রাত্রিবেলায়
সিঁড়ির মধ্যে বসে থাকতে
নিচে কিংবা ওপর দিকে
কোথায় যাবে, ঠিক জানো না ।
এটাই তোমার মূল সমস্যা
পূর্ণিমায় বা অমাবস্যায়
পথ খুঁজতে ভুল হয়ে যায় ।
সেই নদীটা খুঁজতে খুঁজতে
মনের ভুল
গভীর বনে ঢুকে পড়লে ।

—গভীর এবং অন্ধকারও, সেই অরণ্য
শিবের বিশাল জটার মতন
নদীও তাতে

হারিয়ে যায়
নির্জনতার উদাসী রব জ্বালা ধরায়
বুকের মধ্যে
উচ্চাকাঙ্ক্ষা নতজানু।

—একলা রাস্তা পাওনি বলেই
গিয়েছিল না
দলে-মিছিলে ?

—আইসক্রিমের কাঠির মতন
আবার আমি
পরিত্যক্ত !

—এটাও একটা বিলাসিতা নিজেও জানো
তুমিও বুঝি বিলাসী নও
যেমন, তোমার স্বপ্ন দেখা ?

—সর্বনাশ ও স্মৃতির দুঃখ
স্বপ্ন এখন এসব দেখায় !
নারীর কাছে গিয়েছিলাম
আঁচড়ে কামড়ে রক্ত পাগল
ভালোবাসার দুঃখ ছাড়াও
সর্বনাশের গাঢ় মহিমা
এর থেকে কেউ দূরে যায় কি ?

—এক এক সময় নেশার মতন
দূরের দিকে চোখ ঠেকে যায়
দূরত্বকে শান্তি বলে মানতে হঠাৎ ইচ্ছে করে

—যেমন দূর ছেলেবেলার
দুঃখগুলোও মধুর, যেমন
অন্ধকারে আত্মগ্লানি লুকিয়ে ফের
বাইরে এসে মনে হয় না, চমৎকার
এই বেঁচে থাকা ?

সেই সব স্বপ্ন

কারাগারের ভিতরে পড়েছিল জ্যোৎস্না
বাইরে হাওয়া, বিষম হাওয়া, সেই হাওয়ায়
নশ্বরতার গন্ধ
তবু ফাঁসির আগে দীনেশ গুপ্ত চিঠি লিখেছিল
তার বউদিকে :
"আমি অমর, আমাকে মারিবার সাধ্য কাহারো নাই !"

মধ্যরাত্রি, আর বেশী দেরী নেই
প্রহরের ঘণ্টা বাজে, সান্ত্রীও ক্লান্ত হয়
শিয়রের কাছে এসে মৃত্যুও বিমর্ষ বোধ করে
কণ্ডেম্‌ন্‌ড সেলে বসে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য লিখছে :
"মা, তোমার প্রদ্যোৎ কি কখনো মরতে পারে ?
আজ চারদিকে চেয়ে দ্যাখো
লক্ষ 'প্রদ্যোৎ' তোমার দিকে চেয়ে হাসছে—
আমি বেঁচেই রইলাম মা, অক্ষয়..."

কেউ জানতো না সে কোথায়
বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ছেলেটি, আর ফেরেনি
জানা গেল, দেশকে ভালোবাসার জন্য সে পেয়েছে
মৃত্যুদণ্ড
শেষ মুহূর্তের আগে পোস্টকার্ডে ভবানী ভটচায
অতি দ্রুত লিখেছিল ছোট ভাইকে :
"অমাবস্যার শ্মশানে ভীরু ভয় পায়—
সাধক সেখানে সিদ্ধিলাভ করে
আজ আমি বেশী কথা লিখবো না
শুধু ভাববো, মৃত্যু কত সুন্দর ।"
লোহার শিকের ওপর হাত
তিনি তাকিয়ে আছেন অন্ধকারের দিকে
দৃষ্টি ভেদ করে যায় দেয়াল, অন্ধকারও
বাঙ্ময় হয়
সূর্য সেন পাঠালেন তাঁর শেষ বাণী :
"আমি তোমাদের জন্য কী রেখে গেলাম ?

শুধু একটি মাত্র জিনিস,
আমার স্বপ্ন—
একটি সোনালি স্বপ্ন
এক শুভ মুহূর্তে আমি প্রথম এই স্বপ্ন দেখেছিলাম !"

সেই সব স্বপ্ন এখনও বাতাসে উড়ে বেড়ায়,
শোনা যায় নিশ্বাসের শব্দ
আর সব মরে, স্বপ্ন মরে না—
অমরত্বের অন্য নাম হয়
কানু,সন্তোষ, অসীমরা জেলখানার নির্মম অন্ধকারে বসে
এখনও সেরকম স্বপ্ন দেখছে ।

কবির দুঃখ

শব্দ তার প্রতিবিম্ব আমাকে দেখাবে বলেছিল
শব্দ তার প্রতিবিম্ব আমাকে দেখাবে বলেছিল
গোপনে
শব্দ তার প্রতিবিম্ব আমাকে দেখাবে বলেছিল ।

শব্দ ভেঙে গেলে যেন শৃঙ্খলের মতো শব্দ হয়
পাহাড়ের চূড়া থেকে খসে পড়া রূপালি পাতার মতো
সন্ধ্যায় সূর্যকে দীপ্ত দেখে
লক্ষ বৎসরের পর এক মুহূর্তের জন্য দুর্লভ স্বরাজ
বুকের ভিতর যেন তোমার মুখের মতো প্রতিবিম্ব শিল্পে ঝলসে ওঠে
মনে হয়
সমস্ত শিল্পের সার তোমার ও মুখের বর্ণনা
সমস্ত শিল্পের সার তোমার ও মুখের বর্ণনা
কালহীন, বর্ণহীন
প্রতিশব্দহীন

আমি সূর্যকরোজ্জ্বল হ্রদের কিনারে তবু ভালেরির মতো
পাইনি প্রার্থিত শব্দ, উদ্ভাসিত প্রতিবিম্ব, যদিও আমাকে
প্রেম তার প্রতিমূর্তি গোপনে দেখাবে বলেছিল ।

পদ্মায় পুনর্বার

এইমাত্র এসে ভিড়লো ফেরী জাহাজ। কী সৌভাগ্য আমার, রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়াবার জায়গা পেলুম।

নদীর ওপার নেই, মধ্যিখানে চড়া রোদ্দুর রং-এর এক ঝাঁক পাখির লুটোপুটি। আকাশের নীল রেখা ভেদ করে উড়ে গেল বিমান, জল আলোড়িত হলো, ছাড়লো ফেরী।

যে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে একটি বালকের পঁচিশ বছর পরের চেহারা। সে শৈশব ও মধ্য যৌবনের দু'রকম চোখ নিয়ে দেখছে নদী। যেন সব কিছুই চেনা, অথচ মানুষটিকে কেউ চেনে না।

বিস্ময়বোধের পাশে এসে দাঁড়াল বুদ্ধি, বেদনাকে সান্ত্বনা দেয় যুক্তি, দীর্ঘশ্বাসকে উড়িয়ে নিয়ে যায় হু-হু হাওয়া, নদীর জলে হালকা মেঘের ছায়া পড়ে।

হে নদী কীর্তিনাশা, তোমার শান্ত গভীরতায় উন্মোচিত হয় ছদ্মবেশ। গোয়ালন্দ ভেঙে তুমি ছুঁয়েছো ফরিদপুর। মানুষ আসে যায়, নদী পার হয়, বাতাস উড়িয়ে ভেসে যায় নৌকোর সারি, সময় এদের সবাইকে চিহ্ন দিয়ে গেছে।

শৈশব ও মধ্য যৌবন সম্মিলিত করে আমি বিপুল জলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ নাকে এলো মুর্গী রান্নার গন্ধ, তৎক্ষণাৎ সেইদিকে···

শূন্য ট্রেন

ট্রেনের জানলায় মুখ, ঐ মুখ হলুদ আলোর মতো ফিরে আসে
মধ্যরাতে একা
এখন সন্ধ্যার রোদ ফসলের ক্ষেতের ওপাশে
বিষণ্ণ বাদামী :
প্রান্তর ফুরিয়ে গেলে ট্রেন থামে, তবু আরও আছে
মহাশূন্যে সদ্যলব্ধ বিষম এলাকা।—
ধানের বুকের কাঁচা দুধ দেখে প্রীত মনে আমি
ধরিত্রীকে সুস্থ জেনে চলে যাব প্রাণহন্ত্রী নীলিমার কাছে,

প্রচণ্ড হুইস্‌ল্ শুনি বারবার মধ্যরাতে একা।

বাগানের ফলগুলি ঝরে যায় বিনম্র জ্যোৎস্নায় শোকহীন
প্রতিদিন সন্ধ্যার বাগানে,
তবুও আমায় কেন চোর বলে প্রত্যেক শরিক !
এ পৃথিবী ভরে গেছে ক্লান্তিকর মনীষায়, সাফল্যের গানে
বিশাল গর্জনে ভেঙে জানলার শিক
সভ্যতার জয়ধ্বনি কর্ণে পশে, কে হে তোমরা ধৃষ্ট চোখে
দেখাও তর্জনী
প্রত্যহ সঙ্গম বিনা ঘুম আসে না, শোনো সু-শরীর, পীনস্তনী
রমণী দুর্লভ বড়, শিয়রের অন্ধকারে কয়েকটি রঙিন
ফুল রেখে দিতে চাই, সামান্য শৌখিন, ওরা মুছে নিতে জানে
শরীরের দুর্গন্ধ, কুরূপ, ওরা ঝরে থাকে সন্ধ্যার বাগানে
বিনম্র জ্যোৎস্নায় শোকহীন ।

বুকের ভিতরে শুয়ে বুক দেখি না, এত আলো, চোখ ভেসে যায়
চক্ষু অন্ধ করে দিলে ধন্য হয় অন্ধকার দেখা
নগরীর সব লোক ছুটেছে অগণ্য শোকসভায় ;
শুধু আমি ফুলচোর-নীলিমায় কৌমার্য-হরণ রক্ত মেখে শুয়ে আছি
শীতের অত্যন্ত কাছাকাছি,—
শূন্য, ভয়ংকর ট্রেন ফিরে আসে মধ্যরাতে একা ।

তুমি যেই এসে দাঁড়ালে

তুমি জেনেছিলে মানুষে মানুষে
হাত ছুঁয়ে বলে বন্ধু
তুমি জেনেছিলে মানুষে মানুষে
মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়
হাসি বিনিময় করে চলে যায়
উত্তরে দক্ষিণে
তুমি যেই এসে দাঁড়ালে—
কেউ চিনলো না কেউ দেখলো না
সবাই সবার অচেনা !

মৃতের উপদ্রব

কবিতা লেখার খাতা কখনো ভয়ের মতো শব্দ করে
মুখের সামনে আসে অপর কবির মুখ
এই বৃষ্টি, এই নির্জনতা, এই বিকেলবেলায় শুয়ে থাকা
অপর কবির চোখ দিয়ে দেখা হয়
অপর কবির মতো শব্দ আসে, শব্দগুলি বিদেশী নির্দেশে
সারিবদ্ধ হয়
কবিতার মতো যেন হয়ে ওঠে, নিশ্চয়ই কবিতা, কার ?
আমার অনভিপ্রেত হাতে খেলা করে যেন আমার অসহায়তা ।

অর্ধেক শতাব্দী আগে মৃত কবি, সহসা বিকেলবেলা
আমার নিঃসঙ্গ জাগা, আমার বৃষ্টির দিকে চেয়ে থাকা—চুরি করে
আমার শব্দ ও বাক্য কেড়ে নেয়, তার বুক ভাঙা দুঃখ, অসমাপ্ত শ্বাস,
বাণী সন্ধানের ব্যাকুলতা—
আমার পেন্সিল ছুঁয়ে পাখা ঝাপটায়, আমি ভয় পাই
আমি খাতা বন্ধ রেখে চোখ বুজে ভয় ভোগ করি ।

এখন নারীর কাছে গেলে আমি স্পষ্ট দেখতে পাবো
নারীর দু'বাহু চেপে চুম্বনে নিরত আছে
অর্ধেক শতাব্দী আগে মৃত এক কবি ।

পাহাড় চূড়ায়

অনেকদিন থেকেই আমার একটা পাহাড় কেনার শখ । কিন্তু পাহাড় কে বিক্রি করে তা জানি না । যদি তার দেখা পেতাম, দামের জন্য আটকাতো না । আমার নিজস্ব একটা নদী আছে, সেটা দিয়ে দিতাম পাহাড়টার বদলে । কে না জানে, পাহাড়ের চেয়ে নদীর দামই বেশী । পাহাড় স্থাণু, নদী বহমান । তবু আমি নদীর বদলে পাহাড়টাই কিনতাম । কারণ, আমি ঠকতে চাই ।

নদীটাও অবশ্য কিনেছিলাম একটা দ্বীপের বদলে। ছেলেবেলায় আমার বেশ ছোট্টোখাট্টো, ছিমছাম একটা দ্বীপ ছিল। সেখানে অসংখ্য প্রজাপতি। শৈশবে দ্বীপটি ছিল বড় প্রিয়।

আমার যৌবনে দ্বীপটি আমার আমার কাছে মাপে ছোট লাগলো। প্রবহমান ছিপছিপে তন্বী নদীটি বেশ পছন্দ হলো আমার। বন্ধুরা বললো, ঐটুকু একটা দ্বীপের বিনিময়ে এতবড় একটা নদী পেয়েছিস? খুব জিতেছিস তো মাইরি! তখন জয়ের আনন্দে আমি বিহ্বল হতাম। তখন সত্যিই আমি ভালোবাসতাম নদীটিকে।

নদী আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিত। যেমন, বলো তো, আজ সন্ধেবেলা বৃষ্টি হবে কিনা?

সে বলতো, আজ এখানে দক্ষিণ গরম হাওয়া। শুধু একটি ছোট্ট দ্বীপে বৃষ্টি, সে কী প্রবল বৃষ্টি, যেন একটা উৎসব!

আমি সেই দ্বীপে আর যেতে পারি না, সে জানতো! সবাই জানে। শৈশবে আর ফেরা যায় না।

এখন আমি একটা পাহাড় কিনতে চাই। সেই পাহাড়ের পায়ের কাছে থাকবে গহন অরণ্য, আমি সেই অরণ্য পার হয়ে যাবো, তারপর শুধু রুক্ষ কঠিন পাহাড়। একেবারে চূড়ায়, মাথার খুব কাছে আকাশ, নিচে বিপুলা পৃথিবী, চরাচরে তীব্র নির্জনতা। আমার কণ্ঠস্বর সেখানে কেউ শুনতে পাবে না। আমি ঈশ্বর মানি না, তিনি আমার মাথার কাছে ঝুঁকে দাঁড়াবেন না। আমি শুধু দশ দিককে উদ্দেশ্য করে বলবো, প্রত্যেক মানুষই অহঙ্কারী, এখানে আমি একা—এখানে আমার কোনো অহঙ্কার নেই। এখানে জয়ী হবার বদলে ক্ষমা চাইতে ভালো লাগে। হে দশ দিক, আমি কোনো দোষ করিনি। আমাকে ক্ষমা করো।

চেনার মুহূর্ত

বহু অর্চনা করেছি তোমায়, এখন ইচ্ছে
টেনে চোখ মারি
হে বীণাবাদিনী, তুমিও তো নারী, ক্ষমা করো এই
বাক-ব্যবহার

তুমি ছাড়া আর এমন কে আছে, যার কাছে আমি
দাস্য মেনেছি
এবার আমাকে প্রশ্রয় দাও, একবার আমি
ছিলা টান করি।

একবার এই পাংশুবেলায় তুমি হয়ে ওঠো
শরীরী প্রতিমা
অনেক দেখেছি দুনিয়া বাহার, এবার ফুঁ দিয়ে
নেভাই গরিমা
হলুদকে বলা রক্তিম হতে—ভাষাভ্রান্তির
এই উপহাস
মানুষকে বড় বিমূঢ় করেছে, এবার অস্ত্র
দুঃখদহন।

জানি না কোথায় পড়েছিল বীজ, পৃথিবীতে এত
ভুল অরণ্য
দুঃখ সুখের খেলায় দেখেছি বারবার আসে
প্রগাঢ় তামস
তোমার রূপের মায়াবী বিভায় একবার জ্বালো
ক্ষণ-বিদ্যুৎ
চোখ যেন আর চিনতে ভোলে না, তুমি জানো আমি
কত অসহায়।

সখী, আমার

সখী, আমার তৃষ্ণা বড় বেশী, আমায় ভুল বুঝবে ?
শরীর ছেনে আশ মেটে না, চক্ষু ছুঁয়ে আশ মেটে না
তোমার বুকে ওষ্ঠ রেখেও বুক জ্বলে যায়, বুক জ্বলে যায়
যেন আমার ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, যেন আমার
দিঘির পাড়ে বুকের সঙ্গে দেখা হলো না !

সখী, আমার পায়ের তলায় সর্ষে, আমি
বাধ্য হয়েই ভ্রমণকারী
আমায় কেউ দ্বার খোলে না, আমার দিকে চোখ তোলে না
হাতের তালু জ্বালা ধরায়, শপথগুলি ভুল করেছি
ভুল করেছি
মুহুর্মুহু স্বপ্ন ভাঙে, স্বপ্নে আমার ফিরে যাওয়ার
কথা ছিল, স্বপ্নে আমার স্নান হলো না।

সখী, আমার চক্ষুদুটি বর্ণকানা, দিনের আলোয়
জ্যোৎস্না ধাঁধা
ভালোবাসায় রক্ত দেখি, রক্ত নেশায় ভ্রমণ দেখি
সুখের মধ্যে নদীর চড়া, শুকনো বালি হা হা তৃষ্ণা
হা হা তৃষ্ণা
কীর্তি ভেবে ঝড়ের মুষ্টি ধরতে গেলাম, যেন আমার
ফিরে যাওয়ার কথা ছিল, যেন আমার
স্বরূপ দেখা শেষ হলো না।

মিথ্যে নয়

হঠাৎ দূর থেকে একটা আকস্মিক ডাক আসে
ভুলে ছিলাম
দপ করে জ্বলে ওঠে অন্ধকার আকাশে উল্কা
ব্যগ্র কণ্ঠে বারবার জিজ্ঞেস করি, তুমি ?
তুমি ? তুমি ?
দূরের অস্পষ্ট স্বর মৃদু হাস্যে বলে,
চিনতে পারোনি ?
উদ্‌ভ্রান্তের মতন আমি এদিক ওদিক তাকাই
মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে
এই সময় কোন কথাটা বললে মানায় ?

বলবো কি, সারা জীবন তোমার ডাকের
প্রতীক্ষায় আছি
প্রতিটি মুহূর্ত, সব সময়—
যদিও কত কাজের মধ্যে ডুবে আছি—
শরীরে মালিন্যের সর পড়ে
কত ক্ষুদ্রতা নীচতার মধ্য দিয়ে সাঁতার কেটে
যেতে হয়
এই মুহূর্তে ঐ কথাটা হয়তো মিথ্যে শোনাবে
অথচ মিথ্যে যে নয়, কী করে বোঝাবো ?

হেমন্তে বর্ষায় আমি

হেমন্তে বর্ষায় আমি ঝরে গেছি
শিশির ছুঁয়েছে চোখ নদী-প্রাণ প্রান্তরের কাছে
জঙ্ঘার তিলের মতো আবিষ্কার অন্ধকারে মিলে মিশে যায়
হেমন্তে বর্ষায় আমি ঝরে গেছি
ঘুমন্ত মুখের কাছে উড়ে উড়ে পড়ে বাঁশ পাতা
হেমন্তে বর্ষায় আমি ঝরে গেছি ।

কী আদর ছিল এই মেঘ ও রৌদ্রের নিচু খেলা ও খেলার মতো ফুলের তৃণের
পালকের তরবারি কেটেছিল জলের সীমানা
আমার দুঃখের কাছে বাদল-পোকার মতো
তারা সব ছুটে এসেছিল
হেমন্তে বর্ষায় আমি ঝরে গেছি

হেমন্তে বর্ষায় আমি দীর্ঘ পথ পতনে উত্থানে
বাতাসের লণ্ডভণ্ড দুনিয়ায় মিশিয়েছি
নুনের লাবণ্য
অস্থির শিরীষ গাছে প্রজাপতি বসে, উড়ে যায়
হারানো বন্ধুর মুখ ওরকম
হেমন্তে বর্ষায় আমি ঝরে গেছি ।

বঞ্চনা

সিংহদ্বার খুলে গেছে, ভেতরে দেখি শুধুই শূন্যতা
হা হা করছে অন্ধকার
কেউ নেই, কোনো রহস্যও না
যেন বালক বয়েসের হাওয়া ঘুরে যায়
দু' একটা শুকনো পাতার শব্দ—
কেউ নেই ? আমি চেঁচিয়ে উঠি
প্রতিধ্বনি আসে, কেউ নেই, নেই, নেই—
আমার তীব্র অভিমান হয়
এ কি এক ধরনের বঞ্চনা নয় ?
যদি কেউ না থাকবে, তবে দ্বার কেন বন্ধ ছিল ?
কেন প্রতীক্ষায় ছিলাম এতদিন !

চোখ ঢেকে

যে-যেমন জীবন কাটায়
তার ঠিক সেই রকম এক-একটি পোশাক রয়েছে
আলো ও হাওয়ার মধ্যে লুটোপুটি খেয়ে কে যে
আনন্দ-ভিখারী
উড়ুনি ভিজিয়ে সেও বিধ্বংসী নদীর থেকে
শান্তি চেয়েছিল
সহসা বিদ্যুৎ-স্পর্শে চোখ ঢেকে আমিও একদা
অচেনা প্রান্তরে একা ছন্নছাড়া, সমূলে দেখেছি
দিগম্বর মৃত্যু স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কত দূরে ?

ভোরবেলায় বৃষ্টি একজন সাক্ষী চেয়েছিল, তাই আমি হঠাৎ ঘুম ভেঙে বাইরে আসি। বারান্দায় সামনেই ব্রীজ, একটাও মানুষ নেই, মাথার মধ্যে নেশার মতন বৃষ্টির শব্দ, দূরে ছানার জলের মতন হালকা নীল আলো।

এই যে দৃশ্য, আমি কি এর যোগ্য ? পৃথিবীতে জন্মেছি বলেই কি আমি সুন্দরের অংশভাগ পাবার অধিকারী ? আলো, হাওয়া, অন্ধকার এবং নারীর জন্য নিরন্তর এক জুয়াখেলা চলছে, ক্রমশ সবাই দূরে চলে যায়, এক বিকল টেলিফোনে বারবার আমি ডাকাডাকি করেছি। কেউ জানলো না বিচ্ছেদের আগে ছিল কতখানি ব্যাকুলতা।

আমার মুখে জলের ঝাপটা লাগে, এখন আমি কাঁদতে পারি, আমার যাবতীয় দুঃখ ও ক্ষমাপ্রার্থনা এই মানবহীন প্রত্যূষে সূক্ষ্ম বৃষ্টির সামনে। একটা হারিয়ে যাওয়া ছবি, এই রকম বারান্দার সামনে ব্রীজ, ভোরের বর্ষণ, দূর আকাশের গায়ে আঁকা বৃক্ষ, যেন আগে কোথাও ছিল, এখন নেই, আমি ঝুলে আছি শূন্যে। কিংবা আমার ঘুম ভাঙেনি, কেউ ক্ষমা চায়নি।

হাত দিয়ে স্পর্শ করি জল। আমাকে যেতে হবে। আর কত দূরে ? আর কত দূরে ?

স্বপ্ন নয়

সুগন্ধ নারীর পাশে শুয়ে থাকা স্বপ্ন নয়
বাইরে বর্ষার কলরোল
কানের লতির পাশে ঠোঁট এনে
পুরোনো কাব্যের পঙ্‌ক্তি বলাবলি হলো
স্বপ্ন নয়
বাইরে ক্ষুধা ও মৃত্যু চোখাচোখি করে
হাতের আঙুল নিয়ে খেলা,
দুরন্ত আঙুল কভু
ছুঁয়ে দেয় স্তন,
স্বপ্ন নয়
বাইরে দুঃখের মতো মিহিন বাতাস—

জীবন এমন ছিল, আজো নেই তোমার আমার ?
ভুলে থাকি বহু শোক, ছড়ানো কুন্তলে যত অন্ধকার
স্বপ্ন নয়
বাইরে যখনই আসি, বহু মিথ্যে প্রিয় সঙ্গী হয় ।

স্বপ্নের অন্তর্গত

কারুর আসার কথা ছিল না
কেউ আসেনি
তবু কেন মন খারাপ হয় ?

যে-কোনো শব্দ শুনেই
বাইরে উঠে যাই
কেউ নেই—
অদ্ভুত নির্জন হয়ে পৃথিবী
শুয়ে আছে
ঘুম ভাঙার ঠিক আগের মুহূর্তের
স্বপ্নে
আমিও যেন সেই স্বপ্নের
অন্তর্গত ।

তুমি যেখানেই যাও

তুমি যেখানেই যাও
আমি সঙ্গে আছি
মন্দিরের পাশে তুমি শোনোনি নিশ্বাস ?

লঘু মরালীর মতো হাওয়া উড়ে যায়
জ্যোৎস্না রাতে
নক্ষত্রেরা স্থান বদলায়
ভ্রমণকারিণী হয়ে তুমি গেলে কার্শিয়াং
অন্য এক পদশব্দ
পেছনে শোনোনি ?
তোমার গালের পাশে ফুঁ দিয়ে কে সরিয়েছে
চূর্ণ অলক ?

তুমি সাহসিনী,
তুমি সব জানলা খুলে রাখো
মধ্যরাত্রে দর্পণের সামনে তুমি—
এক হাতে চিরুনি
রাত্রিবাস পরা এক স্থির চিত্র
যে-রকম বতিচেল্লি এঁকেছেন ;
ঝিল্লির আড়াল থেকে
আমি দেখি
তোমার সুঠাম তনু
ওষ্ঠের উদাস-লেখা
স্তনদ্বয়ে ক্ষীণ ওঠা নামা
ভিখারী বা চোর কিংবা প্রেত নয়
সারা রাত
আমি থাকি তোমার প্রহরী ।
তোমাকে যখন দেখি, তার চেয়ে বেশী দেখি
যখন দেখি না
শুকনো ফুলের মালা যে-রকম বলে দেয়
সে এসেছে
চড়ুই পাখিরা জানে
আমি কার প্রতীক্ষায় বসে আছি
এলাচের দানা জানে
কার ঠোঁট গন্ধময় হবে—
তুমি ব্যস্ত, তুমি একা, তুমি অন্তরাল ভালোবাসো
সন্ন্যাসীর মতো হাহাকার করে উঠি
দেখা দাও, দেখা দাও

পরমুহূর্তেই ফের চোখ মুছি,
হেসে বলি,
তুমি যেখানেই যাও, আমি সঙ্গে আছি।

ওরা

তারও তো যাবার কথা ছিল, যে রইলো
অন্ধকারে একা একা শুয়ে

সে হাত বাড়িয়ে দিল
হাওয়ায় উড়িয়ে নিল শব্দ
দিগন্তে লুকিয়ে গেল আলো
তারও তো যাবার কথা ছিল।

পিপুল গাছের নিচে উইঢিপি
তার পাশে পড়ে আছে ভাঙা শালিকের
ডিম, পিঁপড়েরা এসে গেছে
ঝিম অন্ধকারে এক পুকুরের পাড়ে
দু'পায়ের কাদা ধুচ্ছে একলা রমণী
কালো জল, কালো রাত্রি, কালো দুটি চোখ
লেবুবাগানের থেকে জোনাকিরা উড়ে এসে
রেখাচিত্র আঁকে
সেই প্রশ্ন : তোমারও যাবার কথা ছিল ?

জাগরণ হেমবর্ণ

জাগরণ হেমবর্ণ, তুমি ওকে সন্ধ্যায় জাগাও
আরও কাছে যাও
ও কেন হিংসার মতো শুয়ে আছে যখন পৃথিবী খুব
শৈশবের মতো প্রিয় হলো
জল কণা-মেশা হাওয়া এখন এ আশ্বিনের প্রথম সোপানে
বারবার হাতছানি দিয়ে ডেকে যায়
আরও কাছে যাও
জাগরণ হেমবর্ণ, তুমি ওকে সন্ধ্যায় জাগাও ।

মধু-বিহ্বলেরা কাল রাত্রিকে খেলার মাঠ করেছিল
ঘাসের শিশিরে তার খণ্ডচিহ্ন
ট্রেনের শব্দের মতো দিন এলে সব মুছে যায়
চশমা-পরা গয়লানী হাই তোলে দুধের গুমটিতে
নিথর আলোর মধ্যে
কাক শালিকের চক্ষু শান
রোদ্দুরের বেলা বাড়ে, এত স্বচ্ছ
নিজেকে দেখে না
আর খেলা নেই
ও কেন স্বপ্নের মধ্যে রয়ে যায়
শরীরে বৃষ্টির মতো মোহ
আরও কাছে যাও

জাগরণ হেমবর্ণ, তুমি ওকে সন্ধ্যায় জাগাও ।

লোকটা

রেল লাইনে মাথা পেয়ে শুয়ে আছে যে লোকটা
সে বিশ্ব শান্তির জন্য চিন্তা করেনি
সে এসেছে অনেক দূর থেকে
অন্ধকার মাঠের মধ্যে বারবার হোঁচট খেতে খেতে
সে একজন কষ্টসহিষ্ণু মানুষ
অনেক অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া তার মুখ
সে জীবনটা নিয়ে বিলাসিতা করতে জানে না
রেল লাইনে মাথা দিয়ে শুয়ে লোকটা কাঁদছে
তোমরা দেখো
যে যেখানে আছো, সব কাজ থামাও
সব-রকম ব্যস্ততা থেকে
হাত তুলে নাও এক পলকের জন্য
দেখো, রেল লাইনে মাথা দিয়ে কাঁদছে একজন মানুষ
সে কোনো কবিকে প্রেরণা দিতে চায় না
আসছে ট্রেন, শব্দ, আলো ক্রমে ক্ষীণ বিন্দু থেকে
উজ্জ্বল, গোল, চোখ ধাঁধানো
শব্দ কী নিদারুণ, কানে তালা লাগিয়ে দেয়
জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে একটা মুহূর্ত
এক ফোঁটা চোখের জল
ট্রেন লোকটার দেহ থেঁতলে দিয়ে গেল
রক্ত ছিটকে যায় চতুর্দিকে, তবু
এও যেন মৃত্যুর শিল্প-গরিমা
ও বেঁচে থাকলে আমরা ওকে লক্ষও করতাম না।

সাক্ষী

হাতে লেগেছিল হাত, কেউ তো দেখেনি ?
একটি শালিক দেখেছিল
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তার ওষ্ঠ ছুঁই
দেখেনি তো কেউ ?
কাগজের টুকরো একটা উড়ে যায়

নদীর কিনারে তার চোখে চোখ রেখে
বিনিময় হয়ে যায় সব দুঃখ
আর কেউ জানে না
হঠাৎ উঠলো বেজে স্টিমারের ভোঁ ।

অভিশাপ

তুমি তো আনন্দে আছো, তোমার আনন্দ অন্যবর্ণ
নিরন্তর পাশা খেলা, মাঝে মাঝে শোনা যায় হাসি
তোমাকে দেখে না কেউ, এত গুপ্ত, অন্তরীক্ষবাসী
মনে হয় ।
প্রতিটি জয়ের পর আবার নতুন খেলা
এত বেশী লোভ ?
তুমি হেরে যাবে, তুমি ঠিক হেরে যাবে ।

দুঃখকে চেনো না তুমি, তোমার দুঃখের অন্যবর্ণ
মানুষকে ছোট করে, মানুষকে পিঁপড়ে করে মারো
দুর্দিনের সওদাগর, সিন্দুকের মধ্যে তুমি ভরে রাখো
হাজার অসুখ ।
দ্রব্য থেকে কেড়ে নাও দ্রব্যগুণ
এত বেশী লোভ ?
আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি হেরে যাবে ।

বয়েস

আমার নাকি বয়েস বাড়ছে ? হাসতে হাসতে এই কথাটা
স্নানের আগে বাথরুমে যে ক'বার বললুম !
এমন ঘোর একলা জায়গায় দু-পাক নাচলেও
ক্ষতি নেই তো—
ব্যায়াম করে রোগা হবো, সরু ঘেরের প্যান্ট পরবো ?
হাসতে হাসতে দম ফেটে যায়, বিকেলবেলায়
নীরার কাছে
বলি, আমার বয়েস বাড়ছে, শুনেছো তো ? ছাপা হয়েছে !
সত্যি সত্যি বুকের লোম, জুলপি, দাড়ি কাঁচায় পাকা—
এই যে দ্যাখো, চেয়ে দ্যাখো
দেখে সবাই বলবে না কি, ছেলেটা কই, ও তো লোকটা !
এ সব খুব শক্ত ম্যাজিক, ছেলে কীভাবে লোক হয়ে যায়
লোকেরা ফের বুড়ো হবেই এবং মরবে
আমিও মরবো
আরও খানিকটা ভালোবেসে, আরও কয়েকটা পদ্য লিখে
আমিও ঠিক মরে যাবো,
কী, তাই না ?
ঘুরতে ঘুরতে কোথায় এলুম, এ-জায়গাটা এত অচেনা
আমার ছিল বিশাল রাজ্য, তার বাইরেও এত অসীম
শরীরময় গান-বাজনা, পলক ফেলতেও মায়া জাগে
এই ভ্রমণটা বেশ লাগলো, কম কিছু তো দেখা হলো না
অন্ধকারও মধুর লাগে, তোমার হাতটা দাও তো
সুগন্ধ নিই !

নীরা, শুধু তোমার কাছে এসেই বুঝি
সময় আজো থেমে আছে ।

এখন

এখন সময় ভরা বাবলা-কাঁটা
ভালো করে না এসেই চলে যায় শীত
এখন তারার দেশে যুক্তি তর্কে ঝড় ওঠে
এইভাবে কেটে যায় দিন ।

এখন কারুর কোনো ঋণ নেই
চণ্ডালেও হাতে পরে ঘড়ি
কাকেদের শোকসভা অকস্মাৎ ভেঙে যায়
গৃহ ভাঙে, তৈরি হয় বাড়ি ।

মেয়েদের ডাক নাম সকলেই জানে
একদা শিল্পের নাম ছিল বুঝি মোহ
বৃষ্টির ভিতরে কেউ শিল্প হয়ে হেঁটে যায়
কালো চশমা চক্ষুলজ্জা ঢাকে ।

বাতাসে সৌরভ ছিল, ধুলো ছিল
একা অনুতপ্ত মুখে বসেছি সিঁড়িতে
কোথাও যাবার কথা ছিল, যাওয়া হয়নি
এখন রাত্রিতে সব বদলে গেছে ।

অমেয় ভাণ্ডার থেকে নিতে পারি
যা নেই বা কখনো ছিল না
হীরের কুচির মতো পড়ে আছে দুঃখ, স্মৃতি
কিছু তো দেবারও থাকে, এই নাও ।

কাব্যপরিচয়

একা এবং কয়েকজন

পৌষ ১৩৬৪ সালে সাহিত্য প্রকাশক (২২ শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলকাতা ৪) থেকে প্রকাশ করেন সমীর রায়চৌধুরী। কবিতার সংখ্যা ৪৮, দাম ২ টাকা, পৃষ্ঠা ৬৪, বোর্ড বাঁধাই। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। 'আমার প্রিয় কবিদের প্রতি' উৎসর্গীকৃত। পরে (আষাঢ়, ১৩৮১) সম্পূর্ণ বইটি বিশ্ববাণী প্রকাশনীর 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ' সংকলনে প্রকাশিত হয়। বইটির পুনর্মুদ্রণ হয়নি।

আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি

মধ্যচৈত্র ১৩৭২-এ কৃত্তিবাস প্রকাশনী (৩২/২ যোগীপাড়া রোড, কলকাতা ২৮) থেকে প্রকাশ করেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। ৭১টি কবিতার এই বই উৎসর্গ করা হয় 'সমীর রায়চৌধুরী-কে'। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯৬, বোর্ড বাঁধাই, দাম ৩ টাকা ৫০ প। প্রচ্ছদশিল্পীর নাম উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় সংস্করণ 'নতুন (বি) সংস্করণ' হিসাবে প্রকাশিত হয় বিশ্ববাণী প্রকাশনী থেকে, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯-এ। এই সংস্করণটিতেও প্রচ্ছদশিল্পীর নাম নেই। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৯০। দাম ৫ টাকা। প্রথম সংস্করণে একটি ছোট ভূমিকা ছিল, সেটি দ্বিতীয় সংস্করণেও ছাপা হয়। ভূমিকাটি এই: অনেক কবিতার কপি হারিয়ে গেছে। আট বছর আগে বেরিয়েছিল আমার প্রথম কবিতার বই। তার পর ছাপা যতগুলি কবিতার কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, সেগুলি টেবিলের উপর নিয়ে বসেছিলাম। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ওষ্ঠাধর সঙ্কুচিত করে পড়তে হয় নিজের পুরনো কবিতা। যেগুলি পছন্দ হয় না ও শরীর রি-রি করে, সেগুলি মাটিতে ফেলে দিই। ক্রমে আমার ঘরময় বিবর্ণ কাগজ উড়তে থাকে, ঘরের মেঝেতে ও হাওয়ায় ব্যর্থ কবিতা ছড়িয়ে যায়। টেবিলে যখন আর তিন-চারটি মাত্র বাকি, তখন থেমে যাই, খুব ক্লান্ত ও অসহায় লাগে, অবশ ভয় হয়, এত বেশি ব্যর্থতায় নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ জাগে। কেউ দেখছে না এই জেনে, পরাজিত ভঙ্গিতে, ঘাড় হেঁট করে মাটি থেকে আবার অনেকগুলি কাগজ তুলে আনি।

জানি, যে-কবিতা আমি লিখতে চাই, এখনো তার মর্ম স্পর্শ করতে পারিনি। আমি কবিতায় সত্যি কথা লিখতে গিয়ে দেখেছি, পৃথিবীর সত্য প্রতিনিয়ত বদলে যায়। এখানে আমার ধারাবাহিক ভুলগুলি। যে-কবিতা জীবনের, সে-কবিতার জন্য জীবনকে যোগ্য করে নিতে হবে। এ জীবন সজ্ঞানে, আত্মত্যাগে নয়, সর্বগ্রাসে সর্বভুক কবিতার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত যদি না পারে, তবে কবিতা লেখা ছেড়ে, সেই দিকভ্রান্ত জীবন তখন নিজেকে নিয়ে কী করবে জানি না।

বন্দী, জেগে আছো

ফাল্গুন ১৩৭৫-এ অরুণা প্রকাশনী (৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৬) থেকে প্রকাশ করেন বিভাসচন্দ্র বাগচী। উৎসর্গ 'নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শ্রদ্ধাস্পদেষু'। কবিতার সংখ্যা ৪৬, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪, বোর্ড বাঁধাই, দাম ৩ টাকা ৫০ প·। প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রীর আঁকা। বইটির পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ।

আমার স্বপ্ন

এপ্রিল ১৯৭২-এ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড (৪৫বেনিয়াটোলালেন কলকাতা ৯) থেকে ফণিভূষণ দেব প্রকাশ করেন। উৎসর্গ 'দেবারতি মিত্র, বেলাল চৌধুরী, সুব্রত রুদ্র-কে আমার বিনীত উপহার'। কবিতার সংখ্যা ৪০, পৃষ্ঠা ৮+৫৬। দাম ৩ টাকা। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী।

সত্যবদ্ধ অভিমান

শ্রাবণ ১৩৭৯-এ ময়ূখ বসু বেঙ্গল পাবলিশার্স লিমিটেড (১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ১২) থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা এবং কবিতাসংক্রান্ত দুটি গদ্যরচনা নিয়ে প্রকাশ করেন ৭২ পৃষ্ঠার বই 'যুগলবন্দী'। বইটি দুটি আলাদা নামে বিভক্ত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা-অংশের নাম 'সত্যবদ্ধ অভিমান'। এই নামে কবির আলাদা কোনও বই নেই। এখানে ২১টি কবিতার সঙ্গে 'কবিতার সুখদুঃখ' নামে একটি নিবন্ধ ছিল। প্রচ্ছদশিল্পী গৌতম রায়। দাম ৩ টাকা ৫০ প·। বইটি উৎসর্গ করা হয় 'দু'জনের প্রিয় বন্ধু সুনন্দ গুহঠাকুরতা-কে'।

জাগরণ হেমবর্ণ

২৫ বৈশাখ ১৩৮১ তারিখে অরুণা প্রকাশনী (৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৬) থেকে অরুণা বাগচী প্রকাশ করেন। উৎসর্গ 'বুদ্ধদেব বসু স্মরণে'। প্রচ্ছদশিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী। মোট ৪৩টি কবিতা। পৃষ্ঠা ৬৪। বোর্ড বাঁধাই। দাম ৪ টাকা ৫০ প·। পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ।

কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি

(প্রথম পঙ্‌ক্তি, কবিতার নাম, পৃষ্ঠা)

অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় জীবন বদলে নিলাম আমি ও নিখিলেশ (জুয়া) ৬০
অনিশ্চিত সর্বনাশে চিরকাল যুবকের নেশা (চতুর্দশপদী) ৩৯
অনেকদিন থেকেই আমার একটা পাহাড় কেনার শখ। কিন্তু পাহাড় কে বিক্রি (পাহাড় চূড়ায়) ২৪৯
অন্ধকারে কে ডেকে উঠলো, দাঁড়াও (দাঁড়াও ! কেন ?) ২১৪
অন্ধকারে তোমার হাত (পাওয়া) ২২৭
অপূর্ব নির্মাণ থেকে উঠে আসে (পেয়েছো কি ?) ১৮০
অপ্সরাদের মতন সাদা ফুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফুটে আছে (নির্জনতায়) ২২৭
অরুন্ধতি, সর্বস্ব আমার (চোখ বাঁধা) ৫৮
অলীক বাদুড়, তুই (অলীক বাদুড়) ২১৩

আগুনের জিহ্বা এসে স্পর্শ করে যায় (পিপাসার ঋতু) ২৮
আঠাশ বছর কাটলো, মৃত্যুর এখনো দেরী একশো আঠাশ (কাটামুণ্ডের দিবাস্বপ্ন) ১০৬
আমলকী গাছে ঠেস দিয়ে আছে শীত (নিসর্গ) ১৪৪
আসন্ন আষাঢ় তাই রৌদ্র প্রার্থী মন (বৃষ্টির ইতিহাস) ৪১
আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে (তুমি) ২১
আমার জনৈক বন্ধু, কাল রাত্রে কি দুঃখে কি জানি (দুই হৃদয়) ২৭
আমার উপমা নয়—আমি তাকে চাইনি মেলাতে (স্বর্ণলতা) ৪০
আমার নিঃসঙ্গ জাগা ভাঙে না কোথাও ঘুমঘোর (অবেলায়) ৭৩
আমার ভালোবাসার কোনো জন্ম হয় না (জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না) ১৭০
আমার নাকি বয়েস বাড়ছে ? হাসতে হাসতে এই কথাটা (বয়েস) ২৬২
আমায় অনুসরণ করে আঠাশ বছর পেরিয়ে আসা শব্দ (শব্দ ২) ১০৬
আহা রে সোনার মূর্তি ও কি অবিরল ঝরে যাবে (এই হাত ছুঁয়েছিল) ১১৩
আমি সেই মানুষ, আমাকে চেয়ে দ্যাখো (সাবধান) ৬৪
আমি ও নিখিলেশ, অর্থাৎ নিখিলেশ ও আমি, অর্থাৎ আমরা চারজন (নির্বাসন) ৬৯
আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ (আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি) ৮৪
আমি খুব দূর, দূর দেশ থেকে অলক্ষ্যে বাণ ছুঁড়ি (অমলের স্ত্রীর জন্য) ৮৯

আমি তোমাদের কোন অনন্ত ছায়ায় (চোখ বিষয়ে) ৯৭
আমি তোমার অধর থেকে ওষ্ঠ তুলে তাকিয়ে দেখি মুখের দিকে (ক্লান্তির পর) ৯৯

উনিশে বিধবা মেয়ে কায়ক্লেশে গর্ভবতী হলো (বিবৃতি) ১৪

ঋজু শাল অশ্বত্থের শিকড়ে শিকড়ে যত ক্ষুধা (প্রার্থনা) ১৩

এ কোন নতুন আলো পুঞ্জ পুঞ্জ ছড়ানো আকাশে (শেষ প্রণয়) ৩৩
এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ (সত্যবদ্ধ অভিমান) ২০৭
এই বিকেলটা অন্যরকম জীবন আমার ছিঁড়ে নেবো জমিয়ে (আর্কেডিয়া) ৫৪
এই হ্রদে ঈশ্বর ছিলেন (এক সন্ধেবেলা আমি) ৯৫
এই কবিতার জন্য আর কেউ নেই, শুধু তুমি নীরা (নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা) ৯৫
এই তটভূমিহীন প্রবহমান সংশয় (ভুল বোঝাবুঝি) ২০০
এই সূর্যাস্তের মতো স্মৃতির বিকাশ ছিল (স্রোত থেমে আছে) ২১৭
এইমাত্র এসে ভিড়লো ফেরী জাহাজ । কী সৌভাগ্য আমার, রেলিং-এ (পদ্মায় পুনর্বার) ২৪৭
এইখানে বসবো এসো, অবিনাশ, বেদনার পাশের চেয়ারে (শোকসভায় এক সন্ধ্যা) ১৭১
একটা চিল ডেকে উঠলো দুপুরবেলা (মৃত্যুদণ্ড) ১০০
একটি পাগল অন্ধকারকে বলে (রাত্রি) ৩২
একটি চাতক তার ধর্ম ভুলে কর্দমাক্ত দীর্ঘিকার জল (পাপ) ৪৩
একলা ঘরে শুয়ে রইলে কারুর মুখ মনে পড়ে না (অসুখের ছড়া) ৫৩
একসঙ্গে জেগে উঠি দু'জনেই হে সবিতৃদেব (অনুভব) ৪৪
একবার হাসপাতালে যাও সুস্থ একটি আপেলের মতো (একবার হাসপাতালে যাও) ১০৩
একজন মানুষ শুকনো নদীর সামান্য (দুঃখের গল্প) ২৩৯
একজন মানুষ মুক্তিফল আনতে গিয়েছিল (মুক্তি) ১৭৪
একদিন তোমার হাত ধরে জয়পুরের রাস্তা দিয়ে বেড়াবো (একদিন···) ১২৪
একজনের কাছে কিছু ক্ষমা ভিক্ষা আছে, আরেকজনের কাছে প্রতিশোধ (দু'জনের কাছে ঋণ) ১১৬
একা গৃহকোণে আছি, তোমরাও এসো কয়েকজন (একা) ২৫
এখন ইস্কুল বন্ধ, বালক সীমান্তে যায় চাল কিনতে (শব্দার্থ) ১৩৩
এখন সময় ভরা বাবলা কাঁটা (এখন) ২৬৩
এখন অসুখ নেই, এখন অসুখ থেকে সেরে উঠে (নীরা ও জীরো আওয়ার) ১০১
এত ছোট হাতে কি করে ধরেছ বিশ্ব (সপ্তপদী এবং আরো এক লাইন) ১৯
এপ্রিলের কৃষ্ণচূড়া অহঙ্কারে ব্যাপ্ত করে দিক (ক্ষণিকা) ৩৪
এবার কবিতা লিখে আমি একটা রাজপ্রাসাদ বানাবো (এবার কবিতা লিখে) ১১৫
এমন ভাবে হারিয়ে যাওয়া সহজ নাকি (ফেরা) ২১৮
এমনও তো হয় কোনোদিন (আমার স্বপ্ন) ১৬৩

ঐ ছেলেটা পাগল (ছেলেটা) ১৩৪

ওকে ডাকো, ডেকে বলো ও যেন অমন ঘুমঘোর (নারী ও নগরী) ১১৪

কখনো কখনো মনে হয়, নীরা, তুমি আমার (নম্বর) ১৯৬
কতটুকু দূরত্ব ? সহস্র আলোকবর্ষ চকিতে পার হয়ে (নীরার দুঃখকে ছোঁয়া) ১৮৫

কবিতা লেখার খাতা কখনো ভয়ের মতো শব্দ করে (মৃতের উপদ্রব) ২৪৯
কবিতার মধ্যে বহু চিঠি, ভ্রমণকারীর (কবিতার মধ্যে) ২২৫
কলমের এক আঁচড়ে দুঃখী ঐ লোকটিকে সুখী করে (সৃষ্টিছাড়া) ১৯৯
কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে (আমি ও কলকাতা) ৯০
কাচের চুড়ি ভাঙার মতন মাঝে মাঝেই ইচ্ছে করে (ইচ্ছে) ১৪১
কাল ভোরবেলা আমি শয়তানকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে (দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ) ১৮২
কারাগারের ভিতরে পড়েছিল জ্যোৎস্না (সেইসব স্বপ্ন) ২৪৫
কারুর আসার কথা ছিল না (স্বপ্নের অন্তর্গত) ২৫৬
কিছু উপমার ফুল নিতে হবে নিরুপমা দেবী (চতুরের ভূমিকা) ১৮
কিছু পথ হেঁটে তারা তিনজনে সন্ধ্যার আঁধারে (তিনজন তরুণ কবি—একটি গ্রোটেস্‌ক্) ৩৭
কী বিষম দুঃখ এসেছিল আজ ভোরবেলায়, কাঠবাদাম, চকলেট, স্ট্রবেরি (খিদে) ৭৭
কী চাও আমার কাছে ? (যা পেয়েছি, যা পাবো না) ২৩২
কুসুমে ছিল সবুজ সাপ সে এক সন্ধেবেলা (সাপ) ২৫
কুসুমের বুক থেকে ঝরে গেছে সব পবিত্রতা ; এই লাইনটা নিয়ে মহা মুস্কিলে (না লেখা কবিতা) ৮৭
কে যায় ? (খণ্ডকাব্য) ২১০
কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখেনি (কেউ কথা রাখেনি) ১৩১
কেউ শরীরবাদী বলে আমায় ভর্ৎসনা করলে, তখন ইচ্ছে হয় (শরীর অশরীরী) ১৫০
কেমন সহজ আমি ফোটালাম এক লক্ষ ফুল (সহজ) ৩৮
কোথায় নামলো ঝড়—এখানে আকাশে (ঝড়) ৩০
কোন দিকে ? কোন দিকে ? আমি চিৎকার করলুম (স্বপ্ন, একুশে ভাদ্র) ৫১
কোনোদ্বিধানেই আমি অসম্ভব ভালোবাসা এইমাত্র তোমার চিবুকে (কয়েক মুহূর্তে) ৭৮

খণ্ড পাথর, শৌখিনতায় তুই কি চাস সজীব হয়ে উঠে দাঁড়াতে ? (পাথর) ১৩৮
খুচরো পয়সা গুনে নিয়ে পেঁয়াজ রসুন (উপলব্ধি) ২৬

গহন অরণ্যে আর বারবার একা যেতে সাধ হয় না— (গহন অরণ্যে) ১২১
গাছের ছায়ায় বসে বহুদিন কাটিয়েছি (ছায়ার জন্য) ১২২
গাড়ি বারান্দার নিচে আমরণ অনশনে বসে আছে (তিনজন মানুষ) ১৭৯
গাঁয়েতে এয়েছে এক কেরামতি সাহেব কোম্পানি (হাসন্ রাজার বাড়ি) ১৭৮

চরাচরে অন্ধকার, নিঃশব্দ নিশীথে ডাক ওঠে (বন্দী, জেগে আছো ?) ১৪৬
চলে যাবে ? সময় হয়েছে বুঝি ? (গুহাবাসী) ২৩১
চিঠি না-লেখার মতো দুঃখ আজ শিরশির করে ওঠে (কৃতঘ্ন শব্দের রাশি) ১৫৩
চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম, একা, অহঙ্কার অত্যন্ত গম্ভীর (ভ্রমণ) ৮৮
চে, তোমার মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দেয় (চে গুয়েভারার প্রতি) ২২০
চেয়েছি নতুন দিন (রক্তমাখা সিঁড়ি) ১৮১

ছিল নিঝুম পুষ্করিণী (অভিমানিনী) ২১৮
ছিলাম বাসনা লঘু, ছন্দ এসে আমাকে সুস্থির হতে বলে ('সকল ছন্দের মধ্যে আমিই গায়ত্রী') ১০৭

জাগরণ হেমবর্ণ, তুমি ওকে সন্ধ্যায় জাগাও (জাগরণ হেমবর্ণ) ২৫৯
জাগো, জেগে ওঠো বাণী, আজ অন্ধকার, আজ (বাণী-বন্দনা) ১২৬
জীবন ও জীবনের মর্ম মুখোমুখি দাঁড়ালে (জীবন ও জীবনের মর্ম) ১৪২

জ্যোৎস্নার মতো শীতের রোদ, বাসের হাতল ধরে আমি দাঁড়িয়ে (দুপুরে রোদ্দুরে) ৯৮

ঝড় দিস্‌নে, আকাশ, সেই সুন্দরীর ঘরে (মিনতি) ১৫
ঝাটিংগা নামের এক দুর্দান্ত পাহাড়ী নদীর পাশে (শব্দ) ১৬৬

টেবিলের দুই প্রান্তে মুখোমুখি বসে থাকা, অন্তরীক্ষ চোখে (দু'পাশে) ১৮৩
ট্রেনের জানলায় মুখ, ঐ মুখ হলুদ আলোর মতো ফিরে আসে (শূন্য ট্রেন) ২৪৭

ঠোঁট দেখলেই বুঝতে পারি, তুমি এদেশে বেড়াতে এসেছো (বিদেশ) ১৯৮

ডান হাতখানি বাড়িয়ে দাও তো দেখি (জেদী মানুষ) ২১৫

তখন দরজায় স্পষ্ট শব্দ শোনা যায়, উদ্ভিদের পদশব্দ (শব্দ ১) ৬৩
তবে কোনো দুঃখ নেই, সে তো সব সুখেরও অতীত (কবি) ৩৭
তারও তো যাবার কথা ছিল, যে রইলো (ওরা) ২৫৮
তারপর সেখানে পড়ে রইলো কয়েকটা খালি চেয়ার (চেয়ার) ২৩০
তিনজন জেদী ছেলে, দুপুরে ছুটছিল সাইকেলে (দুপুর থেকে রাত্রি) ২১৩
তুমি শব্দ ভেঙেছিলে, তোমার নিষ্কৃতি নেই, তোমার গরিমা (তুমি শব্দ ভেঙেছিলে) ৬৬
তুমি কবিতার শত্রু—কবিতার মদির সৌরভ (সপত্নী) ১৪
তুমি জেনেছিলে মানুষে মানুষে (তুমি যেই এসে দাঁড়ালে) ২৪৮
তুমি যেখানেই যাও (তুমি যেখানেই যাও) ২৫৬
তুমি কথা বলো, তুমি গান করো, আমি (ব্যর্থ) ২৯
তুমি অপরূপ, তুমি সৃষ্টির যথেষ্ট পূজা পেয়েছো জীবনে ? (তুমি) ১৫৬
তুমি আমার লুকানো মুখ তুলে ধরলে বারান্দার আলোর কাছে (মুখ দেখাদেখি) ৭১
তুমি তো আনন্দে আছো, তোমার আনন্দ অন্যবর্ণ (অভিশাপ) ২৬১
তোমাকে দিয়েছি চিরজীবনের বর্ষা ঋতু (বিচ্ছেদ) ২২
তোমার ছিল স্বপ্ন দেখার অসুখ, তুমি (জীবন-স্মৃতি) ২৪২
তোমার হাতে গোলাপ, তুমি ফুলের কাছে ঋণী রইলে··· (অচেনা) ১১৫
তোমাদের জন্য বড় দুঃখ হয় মেয়েরা, প্রায় দশ বারো বছর (মেয়েদের জন্যে ভুল ছন্দে) ৭২

দরজা বন্ধ, কলিং বেলে হাত, শ্রবণ উৎকর্ণ (সেই মুহূর্তটা) ১৯২
দিনান্তের ফেরা পথে কোনোদিন দৈবাৎ কখনো (অন্যপ্রাণ) ৪১
দু'জন খসখসে সবুজ উর্দিপরা সিপাহী (কবির মৃত্যু : লোরকা স্মরণে) ১৮৭
দেড় বছর পর অমন চোখ তুলে প্রথম তাকালে (মায়াজাল) ৯৯

ধুধু করা এক মাঠের মধ্যে একলা গাছের মতো (কঠিন মিল) ২৩

নর্তকী, তুমি তাকাও আমার দিকে ক্ষণকাল (সিম্ফিতে এক উৎসবে) ১৪৭
নদী, তুমি অন্ধকার । এ যে রাত্রি (অন্ধকারে নদী) ২১২
নদীর ওপারে ও কে ? ও কি মৃত্যু ? দাঁড়িয়ে রয়েছে (নদীর ওপারে) ১৩৩
নরকের চারপাশে কেমন কেয়ারি করা সুন্দর বাগান (নিয়তি) ৮৬
নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম ভুবন ডাঙার মেঘলা আকাশ (উত্তরাধিকার) ১৪৫
নায়ক শহরে কোনো এক মসীপণ্য (একজন মানুষের গল্প) ৪২

নারী শুধু মুখ লুকোবার জন্য, যখন ঝর্ণায় দেখি মুখ (হাওয়া এসে) ১১২
নারীকে এখনও ভালো করে দেখা হয়নি (দেখা হয়নি) ১৯৩
নিজের গলার স্বর যন্ত্রে শুনবো, ঐ যন্ত্র বলবে 'ভালোবাসি' (মূক ব্যবহার) ১২৮
নিত্যকার বাঁধা মঞ্চে ঘুরছে ফিরছে অসংবদ্ধ যুবা (মঞ্চ) ১৯
নীরার অসুখ হলে কলকাতায় সবাই বড় দুঃখে থাকে (নীরার অসুখ) ১২৭
নীরার চোখের জল চোখের অনেক (নীরার হাসি ও অশ্রু) ১৪০
নীরা এবং নীরার পাশে তিনটি ছায়া (নীরার পাশে তিনটি ছায়া) ১৪৬
নৌকায় মাঝি চারজনা, হাল দাঁড় মোটে তিনখানি (মাল্লা) ২২২

পরিত্রাণ, তুমি শ্বেত, একটুও ধূসর নও, জোনাকির পিছনে বিদ্যুৎ (আমার কয়েকটি নিজস্ব শব্দ) ৬৫
পার্কের রেলিং-এর পাশে ইঁটপাতা (মানুষ) ১৯৪
পাঁচজনে বলে পাঁচ কথা, আমি নিজেকে এখনও চিনি না (আমিও ছিলাম) ২৪১
পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না (পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না) ৭৪
পায়ে তোমার কাঁটা ফুটেছে উচ্চাকাঙ্ক্ষা (নিরাভরণ) ১৫৮
পায়ের কাছে এই বিশাল বাধাহীন সমুদ্র (একটি অনুভব) ২৭
পায়ের নিচে শুকনো বালি একটু খুঁড়লে জল (তামসিক) ১৭
পাহাড় সমুদ্র আর অরণ্যের স্তব লিখে লিখে (ঘর) ২৪
পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল (জয়ী নই, পরাজিত নই) ১৩৭
পাহাড় ফাটিয়ে রাস্তা বানাতে চেয়েছে ডায়নামাইট (আমি যদি) ১৭৭
পৃথিবীর নিচু কোণে, এই কলকাতার খুব অন্ধকার প্রান্তে (পৃথিবীর নিচু কোণে) ২১৯
প্রতিটি ট্রেনের সঙ্গে আমার চতুর্থভাগ আত্মা ছুটে যায় (আত্মা) ১৪৯
প্রতিধ্বনি, তুমি তো স্বর্গের দিকে গিয়েছিলে (একটি কবিতা লেখা) ৭৯
প্রিয় ইন্দিরা, তুমি বিমানের জানলায় বসে, (ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি) ১৪৯

ফকির সাহেবের প্রাচীন মাজারের কাছাকাছি আস্তানা গেড়েছিলেন সন্ন্যাসিনী (কিশোর ও সন্ন্যাসিনী) ১৭২
ফিরে যাবো, শীত শেষে অবিশ্বাসী মরালের মতো (অনির্দিষ্ট নায়িকা) ৪৬
ফিরে এলাম, হে নির্ভয়, তোমার চোখে শান্তি (সমর্পণ) ৩৬
ফুটে উঠলো একটি দুটি টগর (ডাকবাংলোতে) ১৩০

বড় বেশি ভালোবাসা দিয়েছিলে চরিত্র দূষিত হয়ে গেল (বড় বেশি) ৬১
বড় ঠাণ্ডা লাগে স্মৃতি, এ যেন কেমন এক চতুষ্কোণ দ্বীপে শুয়ে থাকা (স্মৃতির প্রতি) ৮৫
বহু অর্চনা করেছি তোমায়, এখন ইচ্ছে (চেনার মুহূর্ত) ২৫০
বহুদিন ছিলাম প্রবাসে আমি (প্রবাসের অভিজ্ঞতা) ২২৮
বহুদিন লোভ নেই, শব্দে শিহরন, স্বপ্নে শিহরন, ঘুম (বহুদিন লোভ নেই) ১৬৬
বহুদিন আকাশ ভাসানো জ্যোৎস্নায় (স্থির সত্য) ২৩৮
বহুদিন স্বর্গ থেকে দূরে আছি, মনে পড়ে (ফিরে যাবো) ২৪০
বাগানখানি ফুলদানি, হাওয়ায় সেই ধাতু এবং কুসুমগন্ধ (মাটি) ১৩৪
বাতাসে তুলোর বীজ, তুমি কার ? (বাতাসে তুলোর বীজ) ১৬৩
বারান্দার রেলিং ধরে একটুখানি ঝুঁকে দাঁড়ালে (সমালোচকের প্রতি) ২৩৬
বালি ঝুমকো, হলুদ নাভি, শূন্য হাস্য (শব্দ) ১৪৩
বারেবারে চমকে উঠি, সে আসেনি ; গোধূলির আলো (পরমা) ৩৬

বাস স্টপে দেখা হলো তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল (হঠাৎ নীরার জন্য) ৫৩
বায়ু, তুমি আমাকে পবিত্র করো, আমার প্রতিটি রক্ত-কণিকাকে ডাক (বায়ু, তুমি) ৫৯
বিমানের মধ্যে আমি টাই খুলে ফেলে, সিট বেল্ট সরিয়ে (আথেন্‌স্‌ থেকে কায়রো) ১২৯
বিষণ্ণ সন্ধ্যার জাল তোলে এক নীরব শিকারী (সময়) ৩২
বুকে যে ঝর্ণার উৎস সে কোন গভীরে (বুকে যে ঝর্ণার উৎস) ২১
বুকের ভিতরে যেন মুচড়ে উঠলো একুশে এপ্রিল (বহুদিন পর প্রেমের কবিতা) ১১১
বেয়ারা পাঠিয়ে কারা টাকা তোলে ব্যাঙ্ক থেকে ? (অনর্থক নয়) ৯১
ব্রীজের অনেক নিচে জল, আজ সেইখানে ঝুঁকেছে মানুষ (জলের সামনে) ১৪১
ব্রীজের নীচে মানুষ, তুমি (সারা জীবন বেড়াতে এলে) ১৫৪

ভয়ঙ্কর স্থির সত্যে ডুবে যাব, সুরম্য বিজয়া (প্রেমবিহীন) ২০১
ভালো আছো ? (দেখা) ২০৯
ভালোবাসা ছিল কাল সন্ধেবেলা, এখন দুপুরে একটু বিরক্ত লাগছে (তিন ঘণ্টা বিচ্ছেদ) ১০৪
ভালোবাসা ছিল তাই আমি অত ঘৃণায় (দ্বিধা) ১১০
ভেবেছিলাম নিচু করবো না মাথা, তবুও ভেতরের এক কুত্তার বাচ্চা (গদ্য ছন্দে মনোবেদনা) ১৭৭
ভোরবেলায় বৃষ্টি একজন সাক্ষী চেয়েছিল, তাই আমি হঠাৎ ঘুম ভেঙে বাইরে (কত দূরে) ২৫৫
ভৌতিক পিওন যবে খেলাচ্ছলে পার হয় রাসবিহারী মোড় (চিঠি) ১২৭
ভ্রূ-পল্লবে ডাক দিলে, দেখা হবে চন্দনের বনে (দেখা হবে) ১২৯

মধ্যাহ্ন-বাগানে এসে ঝুঁকে আছে সাত ফুট আলো (অনন্ত মুহূর্ত) ১২৫
মহারাজ, আমি তোমার সেই পুরনো বালক ভৃত্য (মহারাজ, আমি তোমার) ৫১
মা, তোমার কিশোরী কন্যাটি আজ নিরুদ্দেশ (উনিশশো একাত্তর) ২০২
মাঝে মাঝে কাকে যেন হাত তুলে বলি (দেরি) ১৯১
মানুষের মতো চোখ, বিস্ফোরণ, সমাধির মতো শূন্য প্রচ্ছন্ন কপাল (প্রত্যেক তৃতীয় চিন্তা) ৬২
মাঠের সামনের ঝুল বারান্দায় শীতের সকালে রোদ এলে (আজ সকালবেলা) ১৫২
মায়ের গোলাপ গাছে ঠিক একটি গোলাপের মতো ফুল (অরূপ রাজ্য) ১৩৫
মেঘের সঙ্গে কথা বলিনি, তাই বিস্মরণে দুঃখ নেই (অসমাপ্ত) ১০৯
মৃত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে চোখে চোখে কথা শেষ হয় (আটাশ বছরে) ৫৫

যখন বৃষ্টি পড়ে তখন গাছের নিচে দাঁড়াই একলা (গাছের নিচে) ২১৬
যদি কোনোদিন একা তুমি যাও কাজলা দিঘিতে (যদি কোনোদিন) ৩১
যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াবো (যদি নির্বাসন দাও) ১৬৪
যদিও জীবনে অনেক মাধুরী করেছি হরণ (অবিশ্বাস) ২৩
যমুনা, আমার হাত ধরো। স্বর্গে যাবো। (প্রবাসের শেষে) ১৫৮
যে আমায় চোখ রাঙিয়ে এইমাত্র (মনে মনে) ২০৮
যে-যাই বলুক, আমার ভীষণ (যে-যাই বলুক) ২০৯
যে লেখে, সে আমি নয় (অন্য লোক) ২৪১
যে-কোনো রাস্তায় যে-কোনো লোককে ডেকে বলো (চিনতে পারোনি) ১২১
যে পান্থনিবাসে যাই দ্বার বন্ধ, বলে 'ঐ যে রুগ্‌ণ ফুলগুলি' (আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়) ৫৯
যে যেমন জীবন কাটায় (চোখ ঢেকে) ২৫৪
যেন কাল মরে যাবো ক্ষণকাল সেই কথা ভেবে (একই স্বপ্ন দু'জনে দেখেছি) ৯৪
যেন তিনটে শীত ঋতু জমলো তাঁর দাঁতের গোড়ায় (দাঁতের ব্যথায় ভুগছেন একজন দার্শনিক) ১১৬

যেমন উপত্যকা থেকে ফিরে এসেছি বহুবার, পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা হয়নি (চন্দনকাঠের বোতাম) ১৭৫

রাজার বাড়িতে কার খুব অসুখ (দিনে ও রাত্রে) ২৩৭
রাগী লোকেরা কবিতা লিখতে পারে না (রাগী লোক) ১৯৭
রাত্তির সাড়ে বারোটায় বৃষ্টি, দুপুরে অত্যন্ত শুকনো এবং ঝকঝকে (বাড়ি ফেরা) ১৩৮
রূপালি মানবী, সন্ধ্যায় আজ শ্রাবণধারায় (রূপালি মানবী) ১৬৯
রেল লাইনে মাথা পেতে শুয়ে আছে যে লোকটা (লোকটা) ২৬০
রোজ সকালেই শুয়ে শুয়ে ভাবি উঠি কিনা উঠি (আত্মকাহিনী) ৩৪
রৌদ্রে এসে দাঁড়িয়েছে রৌদ্রের প্রতিমা (দুপুর) ১৬

লাল ও সবুজ আলোর মধ্যে অনন্তকাল (রাখাল) ৭৬

শব্দ তার প্রতিবিম্ব আমাকে দেখাবে বলেছিল (কবির দুঃখ) ২৪৬
শরীর ছেলেমানুষ, তার কত টুকিটাকি লোভ (ভালোবাসা) ১৩৬
শরীরের যুদ্ধ থেকে বহুদূর চলে গিয়ে ফিরে আসি শরীরের কাছে (হিমযুগ) ৬৭
শিউলি ফুলের রাশি শিশিরের আঘাতও সয় না (আমার কৈশোরে) ১৬৮
শিয়ালদার ফুটপাথে বসে আছেন আমার ধাইমা (ধাত্রী) ১৮৪
শীতের মদিরেক্ষণ আমাদের ওষ্ঠে লেগে আছে (ঘুম) ৬৮
শুকনো নদীর জলে পা ডুবিয়ে দুপুরের ক্ষণিক কৌতুকে (যা ছিল) ১৭৪
শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম, শুধু কবিতার (শুধু কবিতার জন্য) ৫৬
শেষ ট্রেন ছেড়ে গেছে, এখন এ প্ল্যাটফর্মে আমরা সকলে (শেষ যাত্রী) ৬৯
শেষ কবে নারীহত্যা করেছি আমার ব্যক্তিগত স্বর্গে ? বাথরুমে—ছ'মাস আগে (জ্বলন্ত জিরাফ) ৭৩
শেষ ভালোবাসা দিয়েছি তোমার পূর্বের মহিলাকে (প্রেমবিহীন) ৭৫
শ্মশানে পিতৃপুরুষের কঙ্কাল, তার ফাঁকে ফাঁকে শিরশির (চিরহরিৎ বৃক্ষ) ৪৪

সকালবেলা এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম একজন বৃদ্ধ আন্তর্জাতিক (অপেক্ষা) ২৩৮
সখী, আমার তৃষ্ণা বড় বেশী আমায় ভুল বুঝবে ? (সখী, আমার) ২৫১
সতীশের মৃত্যু হলো, জিভ দিয়ে চেটেছিল শ্বেতবর্ণ বিষ (আমার ছায়া) ১০৮
সমস্ত আকাশ থেকে রাত্রি আস[illegible]রে পড়ে (এক ঘুমের পর) ১৭
সমুদ্রে সে ডুবেছিল, সমস্ত যৌবন কাল, রত্নের সন্ধানে (সমুদ্র এবং মধ্যবয়স) ৩৫
সমুদ্রের জলে আমি থুতু ফেলেছিলাম (দুটি অভিশাপ) ১২৩
সম্রাজ্ঞী বাইরে [illegible]ছেন, শেষরাত্রে গোপনে ফিরবেন (রাত্রির বর্ণনা) ৫৭
সাদা বাড়িটার সামনে আলো-ছায়া আলো, একটি কঙ্কাল দাঁড়িয়ে (কঙ্কাল ও সাদা বাড়ি) ১৫৭
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে, সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন (অপমান এবং নীরাকে উত্তর) ৬৫
সিঁড়ির উপর থেকে ছুটে এল অতি দ্রুত মেফিস্টোফিলিস (পৌঁছোনো যাবে না) ৭৭
সিঁড়ির মুখে কারা অমন শান্তভাবে কথা বললে ? (নীরা তোমার কাছে) ৮৩
সিংহদ্বার খুলে গেছে, ভেতরে দেখি শুধুই শূন্যতা (বঞ্চনা) ২৫৪
সিংহাসন থেকে ধীর পদক্ষেপে নেমে আসে (নিসর্গের পাশাপাশি) ২১১
সিংহাসন থেকে একটু নিচে নেমে পাথরের (আরও নিচে) ১৫৫
সেই যে এক বাউল ছিল সংক্রান্তির মেলায় (ঝর্ণা-কে) ১৩
সেই ছেলেটির চোখে দীপ্ত রোখ (সেই ছেলেটি ও আমি) ১৯৩
সেদিন ছিল একটি বিন্দু, যা মানুষকে ঘরে ফেরায় (ঘরে-বাইরে) ২৩০
সুগন্ধ নারীর পাশে শুয়ে থাকা স্বপ্ন নয় (স্বপ্ন নয়) ২৫৫

স্বপ্ন থেকে মুক্তি নেই—শীতের সাপের মতো ঘুমন্ত হৃদয় (নেশা) ৪৫
স্বপ্ন ভুল দেখা হলো, তবু এ অন্ধকারে (মালতী) ১০৫
স্মৃতি এসে বলে : পূর্ব দিকে যাও, তোমার নিয়তি (পতন) ১৯৫

হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠলো ধড়মড়িয়ে বিমলা (বিড়াল) ১০৩
হঠাৎ দূর থেকে একটা আকস্মিক ডাক আসে (মিথ্যে নয়) ২৫২
হলুদ শাড়ি আর পরো না, এবার মাঠে হলুদ ধান ফলেনি (ধান) ১৫৩
হাওড়া ব্রীজের রেলিং ধরে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল (দ্বারভাঙা জেলার রমণী) ১৪৪
হাতে লেগেছিল হাত, কেউ তো দেখেনি (সাক্ষী) ২৬১
হিরণ্ময়, তুমি নীরার মুখোমুখি দাঁড়িয়ো না (ছায়া) ১৯৯
হে আকাশ তুমি আজ বলো (নক্ষত্র) ৩০
হেমন্তে বর্ষায় আমি ঝরে গেছি (হেমন্তে বর্ষায় আমি) ২৫৩